দ্বিতীয় প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৩৭৬
প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫

প্রকাশক : ফজলে রাব্বি
পরিচালক,
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২

মুদ্রণ : মুজীবুর রহমান
মুরাদ প্রেস
১, বি. কে. গাঙ্গুলী লেন,
(কায়েৎটুলী), ঢাকা-২

প্রচ্ছদ : মনসুর আহমদ

ভূমিকা

১

এই বিজ্ঞাপনের যুগে মোতাহের হোসেন চৌধুরী লেখক হিসেবে জীবিতাবস্থায় ছিলেন প্রায় অপরিচিত, প্রায় নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন তিনি, লুকিয়ে মানুষের তথা জীবনের কতগুলি মৌল অবস্থাকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছিলেন। এবং লেখক হিসেবে, দুরূহ প্রবন্ধের রচয়িতা হিসেবে অনাদরই হয়তো শ্রেষ্ঠ পুরস্কার; তবু তাঁর ভাগ্য বোধ হয় তাঁকে একটু বেশিই ঠকিয়েছিলো। কেননা, যদিও অকাল মৃত্যুবরণ করে নিয়েছিলেন তবু তাঁর যা বয়স হয়েছিলো (জন্ম: ১৯০৩; মৃত্যু: ১৯৫৬) তাতে অন্ততঃ ছাপার অক্ষরে দু'একটি বই তিনি দেখবার অধিকারী ছিলেন। ব্যক্তিজীবনে এই নেহাৎ-অধ্যাপকটি যে ভেতরে-ভেতরে মানুষের শাশ্বত ও ভাস্বর ধ্যানে নিযুক্ত করেছিলেন নিজেকে: এই তথ্যে সাধারণ মানুষের হয়তো কিছু আসে যায় না, কিন্তু তা-ই বুদ্ধিজীবীদের কাছে উজ্জ্বল উৎসাহের স্থল ও কারণ।

অনেক বছর ধ'রে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিচ্ছিন্নভাবে যখন তাঁর মৌলিক ও পরানুসৃত প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়, অধিকাংশই অখ্যাত বা স্বল্পখ্যাত পত্রিকায়, তখন তাঁর সম্বন্ধে উৎসাহের কোনো কারণ পাওয়া যায়নি, বস্তুতঃ রচনাগুলি অনেক সংবেদী পাঠকের চোখেই পড়েনি। তাঁর সুহৃদ ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রচেষ্টায় যখন তাঁর মৃত্যুর পরে তিরিশটি প্রবন্ধ-সংকলিত 'সংস্কৃতি-কথা' প্রকাশিত হলো, বলতে গেলে, তখনই জেগে উঠলেন বুদ্ধিজীবীর দল। এই পুস্তকের পরিসরে পাওয়া গেলো একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব,

রচনাগুলির আয়তনে স্বাক্ষরিত দেখা গেলো একজন মোতাহের হোসেন চৌধুরীর চারিত্র্য এবং আমরা পেলাম এমন একগুচ্ছ ভাবনা-বেদনা, যা বহুস্তরগামী। অবশ্য, তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর রচনার গুণ গ্রহণ করেছেন এরকম ব্যক্তি বিরল হলেও একেবারে কেউ ছিলেন না, তা নয় এবং সেই তালিকায় কোনো কোনো উল্লেখ-যোগ্য মনীষীর নামও যুক্ত, তা হলেও তা অত্যন্ত সীমিত; তাঁর মৃত্যুর পরেই তাঁর সম্বন্ধে উৎসাহ ও মনোযোগ অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আকারে দেখা যায় এবং এক হিসেবে যদিও একেবারে অর্থহীন তবু স্বীকৃতির সাক্ষ্যরূপে এটাও উল্লেখ করা যায় যে, অতঃপর তিনি সাহিত্যের ইতিহাস এমনকি পাঠ্যতালিকারও অন্তর্ভুক্ত হন।

কারো কারো এমনও মনে হতে পারে: জীবৎকালে যিনি এমন স্বল্প জ্ঞাত ও অবহেলিত ছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পরবর্তী হঠাৎ-উৎসাহের অনেকটাই হয়তো উচ্ছ্বাস। আর এই প্রশ্ন উঠলেই তিনি আমাদের মুখোমুখি এসে দাঁড়ান—আমাদেরও নয়, ইতি-হাসের, যে-ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না, কিন্তু প্রাপ্য চুকিয়ে দিতে চায়। এই ধরনের পরিস্থিতির সামনে আমরা দেখি মোতা-হের হোসেন চৌধুরীর পূর্ণ পরিচয়-পত্র এগিয়ে দিচ্ছে সমকালীন সাহিত্য-ইতিহাস।

২

যে-কোনো ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে হলে দেশ ও কালের পটভূমিকায় দাঁড় করিয়ে দেখা দরকার। তবে একথাও সত্য, যে-কোনো মানুষের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে দেশ-কালের পরিবেশ ছাড়াও ব্যক্তি-সত্তার এমন কিছু দান থাকে, যাকে শুধু দেশ-কালের যুক্তি-পটভূমি সাজিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না, যার উৎস অজ্ঞাত, অনির্দেশী ও রহস্যময়, যার সামনে এলে আমাদের চুপ করে যেতে হয়।

বহুবিভিন্ন দিগন্ত থেকে মোতাহের হোসেন চৌধুরীর উপর আলো এসে পড়েছিলো। যদিও শেষ পর্যন্ত যে-কোনো সৎ

লেখকের মতোই তাঁর নিজস্ব কিছু থাকে, যার জন্যে তাঁকে চেনা যায়। তাঁর উপরে যেমন দেশজ কোনো-কোনো ব্যক্তির প্রভাব দেখি, তেমনি তিনি কোনো কোনো মহৎ বৈদেশিকের অংশ-ভাগী : একদিকে আছেন প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অপরদিকে বার্ট্রাণ্ড রাসেল ও ক্লাইভ বেল্। একেবারে আক্ষরিক ভাবে সত্য না-হলেও, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে প্রেম-সুন্দর-আনন্দ-কল্যাণ প্রভৃতি ভূমি ও ভিত্তি দান করেছেন ; প্রমথ চৌধুরী তাঁকে শিখিয়েছেন রচনারীতি এবং জুগিয়েছেন কোনো কোনো প্রসঙ্গে উৎসাহ ; মুক্তবুদ্ধির দীক্ষা নিয়েছেন তিনি বার্ট্রাণ্ড রাসেল ও তৎকালান বাঙালী মুসলিম একদল জাগ্রত সন্তান-গোষ্ঠীর সঙ্গে ; আর ক্লাইভ বেল তাঁকে পরামর্শ দিয়েছেন সভ্যতার বীজমন্ত্র। সমকালের দুটি পত্রিকা ও আন্দোলনের প্রভাবও আছে তাঁর উপরে : 'সবুজপত্র' এবং 'শিখা'। 'শিখা' ছিলো ঢাকায় স্থাপিত (১৯২৬) 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজে'র মুখপত্র ; এঁদের মন্ত্র ছিলো 'বুদ্ধির মুক্তি' : অর্থাৎ তৎকালীন ঘুমিয়ে থাকা মুসলমানের মধ্যে নির্মল, উদার ও মুক্ত আলোহাওয়া পরিবেশন। পক্ষান্তরে, প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সবুজপত্র' এক হিসেবে ঋতু ও জাগ্রত মননের চর্চা করেছিলো, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৎকালীন নবজন্মের জন্যে সদর্থে তাকেই দায়ী করা যায়। 'সবুজপত্র' এবং 'শিখা'র সাযুজ্য নানা দিক থেকেই লক্ষণীয় : সবচেয়ে বড়ো মিল মননের মুক্তির দিক থেকে, যে-কারণে 'সবুজপত্রে' প্রবন্ধ ছিলো প্রধান আকর্ষণ এবং 'শিখা'র লেখকেরাও ছিলেন মুখ্যত প্রাবন্ধিক। প্রমথ চৌধুরী তো মুখ্যত প্রবন্ধকার ছিলেনই, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর সংস্পর্শে এসে তুমুলভাবে পরিবর্তিত হলেন : তার একটিমাত্র উল্লেখ করছি, 'গল্পগুচ্ছে'র তৃতীয় খণ্ডে পূর্ববর্তী রচনার গল্পাংশের ভার ঝরে গিয়ে বুদ্ধির কান্তি ঝলসে উঠলো। আর 'শিখা' গোষ্ঠীর যাঁরা প্রধান ছিলেন, সেই সৈয়দ আবুল হোসেন, কাজী আবদুল

ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ ছিলেন মূলতঃ বুদ্ধিজীবী?। প্রমথ চৌধুরীর তীব্র ও প্রচণ্ড প্রভাব বাংলা সাহিত্যে যে কিভাবে জয়ী হয়েছে তার আরেকটি প্রমাণ শিখা গোষ্ঠীর লেখকদের উপর তাঁর দূরপ্রভাব। প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রবন্ধ-প্রবাহে বিরাট এবং এখনো সক্রিয়: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সবুজপত্রের লেখকেরা, শিখা গোষ্ঠীর লেখকেরা, এমনকি তিরিশের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লেখকদের উপর তাঁর রুচির স্বাক্ষর দেখা যায়। সে যাই হোক, অতঃপর এটা মেনে নিতে কোনো দ্বিধার কারণ নেই যে, মোতাহের হোসেন চৌধুরীর উপরে প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

স্মরণীয় যে, একটু-আধটু কবিতাচর্চা মোতাহের হোসেন চৌধুরী করেছেন, তবে তা কোনো দিনই তাঁর মনোযোগের প্রধান লক্ষ্য ছিলো না (এবং কবিতাতেও তিনি গুরু প্রমথ চৌধুরীর প্রিয় রূপকল্পে—সনেটে মুক্তি খুঁজে পেয়েছেন)।

এই সঙ্গে বাঙালী-মুসলিম সমাজের পটদেশটিও মনে রাখা দরকার। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাহিত্যিকদের প্রধান অংশটিই বুদ্ধিবাদে আক্রান্ত; উনিশ শতকের সেই প্রথম পর্ব থেকে আজ পর্যন্ত সৃষ্টিশীলতার চেয়ে মননের রাস্তাই মুসলিম লেখক সমাজে অধিক প্রবল; বিভিন্ন ধর্মীয়, রাষ্ট্রিক, জাতীয় ও সাহিত্যিক দ্বন্দ্বে তর্কে আরক্তিম। মোতাহের হোসেন চৌধুরী এই প্রধান পথের পথিক হলেও তিনি ধর্ম-রাষ্ট্র জাতির বহিরঙ্গ বিশ্লেষণেই তাঁর সমস্ত উদ্যম ব্যয় করেননি বরং মানবস্বভাবের শাশ্বত দিক-টিতেই বেশী জোর দিয়েছিলেন—যেখানে ব্যক্তি বড়ো এবং ব্যক্তির মুক্তিই প্রধান সমস্যা।

৩

মোতাহের হোসেন চৌধুরীর আলোচনা-সমালোচনার ভূমিতল থেকে মঞ্জুরিত হচ্ছে প্রেম-কল্যাণ আনন্দ-সুন্দর প্রভৃতি; এক

সুন্দরের স্বপ্নে বিভোর তিনি, আদর্শ এখানে অত্যন্ত বড়ো কথা। কামের চেয়ে প্রেমের দাম অনেক বেশী—এক কথায় উনবিংশ শতাব্দীর মূল্যবোধ অবিরল নিঃসৃত হচ্ছে তাঁর রচনাধারার মধ্য দিয়ে। এই নিঃসরণের পরিসর বৃহৎ, তাই তাঁর চেতনার সূচী-পত্রে পাই সংস্কৃতি, সুন্দরচেতনা, ব্যক্তির সঙ্গে বিবিধ সম্পর্ক, জাতীয়তা, সাম্প্রদায়িকতা, সাহিত্য প্রভৃতি বিভিন্ন স্তর। লক্ষণীয় যে তাঁর ভাবনাবৃত্তে সাহিত্যও আছে কিন্তু তা প্রধান নয়, ততটুকুই—যতটুকু সংস্কৃতির প্রয়োজনে লাগে, ব্যক্তির প্রয়োজনে লাগে, ব্যক্তির মুক্তি ও উন্নতির কাজে লাগে। আবার তাঁর সাহিত্যবোধে দেখি এক উদার নির্মল ও আত্মসম্মানী আবহ। বিশেষত, সদ্যস্বাধীন দেশে যখন সাহিত্যাদর্শ নিয়ে বিবিধ তর্কের কোলাহল ফেনিয়ে উঠেছিলো তখন তাঁর নির্দ্বন্দ্ব ও পরিণত সাহিত্যবোধ সশ্রদ্ধ আলোচনার বিষয়। মোতাহের হোসেন চৌধুরীর ভাবনা ব্যক্তিকেন্দ্রিক : সংস্কৃতি তথা প্রেম-সুন্দর-কল্যাণ আনন্দ প্রভৃতি ব্যক্তির উন্মেষের উপায় ; তাই সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোত সুখসন্ধান ও সভ্যতার প্রচেষ্টা। সংস্কৃতি তাঁর কাছে 'ব্যক্তি-তান্ত্রিক', সভ্যতার কাজও তা-ই, আর সুখবিজয়ের মূলেও সে-ই। কোনো গোঁড়ামি নয়, একদেশদর্শিতা নয়—তীব্রতা ও প্রচণ্ডতা নয় ; এক সুচারু ও ভারসাম্যময় মধ্যপথ তাঁর অবলম্ব। এটা অবশ্য ভীরুর গন্তব্য নয় বরং এখানে শক্তি ও সুন্দরের সাহস ও রুচির সহ-অবস্থান। সংস্কৃতির অর্থ তাই মোতাহের হোসেন চৌধুরীর কাছে এক ক্রমাগত আত্মশোধন ও পরিগ্রহণের বাণীলিপি ; অন্ধকার ঘরে লতাগাছ যেমন আলোকিত জানালার দিকে মুগ্ধভাবে অগ্রসর হতে থাকে তেমনি তাঁর সমগ্র রচনার মধ্য দিয়ে তিনি প্রেম-সুন্দর-কল্যাণ-মঙ্গলের দিকে উন্মীলিত হতে চেয়েছেন। তাঁর প্রার্থনা কবিতাটির কাব্যমূল্য যাই থাক না কেন, এর ভিতর দিয়ে মোতাহের হোসেন চৌধুরী যেন তার আনুপূর্বিক

ভাবনা-বেদনার গহন সারাংশ রচনা করে দিয়েছেন : রচনাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হলো :

প্রার্থনা

[প্রাভাতিক]

হে আল্লাহ্! ? অস্তিত্বহীন।
বুদ্ধি দাও, শান্তি দাও, অনুভূতি দাও, কল্পনা দাও।
সৃষ্টিপথের মর্মকোষের মধুপানের ক্ষমতা দাও।
জীবনকে আনন্দিত করো, সার্থক করো, উজ্জ্বল করো।
উদ্যোগী করো, প্রাণবান করো, নিষ্ঠাবান করো।
অন্তরে নিয়ত শিখার মতো জ্বলো—
বিবেক রূপে, বিচার-বুদ্ধি রূপে।
আমার প্রার্থনা খাঁটি করো, খাঁটি করো, খাঁটি করো!

[সান্ধ্য]

হে আল্লাহ্! ? মূর্খ
জীবনকে পবিত্র করো, শান্ত করো, স্নিগ্ধ করো।
অবসাদ দূর করো, অবসাদ দূর করো, অবসাদ দূর করো।
ইতর লোভের নাগপাশ থেকে মুক্তি দাও।
পদ্মের মতো পঙ্কিলতার ঊর্ধ্বে ওঠার শক্তি দাও।
আনন্দ গ্রহণের ক্ষমতা দাও, আনন্দ দানের ক্ষমতা দাও।
ফুলের মতো ফুটে ওঠার ক্ষমতা দাও।
আমার প্রার্থনা খাঁটি করো, খাঁটি করো, খাঁটি করো॥

('সমকাল', কবিতা সংখ্যা)

৪

বর্তমান পুস্তকটি বার্ট্রাণ্ড রাসেলের 'দি কনকোয়েস্ট অব হ্যাপিনেস' গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হয়েছে; মোতাহের হোসেন চৌধুরী বহুলাংশে উক্ত বইটির অনুবাদ করেছেন এবং অনূদিত প্রবন্ধগুলির ভিতরে-ভিতরে অনেক সময় নিজস্ব মতামত গেঁথে দিয়েছেন।

এই রীতি অভিনব, সন্দেহ নেই ;—মোতাহের হোসেন চৌধুরীর পূর্ব প্রকাশিত 'সভ্যতা' গ্রন্থখানিও একইভাবে রচিত : সেখানি তিনি ক্লাইভ বেলের 'দি সিভিলাইজেশন' গ্রন্থ অবলম্বনে রচনা করেছেন এবং মাঝে-মাঝে তৃতীয় বন্ধনীর ভিতরে নিজের কথা পুরে দিয়েছেন। সভ্যতা গ্রন্থের মতো বর্তমান বইখানিও দায়ে পড়া কাজ-চালানো অনুবাদ নয় ; এই পুস্তকটিতে নিশ্চয় মোতাহের হোসেন চৌধুরী তাঁর আদর্শের ও ভাবনা-বেদনার প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন, অথবা ঘুরিয়ে বলা চলে, এই বইখানি তাঁকে এরকম-ভাবে মুগ্ধ ও মোহিত করেছিলো যে তার অনুবাদ না করে তার উপায় ছিলো না। এবং এই অনুবাদও অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ, অব্যাহতভাবে বয়ে গেছে, এই অনুবাদের ভাষার প্রসাদগুণ যে-কোনো পাঠককে আকর্ষণ করবে এটা আশা করা যায়। মাঝে-মাঝে স্বকীয় উক্তি চারিয়ে দিয়ে তিনি রচনাগুলি প্রায় নিজস্ব ও ঘরোয়া করে তুলেছেন—তরতর করে পড়ে ফেলা যায়, পড়ার সময় মনে হয় না যে, অনুবাদ পড়ছি : কখনো দেখি, চেনা কবিতার, চেনা প্রবাদের সুযৌক্তিক উদ্ধৃতি। এই বইটি যদি কোনো বাঙালী পাঠক একটু মনোযোগ দিয়ে পড়েন, তিনি ব্যক্তি-জীবনে উপকৃত হতে পারেন। কেননা, বইটি এমন এক মুক্ত মনীষীর রচনা, যিনি এই শতাব্দীর অন্যতম প্রধান বুদ্ধিজীবী বলে স্বীকৃত, হয়তো জীবিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ এবং এটাও উল্লেখযোগ্য : বাংলা ভাষায় এ ধরনের রচনা বিরল।

'দি কনকোয়েস্ট অফ হ্যাপিনেস' গ্রন্থে রাসেলের ভূমিকাটি এখানে সম্পূর্ণ অনুবাদ করে দিচ্ছি, যাতে পাঠক মূল রচয়িতার উদ্দেশ্য অবহিত হতে পারেন :

> 'এই বইটি জ্ঞানী পাঠকদের জন্যে নয়, কিংবা তাঁদের জন্যেও নয়, যাঁরা একটা বাস্তব সমস্যাকে শুধুমাত্র আলাপ-আলোচনার বিষয় বলে মনে করেন।

> কোনো সম্পূর্ণ দর্শন বা গভীর পাণ্ডিত্য পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে পাওয়া যাবে না। আমার কেবল লক্ষ্য ছিলো, সাধারণ বোধ বা কাণ্ডজ্ঞানের প্রেরণায় জাগ্রত কয়েকটি মন্তব্য এক সঙ্গে রাখা। পাঠকদের জন্যে আমি যে ব্যবস্থাপত্র দিলাম. তার জন্যে আমি কেবল যা দাবী করতে পারি, তা হলো এই যে এগুলি আমার নিজের অভিজ্ঞতা ও দর্শনে দৃঢ়ীভূত এবং যখনই আমি এই সব অনুসরণ করে চলেছি তখনই তা আমার সুখ বর্ধন করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি সাহস করে আশা করতে পারি যে, বহু সহস্র অসুখী নর-নারীর মধ্যে অন্ততঃ কিছু লোক তাঁদের অবস্থা নির্ধারণ করতে পারবেন এবং পাবেন প্রস্তাবিত রোগমুক্তির উপায়ও। আমি এই বিশ্বাসে বইটি লিখেছি যে বহু অসুখী মানুষ সু-নির্দেশী প্রচেষ্টার বলে সুখী হতে পারবেন।'

রাসেলের কথার ভিতরে-ভিতরে মোতাহের হোসেন চৌধুরী যেসব নিজের কথা পুরে দিয়েছেন, সেগুলি অধিকাংশই অবশ্য কথার পিঠে কথা, কোথাও মূলের বিশদ বিশ্লেষণ, কোথাও আরো অগ্রসর হয়ে আপন ভাবনার উৎসারণ, কখনো উদাহরণ-সহযোগে পূর্বোক্তির ব্যাখ্যা করেছেন, কখনো বা চলে গেছেন নিজের জগতে ; —যেমন 'সুখী মানুষ' প্রবন্ধের শেষাংশে নিজের কথা বলছেন. 'যা জীবনদায়ী' তা-ই সুখদায়ী। কালচারের উদ্দেশ্য তাই সুখ সাধনা। নিজেকে ও অপরকে খুশি করে তোলার কায়দাটি না-জানলে কালচার্ড হওয়া যায় না।' এই যে সংস্কৃতি-প্রসঙ্গে চলে যাওয়া, নিজের জগতে ফেরা—এ থেকেই বোঝা যায়, মোতাহের হোসেন চৌধুরীর ভাবনার একটি স্বকীয় বলয় আছে এবং তাঁর মৌলিক রচনা বা অনুবাদ সব কিছুই সেই অনন্ত প্রসঙ্গে তেল জুগিয়ে যাচ্ছে।

পুস্তকটির সম্পাদনা প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলা দরকার।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, মোতাহের হোসেন চৌধুরীর বর্তমান পুস্তকটি বার্ট্রাণ্ড রাসেলের 'দি কনকোয়েস্ট অফ হ্যাপিনেস' গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হয়েছে; মধ্যে মধ্যে তৃতীয় বন্ধনীর অন্তর্ভুক্ত যে কথাগুলি গ্রথিত আছে, সেগুলি মোতাহের হোসেন চৌধুরীর নিজস্ব উক্তি। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের 'দি কনকোয়েস্ট অফ হ্যাপিনেস' বইটিতে মোট সতেরোটি প্রবন্ধ আছে; বইটি 'দুঃখের কারণ' ও 'সুখের কারণ' এই দুই খণ্ডে বিভক্ত। মোতাহের হোসেন চৌধুরী এই পুস্তকের মোট চৌদ্দোটি প্রবন্ধের অনুবাদ করেছেন,—অন্তত পত্রিকা ও তাঁর পাণ্ডুলিপি ঘেঁটে তা-ই আমরা পেয়েছি। এই পুস্তকের প্রথম মুদ্রিত প্রবন্ধ 'দুঃখবাদ' মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'সংস্কৃতি কথা'য় পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিলো। প্রবন্ধটি আইনত এই পুস্তকেরই অন্তর্ভুক্ত এবং এই পুস্তকটিকে যথাসম্ভব সম্পূর্ণতা দেয়ার জন্যে প্রবন্ধটিকে এখানে স্থান করে দিতে হলো।

এখানে অনূদিত প্রবন্ধ ও মূল প্রবন্ধের শিরোনামাগুলি পাশাপাশি সজ্জিত করে দিলাম:

১। দুঃখবাদ: Byronic Unhappiness.

২। প্রতিযোগিতা: Competition.

৩। অবসাদ: Fatigue.

৪। পাপসচেতনতা: The Sense of Sin.

৫। নির্যাতন-স্পৃহা: Persecution Mania.

৬। জনমত-ভীতি: Fear of Public Opinion.

৭। সুখের কথা: Is Happiness Still Possible?

৮। উপভোগ-ক্ষমতা: Zest.

৯। স্নেহমমতা ও ভালোবাসা: Affection.

১০। পরিবার : The Family.

১১। কাজ : Work.

১২। নৈর্ব্যক্তিক অনুরাগ : Impersonal Interests.

১৩। চেষ্টা ও বিরতি : Effort and Resignation.

১৪। সুখী মানুষ : The Happy Man.

অনূদিত প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো। কোনো কোনোটি এখানে সরাসরি পাণ্ডুলিপি থেকে গৃহীত হলো। দু'একটি ক্ষেত্রে একটি প্রবন্ধের একাধিক অনুবাদও পাওয়া গেছে।

অনূদিত প্রবন্ধগুলির বিন্যাস সাধনে মূল পুস্তকের পরিকল্পনা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যথাসাধ্য অনাহত রাখবার চেষ্টা করেছি।

বাংলা বানান প্রায় সর্বত্র মূলের (পত্রিকায় বা পাণ্ডুলিপিতে যেমন ছিলো) অনুগামী রেখেছি: ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত দু'একটি রচনার কিছু কিছু সংশোধন তিনি করেছেন, সেখানে দেখা যায় তাঁর বানান পদ্ধতি মোটামুটিভাবে আধুনিক রীতির অনুসারী।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, কোনো কোনো প্রবন্ধের একাধিক অনুবাদ করেছেন মোতাহের হোসেন চৌধুরী। সেগুলি বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্যে কপি নয়। কারণ, একই রচনার দু'টি অনুবাদের ভেতর মাঝে মাঝে বক্তব্য সংস্থাপন এবং ভাষার পার্থক্য দেখা গেছে। এতে অনুমিত হয় যে, সম্ভবতঃ পূর্বের অনুবাদ সংশোধন এবং পরিমার্জনের জন্যেই তিনি একই রচনা একাধিকবার তর্জমা করেছেন। এখানে একটা কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। মোতাহের হোসেন অত্যন্ত শ্রমসহিষ্ণু লেখক ছিলেন। বিভিন্ন রচনা তিনি বারবার পরিমার্জনা করেছেন, একেকটি শব্দ বারবার বদলেছেন যতক্ষণ না মনোমত শব্দটি পাওয়া গেছে তিনি তৃপ্ত হননি।

সানাউল হক

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড : দুঃখের কারণ

দুঃখবাদ

অন্যান্য কালের মতো এ কালেও ভাবা হচ্ছে : প্রাজ্ঞ লোকেরা যখন এই ধারণায় উপনীত হয়েছেন যে, এই পৃথিবী দুঃখময়—এখানে বাঁচবার মতো কিছুই নেই, তখন এখানে সুখ প্রত্যাশা না করাই ভালো। যাঁদের কথা বলা হলো তাঁরা যদি বৈরাগী হতেন তো এক কথা ছিল, কিন্তু তাঁরা যখন নিজেরাই ভোগী-শিরোমণি তখন তাঁদের কথায় আর আস্থা স্থাপন না ক'রে থাকা যায় না। আপনি যদি সত্যি সত্যি একটা ফল মুখে দিয়ে 'থু' ক'রে মুখ বাঁকান তো আমার আর ও ফলটি চোখে দেখবার সাধ থাকতে পারে না। আপনার দেখাদেখি আমারও 'থু' করে মুখ বাঁকাবার ইচ্ছে হবে। অতিভোগের পরে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সংস্কৃতিবানরাই যখন মুখ বাঁকান—যেন তেতো কিছু খাচ্ছেন এমনি ভাবে, তখন সংস্কৃতির নতুন দাবীদাররাও যে তা-ই করতে চাইবে তাতে আর আশ্চর্য কি? সকলেই তো উঁচু নাকের পরিচয় দিতে ভালবাসে আর উঁচু-নাকওয়ালা সাজবার সহজ উপায় হচ্ছে পৃথিবীতে উপভোগ করবার মতো কিছুই নেই, এমনি ভাব দেখানো।

এই ধারণার বশবর্তীরা সত্যিই দুঃখী। কিন্তু সাধারণের দুঃখ আর তাদের দুঃখের মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে। সাধারণ লোকেরা তাদের দুঃখের জন্য গর্ববোধ করে না, কিন্তু তারা করে। জগতে উপভোগ্য কিছুই নেই, একথা ব'লে তারা একটি উন্নাসিক শ্রেষ্ঠতা-বোধের পরিচয় দেয়। তাদের গর্ব দেখে সাধারণের মনে একটা খটকা লাগে : 'দুঃখের জন্য গর্ব', তা আবার কি রকম ব্যাপার?

এ-তো 'সোনার পাথর বাটি'র মতো একটা অসম্ভব কিছু। হয় তাদের গর্বটা মিথ্যা, নয় দুঃখটা,—এই তাদের সিদ্ধান্ত হয়ে দাঁড়ায়। সত্যি কথা। দুঃখের মধ্যে যে আনন্দ পায়, তার আবার দুঃখ কিসের? তার শ্রেষ্ঠতাবোধের মধ্যেই তো একটা ক্ষতিপূরক দিক রয়েছে। কিন্তু তাই বলে তাকেই যথেষ্ট বলা যায় না। অহংকার-বোধ যে সুখের যোগান দেয় প্রকৃত সুখের তুলনায় তা অকিঞ্চিৎকর।

নিজেকে দুঃখী ভেবে গর্ববোধ করার মধ্যে কোনো প্রকার উন্নত ধরনের যৌক্তিকতা আছে ব'লে আমার মনে হয় না। তা বিকৃত বুদ্ধিরই পরিচায়ক। দুঃখের জন্য গর্ব না করে বুদ্ধিমান মানুষ যতটা সম্ভব সুখ আদায় করে নিতে চাইবে, এটাই তো স্বাভাবিক। তারা যদি মনে করে জাগতিক চিন্তা একটা সীমা পেরিয়ে গেলেই সুখের কারণ না হয়ে দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তো তারা জগতের চিন্তা না ক'রে অন্য কিছুর চিন্তা করবে। মোট-কথা, সুখের দিকেই তাদের ঝোঁক হবে, দুঃখের দিকে নয়। 'দুঃখই সত্য' এ কথা প্রমাণ করতে গিয়ে যারা বিশ্বপ্রকৃতির মূলেই দুঃখের নিদান দেখতে পায়, তারা প্রকৃতপক্ষে 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপাবার চেষ্টা করে। আসল ব্যাপারটি এই যে, নিজের দুঃখের কারণটি বের করতে না পেরে তারা শেষে বিশ্বপ্রকৃতির উপরেই সমস্ত দোষ চাপিয়ে দেয়। বিশ্বপ্রকৃতিতে যে-সকল নৈরাশ্যব্যঞ্জক দিক রয়েছে তাদের উপর আঙ্গুল রেখে বলে: বিশ্বের মূলেই যখন নিষ্ঠুরতা, তথা দুঃখের খেলা তখন তার থেকে সুখ প্রত্যাশা না করাই যুক্তিসঙ্গত। এসো, সুখের কামনা ভুলে গিয়ে নিজেকে দুঃখের জন্যে প্রস্তুত ক'রে তুলি; তা হলেই আর প্রবঞ্চিত হওয়ার ভয় থাকবে না। মিথ্যা খেয়ালী পোলাও খাওয়ার চেষ্টা না করে যা সত্য, নিষ্ঠুর হলেও স্বীকার করে নেওয়াই ভালো।

উপরে যে দুঃখবাদী দর্শনের উল্লেখ করা হলো, আমেরিকার পাঠকদের জন্য তা পরিবেশন করেছেন জোসেফ উড্ ক্রুচ তাঁর

'দি মডার্ন টেম্পার' নামক গ্রন্থে। আমাদের পিতামহদের জন্য তা পরিবেশন করেছিলেন কবি বাইরন। আর সমস্ত কালের লোকদের জন্য তা লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন 'ইক্লেজিয়েট্সে'র লেখক। ক্রুচ বলেছেন :

"আমাদের কোনো ভরসা নেই। প্রাকৃতিক বিশ্বে আমাদের জন্য এতোটুকু সুখের স্থানও নেই। তথাপি মানুষ হয়ে জন্মেছি ব'লে আমরা দুঃখিত নই। পশু হিসেবে বাঁচার চেয়ে মানুষ হিসেবে মরে যাওয়া অনেক ভালো"।

আর বাইরন যা বলেন তাতো সকলের জানা :

'যে-আনন্দ নিয়ে যায় কাল, কভু নাহি দেয় তাহা ফিরে,
যৌবনের ভাবের গরিমা ডুবে যায় কাল-সিন্ধু নীরে।"

এখন ইক্লেজিয়েট্সের লেখকপ্রবর কি বলেন, দেখা যাক। তিনি বলেন :

"এই জন্যই আমি বেঁচে-থাকা মানুষদের চেয়ে মরে-যাওয়া মানুষদের অধিক গুণকীর্তন করি। হ্যাঁ, তাঁদের চেয়েও ভালো হচ্ছেন তাঁরা—যাঁরা এখনও জন্মাননি এবং যেহেতু সূর্যের আলোর নীচে যে-সব মন্দ ব্যাপার ঘটে তা প্রত্যক্ষ করেননি।"

এই অশুভদর্শী ব্যক্তি-ত্রয়ের প্রত্যেকে প্রচুর সুখভোগের পরেই এই নিরানন্দ দর্শনে এসে পৌঁছেন। ক্রুচ বাস করেছিলেন নিউ-ইয়র্কের সুখভোগী ইন্টেলেক্চুয়ালদের মধ্যে। বাইরন সাঁতরে-ছিলেন ভোগের নদী। ইক্লেজিয়েট্সের রচয়িতাও ভোগের ব্যাপারে কম যাননি। সুরা, সঙ্গীত ও অনুরূপ অন্যান্য ব্যাপারে তাঁর জুড়ি ছিল না বললেই চলে। দাস-দাসী ছিল তাঁর বিস্তর, সরোবরও তিনি খনন করিয়েছিলেন। ভোগের আয়োজনে কোনো কিছুই তিনি বাকি রাখেননি। তথাপি তিনি দেখতে পেলেন সকলই ফাঁকি মায়া—এমনকি জ্ঞানও।

"আর আমি জ্ঞান-আহরণে মনোনিবেশ করলুম, নির্বোধ মমতায় জীবনের স্বাদও নিলুম। কিন্তু ততঃ কিম? তাতে তো আত্মার বিক্ষোভই বাড়ে, কমে না। কারণ যত বেশী জ্ঞান বাড়ে, তত বেশী দুঃখও বাড়ে।' জ্ঞান বাড়িয়ে তুমি দুঃখই বাড়াও।"

মনে হয়, তাঁর জ্ঞান তাঁকে ঘাবড়ে দিয়েছিল। জ্ঞান প্রেম, ভোগ, বিলাস সমস্ত কিছুই তাঁর কাছে ফাঁকি, অন্তঃসারশূন্য বোধ হলো ব'লে জীবন তাঁর কাছে ঘৃণার বস্তু হয়ে দাঁড়ালো। সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে তিনি দুঃখকেই মানব-ভাগ্য ব'লে মেনে নিলেন।

এখন এই যে মনোভঙ্গী, এ সচেতন বুদ্ধি-লোকের ব্যাপার নয়, অবচেতন ভাবলোকের ব্যাপার। অর্থাৎ, এটি চিন্তার বিষয় নয়, 'মুড্' বা মনোভাবের বস্তু। তাই এর পরিবর্তন ঘটতে পারে কেবল কোনো শুভ ঘটনার সংযোগে অথবা শরীরগত পরিবর্তনে—তর্ক ক'রে কখনো নয়। জীবন অনেকদিন আমার কাছেও ফাঁকাফাঁকা মনে হয়েছে। কিন্তু এই শোচনীয় অবস্থা থেকে আমি মুক্তি পেয়েছি কোনো ফিলজফি পড়ে নয়—অনিবার্য কর্মপ্রেরণায়। আপনি যতই অবসাদ বোধ করেন না কেন, এমন সময় আসবেই যখন আপনি কাজ না ক'রে থাকতে পারবেন না, আর কাজের সংগে সংগে আপনার অগোচরেই আপনার অবসন্নতা বাষ্পের মতো মিলিয়ে যাবে। সূর্য যেমন মেঘের শত্রু, কাজও তেমনি অবসাদের দুশমন। আপনার ছেলে যদি পীড়িত হয়ে পড়ে তো নিশ্চয়ই আপনি দুঃখ বোধ করবেন। কিন্তু আপনার কাছে জগৎ অসার মনে হবে না। বরং জীবনের মূল্য আছে কি নেই, একথা না ভেবেই আপনি আপনার ছেলেকে সারিয়ে তুলতে চাইবেন। সত্যকার দুঃখীরা জীবনকে কোনদিন ফাঁকি মনে করে না। জীবনের প্রতি আকর্ষণ তাদের ষোল আনা। 'জীবন ফাঁকি' বলার প্রবণতা রয়েছে শুধু অবসরভোগী ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে। কিন্তু ধনী লোকটি যদি ভাগ্যের

চক্রান্তে সর্বস্ব খুইয়ে বসে তো পরের বেলার আহারটুকুকে সে আর ফাঁকি বলে উড়িয়ে দিতে পারবে না। জীবনের চাহিদাগুলি সহজে মিটলেই এ ধরনের রুগ্ন মনোভাবের জন্ম হয়। অন্যান্য প্রাণীর মতো মানুষের জন্যও জীবন-সংগ্রামের প্রয়োজন আছে। প্রচুর ধনাগমের ফলে মানুষ যখন সহজে একরকম বিনা চেষ্টায়ই তার খেয়াল মেটাতে সক্ষম হয়, তখন সে আর জীবনের স্বাদ পায় না চেষ্টার অভাবের দরুন সুখের উপাদানে ঘাট্‌তি ঘটে। 'আকাঙ্ক্ষার পূর্তিতে সুখ নেই'—এ উক্তি কেবল তারই হয়ে থাকে, কামনার বস্তু-গুলি যে অত্যন্ত সহজে পায়। এই লোকটি যদি দার্শনিক গোছের হয় তো সহজে এ সিদ্ধান্তে এসে পৌছে যে, যে-ব্যক্তিটি অনায়া-সেই তার শখ মেটাতে পারে সে-ই যখন সুখী নয়, তখন দুনিয়া স্বভাবতঃই দুঃখের। কোন কোন প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাবই যে সুখের হেতু, এ-কথাটা হতভাগ্য দার্শনিকটির মনে থাকে না।

এ গেলো 'মুড্‌' বা মনোভাবের ব্যাপার। যুক্তি-তর্কের ব্যাপারও ইক্‌লেজিয়েট্‌সে আছে। ইক্‌লেজিয়েট্‌স্‌-কার জীবনের অসারতা সম্বন্ধে যে-মতটি ব্যক্ত করেছেন হালের দার্শনিকদের হাতে তা নিম্নরূপ অভিব্যক্তি পেতো :

মানুষ অনবরত খেটে চলেছে, বস্তুও এক অবস্থায় স্থির নেই। তথাপি এমন কিছু সৃষ্টি হচ্ছে না যা চিরত্ব দাবী করতে পারে। বড় রকমের কোনো পরিবর্তনই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। পূর্বের ব্যাপারের সংগে পরের ব্যাপারের পার্থক্য অল্পই। সেই থোড়-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-থোড়। মানুষ মরে যায়, ছেলে এসে তার পরিশ্রমের ফল ভোগ করে। আবার তার ছেলে তাকে অনুসরণ করে। নদী সমুদ্রের দিকে যায় কিন্তু সেখানেও তার জল আটকে থাকে না—কেবলই সরে সরে যায়। বার বার উদ্দেশ্যবিহীন চক্রে মানুষ ও বস্তু ঘুরছে। অন্তহীন পরিণতিহীন এই ঘূর্ণন। এতে কী লাভ? নদী যদি বুদ্ধিমান হতো তো সে যেখানে আছে

সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকতো—চপলতা দেখিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতো না। সোলেমান যদি বুদ্ধিমান হতেন তো ছেলের ভোগের জন্য গাছ লাগিয়ে যেতেন না। বুদ্ধিমান লোকের কাছে সব ফাঁকি সব মায়া। এই ফাঁকির ফাঁদে ধরা দেয় কেবল বোকারাই। অতএব, নিজের বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা যদি প্রতিপন্ন করতে চাও তো ও-পথ মাড়িও না। অবজ্ঞা করো, পৃথিবীকে অবজ্ঞা করো। ফিরেও তার দিকে তাকিও না।

কিন্তু অন্যভাবে দেখতে গেলে পৃথিবী কত সুন্দর, কত বিচিত্র। কত নিত্যনতুন ব্যাপার ঘটছে এখানে। সূর্যের নীচে নতুন কিছু নেই, না? তা হলে এই যে আকাশ-ছোঁয়া ইমারত, উড়োজাহাজ, বেতারবার্তা—এসব কি? সোলেমান এসবের কি জানতেন? মনে করুন, সেবার রাণী তাঁর শাসনাধীন দেশসমূহ থেকে ফিরে এসে রেডিওর মারফত প্রজাদের কাছে বক্তৃতা দিচ্ছেন। সোলেমান তা শুনে কি খুশী হতেন না? না, তাও তাঁর কাছে বৃক্ষ ও পুকুরের মতো একঘেয়ে মনে হতো? তাঁর কালে খবরের কাগজেরও চল্ ছিল না। কেউ যদি তাঁকে সংবাদপত্র থেকে তাঁর হারেম ও ইমারতের প্রশংসা-বাণী অথবা তাঁর সংগে তর্কযুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী ঋষি কুলের নাজেহাল হওয়ার কথা পড়ে শোনাতেন, তা হলে কি তিনি জীবনের নতুনতর স্বাদ পেতেন না? না, তাও তাঁর কাছে জলো, অর্থবিহীন মনে হতো? অবশ্য নৈরাশ্যবাদ দূর করার জন্য এগুলিই যথেষ্ট নয়, এদের বর্তমানেও তা থেকে যেতে পারে। আর প্রকৃতপক্ষে হয়েছেও তাই। ইক্লেজিয়েট্স্-রচয়িতা মুখ কালো করেছিলেন নতুনত্বের অভাব দেখে, ক্রুচ করেছেন নতুনত্বের প্রাচুর্যের দরুন। দুই বিপরীত কারণ একই ব্যাপারের জন্ম দিতে পারে না। সুতরাং বুঝতে পারা যায়, কারণ হিসেবে তারা তেমন জোরালো নয়। নদী পড়ে গিয়ে সমুদ্রে, তথাপি সমুদ্র যেমনটি ছিল তেমনটিই থাকে, তার বৃদ্ধি হয় না; জলধারা যেথান থেকে আসে সেখানেই আবার

ফিরে যায়।—এটা যদি একটা দুঃখের কারণ হয় তো ভ্রমণে কেউ আনন্দ পেতো না। লোকেরা গরমের দিনে হাওয়া বদলে যায় গরমের শেষে আবার ফিরে আসতেই। তাই ব'লে হাওয়া বদলটা দুঃখজনক, এমন কথাতো কেউ বলে না। বরং তা থেকে আনন্দই পাওয়া যায়। জলধারার যদি অনুভব ক্ষমতা থাকতো তো এই ঘূর্ণনে সে শেলীর মেঘের মতো আনন্দই বোধ করতো, দুঃখ নয়। জীবনের স্পন্দনই বড় কথা। বরাবরই একটি ব্যাপার ঘটলেও তা যদি জীবনের স্পন্দনে স্পন্দিত হয় তো তাকে আর বিরক্তিকর মনে হয় না। ভবিষ্যতের সুপরিণতির দিকে তাকিয়ে বর্তমানের বিচার করা ভুল। বর্তমানের নিজেরই একটা মূল্য আছে। অংশ-গুলির মূল্য না থাকলে সমগ্রেরও কোনো মূল্য থাকতে পারে না। জীবন আর যাই হোক, 'মেলোড্রামা' নয়। মেলোড্রামায় হাজার দুঃখ-বিপদের মধ্য দিয়ে গিয়েও পরিণামে একটা সুপরিণতি তথা নায়ক-নায়িকার মিলন চোখে পড়ে। জীবনে তেমনটি হয় না। হলে তা একটা কৃত্রিম ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতো। জীবনে কেবল সুপরিণতিরই মূল্য নেই প্রতিটি মুহূর্তেরও মূল্য রয়েছে। আমার কালটি আমি ভোগ করলুম, আমার ছেলে তার কালটি ভোগ করবে, তারপর তাকে অনুসরণ করবে তার ছেলে - এইতো জীবন একথা ব'লে উন্নাসিকতা প্রদর্শনের কি আছে? বরং চির-কাল বেঁচে থাকলেই তো জীবনের স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা কমে আসে। ফলে পরিণামে জীবন বোঝার মতো দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

জীবনের আঁচে তপ্ত করেছি দু'হাত ভাই
আগুন নিবিছে, এবার আমিও বিদায় চাই।

নৈরাশ্যব্যঞ্জক মনোবৃত্তির মতো এ মনোবৃত্তিও যুক্তিসঙ্গত বটে। তা হলে দেখতে পাওয়া যায়, যুক্তি কেবল নৈরাশ্যবাদের পক্ষেই নয়, আশাবাদের পক্ষেও রয়েছে।

ইক্‌লেজিয়েট্‌সের দুঃখের কারণ দেখলুম। এবার ক্রুচের দুঃখের কারণ কি, ভেবে দেখবার চেষ্টা করছি। ক্রুচের দুঃখের গোড়ায় রয়েছে শাশ্বত আদর্শের অভাব। মধ্যযুগে, এমনকি আধুনিককালের শুরুতেও যে সকল আদর্শের জন্ম হয়েছিল তা আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না বলেই তিনি দুঃখিত। তাঁর মতে, আধুনিককালের সংকট আর যৌবন-উন্মুখ অবস্থার সংকট প্রায় এক পর্যায়ের। যৌবন-উন্মুখ অবস্থায় যেমন মানুষ ছেলে-বেলাকার পৌরাণিক কাহিনীর সহায়তা ছাড়া কোনো ব্যাপারেই সুরাহা করতে পারে না আধুনিককালের সংগে পূর্ণ পরিচিতি ঘটেনি বলে এ-কালের মানুষও তেমনি সে-কালের ভাবাদর্শকে এড়িয়ে চলতে পারছে না। মৃত কালের ভাবাদর্শ তাকে ভূতের মতো চেপে ধরেছে তার হাত থেকে সে আর মুক্তি পাচ্ছে না। তাই অভ্যন্তর দ্বন্দ্ব তার ললাটলিপি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্রুচের উক্তি উড়িয়ে দেবার মতো নয়। কেবল সাহিত্য পড়া আধুনিকদের বেলা তার উক্তি বাস্তবিকই সত্য। ভাবাবেগের উপর নির্ভরশীল ব'লে তারা বিজ্ঞানে আস্থা স্থাপন করতে পারে না. উল্টো বিজ্ঞানের খুঁত ধ'রে বেড়ায়। তাই অন্যান্য সাহিত্যপ্রিয় লোকের মতো ক্রুচও বিজ্ঞানের ওয়াদা-খেলাফের অভিযোগ আনেন; কিন্তু বিজ্ঞানের ওয়াদাটা যে কি ছিল, সে-সম্বন্ধে কিছুই বলেন না। শুধু এই বলে আফসোস করেন যে, ষাট বছর আগে ডারউইন ও হাক্সলি বিজ্ঞান থেকে যা আশা করেছিলেন, বিজ্ঞান তা দিতে পারেনি। কিন্তু এ ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল। ভাবমার্গী লেখক ও পুরোহিত শ্রেণীর লোকেরাই নিজেদের বুজুর্গি রক্ষার জন্য এ-ধরনের কথা বলে থাকেন। ক্রুচ্‌ সাহেবও তাঁদের দলে ভিড়েছেন।

বর্তমানে জগতে যে বহু অশুভদর্শী মানুষ রয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। তবে তার কারণ বিজ্ঞানের ব্যার্থতা নয়, অন্য কিছু। যুদ্ধের জন্য যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে,

তারই ফলে এই দুঃখবাদের জন্ম। দুঃখবাদ চিন্তার ব্যাপার নয়, 'মুডের' ব্যাপার। আর 'মুড' সৃষ্টি করে বাস্তব ঘটনা, দর্শন বা জগৎ সম্বন্ধে ধারণা নয়। সুতরাং এ-কালের দুঃখবাদী মনোভাবের জন্য এ-কালের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে দায়ী না ক'রে জগতের বাস্তব অবস্থাকে দায়ী করাই ভালো। ক্রুচ তো বলেছেন, কতকগুলি স্থির বিশ্বাস থেকে চ্যুত হয়েছে ব'লেই আধুনিক কালে মানুষের এই দুরবস্থা। কিন্তু তাঁর মতে সায় দেওয়া যায় না। ইতিহাস তাঁর বিরুদ্ধে। ত্রয়োদশ শতকে তো স্থির বিশ্বাসের কমতি ছিল না, অথচ সে যুগের মতো নৈরাশ্যব্যঞ্জক যুগ বিরল রোজার বেকনের মতে, সে-যুগের কামুকতা ও লোভ কেবল সাধারণের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, যাজক-শ্রেণীও এই পাপস্রোতে ভেসে চলেছিলেন। তিনি বলেন, সে-যুগের ধার্মিকদের তুলনায় প্যাগান-যুগের সাধু-পুরুষরা অনেক উন্নত চরিত্রের লোক ছিলেন। সংযম, সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব তাঁদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। শুধু রোজার বেকন নয়, তাঁর সমসাময়িক অপরাপর সাহিত্য-সেবকও তাঁদের কালকে ভালবাসতে পারেননি বলে দুঃখ করে গেছেন। সুতরাং বেকন ত্রয়োদশ শতকের যে-ছবি এঁকেছেন, তাতে সহজেই আস্থা স্থাপন করা যায়।

ক্রুচের গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদে রয়েছে প্রেমের আলোচনা। তাতে প্রেমের অভাবের জন্য করুণ সুরে হায়-আফসোস করা হয়েছে। ক্রুচের মতে ভিক্টোরীয় যুগে প্রেমের যে মূল্য ছিল, এ-যুগে তা নেই। এ যুগ প্রেম-হীনতার যুগ। ভিক্টোরীয় যুগে স্কেপ্‌টিকগণ বা সন্দেহবাদীরা প্রেমকে আল্লার স্থানে বসিয়ে পূজা করতো। এ-কালে তেমনটি আর হচ্ছে না। মানুষের মনে পূজার ভাব রয়েছে। তার প্রকাশ না হলে অনাবিল আনন্দ পাওয়া যায় না। 'যারে বলে ভালোবাসা, তারে বলে পূজা।' সে-কালের লোকেরা প্রেমের মারফতে পূজার ক্ষুধা মেটাতো। প্রেমের সম্পর্কে এসে কঠিন-হৃদয় লোকও মরমী ভাবাপন্ন হয়েছে, এমন দৃষ্টান্তের

অভাব নেই। পরমাত্মা যেমন ত্যাগের প্রেরণা দেন, প্রেম থেকেও তেমনি ত্যাগের প্রেরণা পাওয়া যেতো। প্রেমের জন্য সব খোয়াতে তারা প্রস্তুত ছিল।

আশ্চর্যের ব্যাপার, আমাদের যুগে তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে ভিক্টোরীয় যুগ যে-রূপ প্রেমময় হয়ে দেখা দিয়েছে, সে-কালের লোকদের কাছে সেরূপ প্রেমময় হ'য়ে দেখা দেয়নি। যুগের বিভিন্ন ভাবের প্রতিনিধি হিসাবে দাঁড়াতে পারেন, এমন দু'টি বৃদ্ধ মহিলাকে আমি জানতুম। তাদের একজন ছিলেন পিউরিটান আরেকজন ভলটেরিয়ান। তাঁদের কথাবার্তার মারফতে আমি সে-যুগটিকে ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করবো। প্রথম মহিলা বললেন: প্রেমের মতো এমন বাজে জিনিস নিয়ে এত কাব্য লেখা হবে কেন, আমি বুঝতে পারিনে। দ্বিতীয় মহিলাটি উত্তর দিলেন: আমি তো বাইবেলের সপ্তম আদেশ ভাঙায় তেমন কিছু পাপ দেখতে পাইনে। অন্ততঃ ষষ্ঠ আদেশ ভাঙার চেয়ে তা যে কম অন্যায় তাতো এক রকম নিঃসন্দেহেই বলা যায়। সপ্তম আদেশ ভাঙার বেলা প্রতিপক্ষের অনুমতির যে প্রয়োজন হয় তাতেই অপরাধটি হাল্‌কা হয়ে পড়ে। মহিলা দু'টির কথার সুরেই বুঝতে পারা যায়, প্রেমের প্রতি তাঁরা কেউই শ্রদ্ধাসম্পন্ন নন। একজনের কাছে প্রেম ঘৃণার ব্যাপার, আরেকজনের কাছে হাল্‌কা ফুর্তির। তবে ক্রুচ সাহেব ভিক্টোরীয় যুগের প্রেম সম্বন্ধে এমন উঁচু ধারণায় উপনীত হলেন কি করে? তাঁর ধারণার ভিত্তি কি? খুব সম্ভব, যুগের সংগে মিল নেই এমন কোনো লেখকের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ রবার্ট ব্রাউনিংয়ের নাম করা যেতে পারে। তাঁর প্রেমদর্শন হচ্ছে:

God be thanked, the meanest of His creatures
Boasts two soul-sides, one to face the world with,
One to show a woman when he loves her.

এর থেকেই বুঝতে পারা যায়, ব্রাউনিংয়ের মতে জগতের প্রতি একমাত্র যুক্তিসঙ্গত মনোবৃত্তি হচ্ছে দ্বন্দ্বপরায়ণতার। যে-মন নিয়ে প্রিয়ার সংগে মেশা যায়, সে-মন নিয়ে সাধারণের সংগে মিশতে গেলে ভুল করা হবে। সাধারণের সংগে সম্বন্ধ দ্বন্দ্বের, মিলনের নয়। এর কারণ কি? ব্রাউনিং বলবেন: জগৎ নিষ্ঠুর বলে। আমরা বলবো: না, জগৎ আপনাকে আপনার নির্ধারিত মূল্যে গ্রহণ করতে চায় না বলে। আপনি চান আপনার অবিমিশ্র প্রশংসা। জগৎ তা দিতে নারাজ। সে আপনাকে বাজিয়ে নিতে চায়। তাই আপনি এমন একটি সংগিনী বেছে নিতে চান যিনি কেবল আপনার প্রশংসাই করবেন, আপনার ত্রুটির দিকে তাকাবেন না। এই সমালোচনাহীন প্রেম কিন্তু খুব প্রশংসনীয় ব্যাপার নয়। অপক্ষপাত সমালোচনার শীতল বাতাস সইতে পারা স্বাস্থ্যের লক্ষণ। যার সে ক্ষমতা নেই সে দুর্বল, রুগ্ন। তার কাছ থেকে জগৎ তেমন কিছু আশা করতে পারে না।

আমি নিজে প্রেমে বিশ্বাসী। অবশ্য আমার প্রেম ভিক্টোরীয় যুগের প্রেমের মতো অন্ধ নয়, মুক্ত-দৃষ্টি। এ কেবল সংগী বা সংগিনীর ভালোর দিকেই তাকায় না, মন্দের দিকেও তাকায়। ভিক্টোরীয় যুগের লোকের মতো আমি প্রেমকে পূত-পবিত্র মনে করে আকাশে তুলে রাখতে চাইনে। এই অতিরিক্ত শ্রদ্ধার মূলে রয়েছে 'সেক্স-টেবু' বা যৌন-নিষেধ। যৌন ব্যাপারকে খারাপ ভাবা হতো বলেই সে-কালের লোকেরা তাঁদের সমর্থিত যৌন-সম্বন্ধকে 'পূত' 'পবিত্র' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করে উচ্চাসন দিতে চাইতো। নইলে সে-কালে যৌন-ক্ষুধা যে এ-কালের চেয়ে কম ছিল তা নয়। অধুনা মানুষ নতুন আদর্শ ভালো রূপে গ্রহণ করতে পারেনি বলে পুরানো আদর্শের প্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্তি পাচ্ছে না। তাই মনো-জগতে একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। এই দ্বন্দ্বের ফলে নৈরাশ্য ও হতাশার জন্ম। আমার মনে হয়, এ-ধরনের

লোকের সংখ্যা খুব বেশী নয়। কিন্তু সংখ্যায় কম হলেও গলা-বাজিতে তারাই বড়। তাদের প্রচারের ফলে এ-যুগের কালো দিকটাই লোকের কাছে বড় হয়ে উঠেছে, আলোর দিকটা ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। তারা যত মন্দ বলে প্রচার করতে চায়, আসলে কিন্তু যুগটা তত মন্দ নয়। এই যুগের সংগতিসম্পন্ন তরুণরা যে প্রেমের ব্যাপারে অধিকতর সুখী, একথা একরকম জোর দিয়েই বলা যায়। প্রাচীন আদর্শের অত্যাচার এবং যুক্তিধর্মী নীতির অভাবের দরুনই লোকেরা নৈরাশ্যব্যঞ্জক মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়ে থাকে। অতীতের মোহ ভুলে গিয়ে হালের আদর্শকে পুরাপুরি গ্রহণ না করলে এই নৈরাশ্যের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন।

কেন যে প্রেমের মূল্য দেওয়া হয়, তা বলা সহজ নয়। তথাপি একবার চেষ্টা করে দেখছি। প্রথমতঃ দেখতে পাওয়া যায়, প্রেম নিজেই একটা সুখের উৎস। সুখের তাগিদেই লোকেরা প্রেমের হাতে ধরা দেয়। এটাকে প্রেমের শ্রেষ্ঠ দিক হিসাবে ধরা না গেলেও প্রাথমিক ও অনিবার্য দিক রূপে সহজেই ধরে নেওয়া যায়। এটির অভাবে অপরাপর দিকও ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা।

'তোমার চেয়ে মিষ্টি কিছুই নেই
এই ভুবনের মাঝে,
ওগো ও প্রেম, তাইতো তোমায় চাই
নিত্য সকাল সাঝে।
নিন্দা তোমার রটায় যারা জানি,
পায়নি তোমার মধুর পরশখানি,
অন্ধকারে কাটায় তারা বেলা
হিংসা-দ্বেষের কাজে।
তোমার পরশ অন্তরেতে মোর
রাতের শেষে আনে সোনার ভোর

দিকে দিকে তাই যে কেবল শুনি—
আনন্দ গান বাজে ॥'

কবি যখন এই পংক্তিগুলি লেখেন তখন তিনি আল্লার জায়গায় প্রেমকে বসিয়ে নাস্তিকের সমাধান করতে চাননি, কিংবা বিশ্ব-রহস্য উদ্‌ঘাটন করাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন নিজেকে খুশী করতে, নিজেকে উপভোগ করতে, এইমাত্র। প্রেমের উপস্থিতি যেমন সুখের, অনুপস্থিতিও তেমনি দুঃখের। তাই প্রেমের জন্য মানুষ এত উতলা হয়ে ওঠে। প্রেমের দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে, তা জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখগুলির স্বাদ বাড়িয়ে দেয়। সংগীত, পর্বতের উপরে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত, পূর্ণিমা রাত্রে জ্যোৎস্না-প্লাবিত সমুদ্র বক্ষ—প্রেমের সংস্পর্শ না হলে এ-সবের পুরো স্বাদ পাওয়া যায় না। প্রেয়সী নারীর সংগে উপভোগ না করলে এ-সবের ইন্দ্রজাল অর্ধেক-টাই অনুদ্‌ঘাটিত থেকে যায়। তৃতীয়তঃ, 'আমি'র চেয়ে তুমি'কে বড় করে তুলে প্রেম অহমিকার কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পথটি বাৎলে দেয়। একাকীত্বপ্রিয় দার্শনিক যে সংসারে নেই, তা নয়। যথেষ্টই আছে। স্টোইক্ ও প্রাথমিক যুগের খ্রীস্টানরা তো মনে করতেন জীবনের কল্যাণসাধনের জন্যে দরকার কেবল ইচ্ছা শক্তির—সেজন্যে অপরের সহায়তার কোনো দরকার হয় না। সকলের লক্ষ্যই যে কল্যাণ তা নয়। কেউ কেউ চায় শক্তিকে, কারো লক্ষ্য বা ব্যক্তিগত সুখ। কিন্তু সকলের মধ্যেই একটা সাধ দেখতে পাওয়া যায়, আর তা হচ্ছে অপরের সাহায্য ছাড়া নিজের ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই কাজ ফতে করা যায় এই বিশ্বাস। এই একা-কীত্বপ্রিয় দর্শন যে কেবল নীতির দিক দিয়ে মন্দ, তা নয়; জীবনের সহজ ও সার্থক বিকাশের পক্ষেও তা অন্তরায়। মানুষের জন্যে পারস্পরিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজনীয়। জোর করে একা থাকতে হলে স্বভাবের বিরুদ্ধেই যেতে হয়। মানুষের প্রকৃতিতে

যে অসম্পূর্ণতা রয়েছে, তা-ই তাকে বন্ধু ও সহযোগী খুঁজতে বাধ্য করে। প্রেমের স্বাদ যে পেয়েছে সে কখনও একাকীত্ব-দর্শনের সমর্থক হতে পারে না। সন্তান বাৎসল্যের মতো এমন জোরালো অনুভূতি আর কি আছে? এরও গোড়ায় রয়েছে কিন্তু জনক-জননীর পরস্পরের প্রতি প্রেম। প্রেম একটা সাধারণ ব্যাপার—যত্রতত্রই তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, এমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু এই বলতে চাই যে, প্রেমের স্বাদ যে পায়নি, জীবন তার কাছে তার শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য উদ্‌ঘাটিত করেনি। সে হতভাগা জীবনকে পেয়েও জীবন থেকে বঞ্চিত। প্রেম এমন একটা ব্যাপার, সন্দেহবাদের স্পর্শে যা মলিন হয়ে যায় না। তা চিরসুন্দর চির-প্রাণ-প্রদায়ী।

প্রেম সে তো আগুনের শিখা, অন্তরেতে চির অনির্বাণ,
অবসন্ন নয় কভু তাহা, নহে কভু রুগ্ন, পরিম্লান।

এখন ক্রুচ সাহেব ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে যা বলেছেন, তার আলোচনা করছি। তাঁর মতে ইবসেনের 'গোসটের' চেয়ে সেক্সপিয়ারের 'কিং লিয়র' অনেক বড়। আমার মতও তাই। কিন্তু তাই বলে সে-কালের মানুষের তুলনায় এ-কালের মানুষকে হীন বলা যায় না। এ-যুগে যে কিং লিয়রের মতো বই লেখা যায় না তার কারণ এ-যুগের মানুষের অবনতি নয়, উন্নতি। গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলেই মানুষ ব্যক্তি-বিশেষের রাজসিক বিষাদের গুণ কীর্তন করতে অনিচ্ছুক। সে-কালে অনেকগুলি মানুষ বাঁচতো একটি মানুষের বিকাশের দিক লক্ষ্য রেখে। এ-কালে তা আর হচ্ছে না। কিং-লিয়র যে মনোভঙ্গির সৃষ্টি, হালে সে মনোভঙ্গির কোনো মর্যাদা নেই বলেই ব্যক্তিতান্ত্রিক ট্র্যাজেডি সৃষ্টির চেষ্টা ব্যর্থ। সেক্সপিয়ার বলেছেন:

রাজারা যখন মরে আকাশেতে ধূমকেতু ভায়।
ভিখারী যখন মরে কভু কিছু ঘটে না তথায়।

একটি চা'ল টিপলে যেমন সমস্ত ভাতের অবস্থা জানতে পারা যায়, তেমনি এই একটি উক্তির দ্বারাই সে-কালের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। সেক্সপিয়ার যুগের ধারণার বশবর্তী না হয়ে পারেন নি। তাই দেখতে পাওয়া যায় কবি 'সিনা'র মৃত্যু কমিক—হাস্যকর, আর 'সিজার' 'ব্রুটাস'-এর মৃত্যু ট্র্যাজিক - বিষাদাস্ত। যুগের ভাবনার সংগে পুরাপুরি বুক মিলাতে পেরেছিলেন বলেই সেক্সপিয়ার কিং লিয়রের মতো অনবদ্য নাটক রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ-কালের নাট্যকার যদি তাঁদের যুগের সংগে ওতপ্রোতভাবে মিশে যেতে পারেন তো তাঁরাও অনুরূপ সার্থক গ্রন্থ রচনা করতে সক্ষম হবেন। এ-কালে বড হয়ে উঠছে সমাজ, ব্যক্তি নয়। তাই এ-যুগে ট্র্যাজেডি লিখতে হবে সমাজকে নিয়ে; ব্যক্তিকে নিয়ে লিখলে তেমন সার্থকতা পাওয়া যাবে না। তেমনি একটি গ্রন্থ হচ্ছে আরনেস্‌ট্‌ টলারের Massemensch (*Masses & Man*)। গ্রন্থটির মর্যাদা যে অতীতের শ্রেষ্ঠ নাটকসমূহের সমান, এ-কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু এই বলতে চাই যে, গাম্ভীর্য, মহত্ত্ব ও বীর্যে ওদের সংগে এটির সাদৃশ্য রয়েছে। এরিস্‌-টোটল-কথিত 'দুঃখ ও ভীতির তাড়নায় মানব-অন্তরের নির্মলতা সাধনের ক্ষমতা' এর আছে। এই ধরনের ট্র্যাজেডি খুব বিরল—'লাখে মিলে না এক।' ট্র্যাজেডি লিখতে হলে ট্র্যাজেডি অনুভব করতে হবে। আর ট্র্যাজেডি অনুভব করতে হলে যুগের মর্মে প্রবেশ করা দরকার। শুধু বুদ্ধি দিয়ে নয়, রক্ত দিয়ে, শিরা-উপ-শিরা দিয়ে স্নায়ু দিয়ে যুগকে জানতে হবে।

ক্রুচ সাহেব যেরূপ সাহসের সংগে নিরানন্দ জগতকে স্বীকার করে নেন তাতে পাঠকরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন না হয়ে পারেন না। বীরের মতনই তিনি সমস্ত দুঃখের বোঝা মাথায় তুলে নিতে

চান। কিন্তু জগতকে নিরানন্দ মনে করার সত্যকার কোনো কারণ কি? নতুন অবস্থার সংস্পর্শে এসে পুরাতন মূল্যবান আবেগগুলির জন্ম দিতে পারছেন না বলেই ক্রুচ ও ক্রুচের মতো অতীত প্রেমিক লেখকদের কাছে জগৎ নিরানন্দ। বর্তমানের সংগে বুক মিলালে তাঁরাও বুঝতে পারতেন সেক্সপিয়ার যে মহৎ আবেগের অধিকারী তাঁরাও তা থেকে বঞ্চিত নন। সেক্সপিয়ারের পথটি অনুসরণ করছেন না বলেই তাঁদের এই দুর্দশা। 'যত দোষ নন্দ ঘোষ' যুগের উপর চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। মহৎ আবেগের উপাদান বর্তমানেও আছে। কিন্তু সমাজবোধ-বর্জিত বলে সাহিত্যিকগোষ্ঠী তার স্বাদ থেকে বঞ্চিত। নইলে এ-যুগে বাঁচবার মতো কিছু নেই, এমন কথা তাঁরা বলতে পারতেন না। তাঁদের দুর্ভাগ্যের কারণ তাঁরা নিজেরাই। যৌবনের অতিভোগ ও বাস্তব-বর্জিত অত্যধিক মননের ফলেই এই দুঃখবাদ। এর থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে বাস্তবের সংগে সম্পর্ক স্থাপন — আর বাস্তবের সংগে সম্পর্ক স্থাপনের উপায় হচ্ছে কাজে নামা। কাজই আমাদের সুস্থ মানসিকতা দিতে পারে; আর কেউ না আর কিছু না। যারা কাজ করে, তারাই আনন্দ পায়। জগতের স্বাদ-গন্ধ তাদের জন্যে।

তাই যাঁরা আর আনন্দ পাচ্ছেন না, জগতে বাঁচবার মতো কিছুই দেখছেন না, তাঁদের কাছে আমার অনুরোধ: লেখা ছেড়ে দিন যদি সহজে ছাড়তে না পারেন তো জোর করে ছাড়ার চেষ্টা করুন। চিন্তার খোলস ত্যাগ করে জগতের পথে বেরিয়ে আসুন। নিজেকে এমন একটি অবস্থায় দাঁড় করার যেখানে প্রাথমিক শারীরিক প্রয়োজনগুলির দাবী মেটানোই হবে আপনার প্রথম ও প্রধান কাজ। তা হলেই দেখতে পাবেন আপনি পুনরায় জীবনে ফিরে এসেছেন আর জীবনে ফিরে এসেছেন বলে সুখও পাচ্ছেন। মন নিয়ে অধিক নাড়াচাড়া করতে করতে আপনি মনকে বিগড়ে

দিয়েছেন। এবার মনোবিহীন হয়ে বাস্তবের সুস্থ স্পর্শে আপনার সহজ ভোগ-কামনাকে জাগিয়ে তুলুন।

লেখার সত্যকার আকুতি আপনার ভেতরে থাকলে আপনি অবশ্যই আবার লেখায় ফিরে আসবেন। আর এবার লেখা আপনার কাছে বাজে মনে হবে না বলে আপনি লিখে প্রচুর আনন্দও পাবেন। *

* কোন ইংরেজ লেখকের অনুসরণে।—লেখক।

প্রতিযোগিতা

এক

প্রত্যেক মানুষের দুটি ধর্ম। একটিকে আমরা জানি, কিন্তু সব সময় মানিনে। আরেকটিকে জানিনে, কিন্তু সব সময়ই মানি ; কেননা, না মেনে পারা যায় না! প্রথম ধর্মটি কি তা সহজেই বুঝতে পারা যায় : হিন্দুত্ব, ইসলাম, খ্রীস্টানত্ব এবং এই ধরনের অন্যান্য ধর্ম। দ্বিতীয়টি অর্থনীতির ধর্ম। আর এর হাতেই চরিত্র গঠনের ভার। হিন্দুত্ব, ইসলাম বা অপরাপর ধর্মের নামে আমরা যতই চিৎকার করি না কেন, আসলে আমাদের চরিত্র গঠন করছে অর্থনীতি। একজন মধ্যবিত্ত হিন্দুর জীবনের সংগে একজন মধ্যবিত্ত মুসলমানের জীবনের পার্থক্য কতটুকু? একটু রঙের পার্থক্য ছাড়া তাদের জীবনধারা মূলতঃ এক।

রাশিয়া ও সাম্যবাদী অপরাপর কয়েকটি দেশ ছাড়া সমগ্র পৃথিবী আজ আমেরিকার অর্থনীতির অধীন। আমেরিকার ডলার সাম্রাজ্যবাদের আওতায় প্রায় সব দেশই এসে পড়েছে ; আমরাও বাদ যাই নি, অথবা যাব না। ডলারের থলি হাতে নিয়ে আমেরিকা কেবলই ডেকে বলছে : এসো, এসো আমরা তোমাদের সাহায্য করতে এসেছি। মানবতার নাম নিয়ে সেকথা বলে, কণ্ঠটিও বেশ দরদে ভরা। কিন্তু তার ভেতরে রয়েছে একটি কাবুলিওয়ালার মন এবং সুবিধা পেলেই সে খাতককে কাবু করতে ছাড়বে না।

যাক, আমেরিকার উদ্দেশ্য ভালো কি মন্দ এ-সম্বন্ধে তর্ক না করেও বলা যায়, আমেরিকানদের চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের খোঁজ

নেওয়া দরকার, যাদের সংগে সম্বন্ধ হতে চলেছে বা হবে তাদের সম্বন্ধে কিছুই না জানা মূঢ়তার পরিচায়ক। তাই আমেরিকার অধিবাসীদের চরিত্রটি যাচাই করে নেওয়া দরকার।

আমেরিকানদের চরিত্রের বিশিষ্ট স্থূলতাপ্রীতি: সূক্ষ্ম সুখ উপভোগের ক্ষমতা তাদের নেই। বাঁচার জন্যে তারা অর্থ উপার্জন করে না, অর্থ উপার্জনের জন্যেই বাঁচে। তাই অবসর উপভোগের শিল্প তাদের আয়ত্তের বাইরে। এত বড়ো ফিলিস্টাইন জাত সভ্য জগতে আর দ্বিতীয়টি নেই। অথচ তারাই আমাদের কাছে সভ্যতার আদর্শ। বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁর বিভিন্ন রচনায় আমেরিকার স্থূলতাপ্রীতিকে আচ্ছা করে চাবকেছেন। দেশবাসীর হুঁশিয়ারির জন্যে আমি এখানে তাঁর একটা নিবন্ধের অনুবাদ দিলুম। যে আদর্শের চাকচিক্যে আমরা মুগ্ধ, তা যে একটা মেকি আদর্শ, এই রচনাটি পাঠ করলেই তা সহজে বুঝতে পারা যাবে। কিন্তু সংসারে মেকি জিনিসই চলে বেশী: শুধু মন্দ টাকাই যে ভালো টাকাকে তাড়িয়ে দেয়, তা নয়, মন্দ আদর্শও ভালো আদর্শকে তাড়িয়ে দেয়। তাই সাবধান হওয়া দরকার। জীবিকা অর্জনের চেয়ে জীবনার্জন বড় এবং জীবনার্জনের জন্যেই জীবিকা অর্জন, এই সত্যটি সর্বদা দেশবাসীর হৃদয়ে জাগরূক রাখবার উদ্দেশ্যেই আমি এই নিবন্ধটি তর্জমা করেছি। দেশবাসী উপকৃত বোধ করলে আমি আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করব।

আমেরিকার যে-কোন লোককে অথবা ইংলণ্ডের যে-কোনো ব্যবসায়ীকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়—জীবন উপভোগের পথে তার সবচেয়ে বড়ো অন্তরায় কি, তো তিনি উত্তর দেবেন: 'জীবনসংগ্রাম'। একথা তিনি পরিপূর্ণ সততার সংগেই বলবেন; একথা তিনি বিশ্বাস করেন। কোনো এক হিসেবে একথা সত্য: তবে, আরেক দিক থেকে, এবং উল্লেখযোগ্য দিক থেকে—একথা সম্পূর্ণ অলীক। অবশ্যই জীবন-সংগ্রাম এমন জিনিস যা ঘটে থাকে। দুর্ভাগা হলে, এটা

আমাদের যে কারুর জীবনেই ঘটতে পারে। যেমন এটা ঘটেছিলো কনরাডের নায়ক ফকের জীবনে; সে এক পরিত্যক্ত জাহাজে আগুনের আক্রমণে বিধ্বস্ত নাবিকদলের অবশিষ্ট দু'জনের একজন, অপর ব্যক্তিদের খাওয়া ছাড়া যাদের আর কোনো খাদ্যই ছিলো না। যখন তারা দু'জন খাওয়া শেষ করলো, বলতে গেলে, তখনই জীবন-সংগ্রাম শুরু হলো। ফক জিতলো, কিন্তু নিরামিষভোজী হিসেবে নয়। কিন্তু ব্যবসায়ীরা যখন 'জীবন-সংগ্রামে'র কথা বলে, তখন এমন শোচনীয় অবস্থার কথা মনে জাগে না। নিতান্ত সামান্য ব্যাপারকে অসামান্যতা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তারা এই কথাটি ব্যবহার করে থাকে। তাদের জীবনে কয়জন সমশ্রেণীর লোককে তারা না খেয়ে মরতে দেখেছে, জিজ্ঞেস করে দেখুন দেখবেন একটি লোকের নামও করতে পারবে না। প্রত্যেকেই জানে জাগতিক আরাম-আয়েশের ব্যাপারে বিধ্বস্ত ব্যবসায়ী দরিদ্র ব্যক্তির চেয়ে অনেক সুখী। তাই জীবন-সংগ্রাম কথাটির দ্বারা তারা যা বোঝাতে চায় আসলে তা হচ্ছে কৃতকার্যতার জন্যে সংগ্রাম। পরদিন ভোরে উঠে খাবার পাবে না, এই ভয়ে তারা যুদ্ধে মাতে না, মাতে পাছে প্রতিযোগীর কাছে পরাজিত হয় এই ভয়ে। প্রচুর থাকলেও তারা নিশ্চিত জীবন-যাপনে লজ্জা বোধ করে। প্রতিযোগীর সাথে অনবরত প্রতি-যোগিতা না করা, তাদের কাছে শত্রু দেখে দল ত্যাগ করে পলায়ন করার মতই লজ্জাকর। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তাদের কাজে মানুষের এমন কি মহৎ কল্যাণ হচ্ছে তো তারা কোন স্পষ্ট জবাব না দিয়ে কর্মময় জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক অসার যৌক্তি-কতার আশ্রয় নিয়ে প্রশ্নকর্তাকে চুপ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে।

এই ধরনের লোকের জীবন একবার ভেবে দেখুন। সহজেই কল্পনা করা হয়, তাঁর একটি মনোরম ঘর, সুন্দরী স্ত্রী এবং চমৎকার ছেলেমেয়ে আছে। প্রত্যূষে ঘুম থেকে উঠে তিনি যখন আপিসে চলে যান তখন স্ত্রী-পুত্র সকলে নিদ্রামগ্ন। আপিসে তাঁকে একজন

জবরদস্ত কাজের লোকের অভিনয় করতে হয়। দৃঢ়তাব্যঞ্জক চেহারা, সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট বাচনভংগী, সজ্ঞান ও সচেষ্ট তুষ্ণীভাব এসব গুণের দ্বারা তিনি সকলকে অভিভূত করেন। একমাত্র আপিস বয়ের উপরই এসবের কোন প্রভাব হতে দেখা যায় না, কেননা কর্তার আসল রূপটি তার কাছে সুবিদিত। কোনো কোনো বড় লোকের সংগে আলাপ, বাজার দরের পর্যবেক্ষণ এবং কেনা-বেচা চলছে বা চলবে এমন লোকের সংগে ভোজন, এই ভাবেই তাঁর পূর্বাহ্ণ কাটে এবং অপরাহ্ণও পূর্বাহ্ণের অনুসরণ করে। ডিনারের কাপড় নেওয়ার সময় তিনি পরিশ্রান্ত হয়ে বাড়ী ফেরেন। খাবার সময় তিনি ও অপরাপর পরিশ্রান্ত পুরুষরা নারী-সান্নিধ্য উপভোগ করছেন, এমন অভিনয় করেন। মুক্তি পেতে বেচারা ভদ্রলোকের কতক্ষণ লাগে, তা আগে জানা সম্ভব নয়। অবশেষে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন এবং কয়েক ঘণ্টার জন্য উত্তেজনা থেকে নিষ্কৃতি পান।

এই লোকটির কার্যরত জীবনের পিছনে যে মনস্তত্ত্ব তা একশো গজ দৌড় প্রতিযোগিতার মনস্তত্ত্বের মতো; কিন্তু ইনি যে দৌড় প্রতিযোগিতায় লিপ্ত তার একমাত্র লক্ষ্য মৃত্যুমুখী হওয়ায়, তাঁর মনের একাগ্রতা—যা একশো গজের পক্ষে যথেষ্ট ছিলো—শেষ পর্যন্ত অনেকটাই অতিরিক্ত হয়ে পড়ে। তাঁর ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে তিনি কি-ই বা জানেন? রবিবার তিনি খেলার মাঠে কাটান, অন্যান্য দিন আপিসে। নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না। প্রত্যূষে তিনি যখন আপিসে চলে আসেন তখন বেচারী নিদ্রিত। সন্ধ্যা জুড়ে তিনি স্ত্রীকে নিয়ে সামাজিকতার ব্যাপারে নিযুক্ত। অন্তরঙ্গ বিশ্রম্ভালাপের সময় কোথায়? না হলে চলে না এমন বন্ধু তাঁর নেই; যদিও এমন অনেক আছেন যাদের সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গতার ভান করে থাকেন। বসন্তকাল ও শরৎকাল সম্বন্ধে তিনি ততটুকুই জানেন যতটুকু তাঁর ব্যবসায়ের কাজে লাগে। বিদেশও হয়তো তিনি দেখেছেন, কিন্তু নিতান্ত বিরক্ত ও ক্লান্ত চোখে।

পুস্তক তাঁর কাছে বাজে, সংগীত উন্নাসিক। বছরের পর বছর ক্রমিক নিঃসংগতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনের একাগ্রতাও বাড়তে থাকে। ফলে ব্যবসায়ের বাইরের জগৎ তাঁর কাছে শুষ্ক ও নিরানন্দ বলে মনে হয়—বাইরের কোন নিমন্ত্রণই তাঁর মনে সাড়া জাগাতে পারে না। এই ধরনের মধ্যবয়স্ক আমেরিকানকে স্ত্রী-কন্যাসহ প্রায়ই ইউরোপে দেখতে পাওয়া যায়। নিশ্চয় করে বলা যেতে পারে, স্ত্রী-কন্যার তাগিদেই তিনি প্রাচীন জগৎ দেখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন, নিজের গরজে নয়। মা ও মেয়ে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে বিস্ময়কর বস্তুসমূহের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেন। তিনি তখন হয়তো ভাবতে থাকেন, তাঁর আপিসে কি কাণ্ড চলেছে, অথবা বেসবল জগতে কি ঘটনা ঘটছে। সঙ্গিনীরা শেষে, 'পুরুষরা স্থূল-বুদ্ধি' এই ভেবে তাঁর আশা ছেড়ে দেন। কিন্তু এটা তাঁরা কখনো উপলব্ধি করতে পারেন না যে, তিনি আসলে তাদের লোভের কাছেই বলিপ্রদত্ত। তবে ইউরোপীয় দর্শকের কাছে সতী যেভাবে দেখা দিত, এও তার বেশী সভ্য নয়। সম্ভবতঃ দশটি ঘটনার মধ্যে নয়টিতেই বিধবারা প্রশংসা ও পুণ্যের লোভে স্বামীর চিতায় পুড়ে মরতে দ্বিধা করত না। ব্যবসায়ীর ধর্ম ও সুখ্যাতি চায় যে তিনি প্রচুর অর্থের মালিক হন; তাই হিন্দু বিধবার মতো খুশী মনে তিনি অত্যাচার সহ্য করেন।

দুই

সত্যিকারের সুখ পেতে চাইলে আমেরিকার ব্যবসায়ীর ধর্ম বদলাতে হবে। যে পর্যন্ত তিনি কৃতকার্যতা তথা আর্থিক প্রতি-পত্তি শুধু কামনাই করেন না, বরং কৃতকার্যতাকেই জীবনের চূড়ান্ত সার্থকতা বলে গণ্য করেন এবং যারা তা করে না তাদের নিতান্ত কৃপার নজরে দেখেন, সে পর্যন্ত তাঁকে একান্ত কর্মনিবিষ্ট ও সুখের

জন্য উদ্বিগ্ন থাকতেই হবে। কপালে সুখ নেই বলেই তিনি অন্য সব ভুলে কৃতকার্যতার পেছনে ছোটেন। ফলে, কৃতকার্যতা হয়তো তিনি লাভ করেন, কিন্তু জীবনের পরম বস্তু আনন্দ তাঁর পর হয়ে যায়। টাকা খাটানোর মতো একটা সাধারণ ব্যাপার নেওয়া যাক। প্রায় সকল আমেরিকানই নিরাপদ লগ্নি থেকে শতকরা চার টাকা লাভে খুশী না থেকে ঝুঁকিজনক লগ্নি থেকে শতকরা আট টাকা লাভের চেষ্টা করেন। ফলে যদি টাকা মারা যায় বলে তাঁদের উদ্বেগ ও অশান্তির অন্ত থাকে না। স্বাভাবিক ভাবে টাকা থেকে যে জিনিসটা কাম্য তা হচ্ছে অবসর ও নিরাপত্তা। কিন্তু খাঁটি আধুনিক মানুষেরা চান আরো টাকা; গৌরব ও আড়ম্বর বৃদ্ধির জন্য এবং সমকক্ষটিকে অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে তারা টাকার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। আমেরিকার সামাজিক মান অনির্দিষ্ট ও অনবরত পরিবতনশীল বলে, নির্দিষ্ট সমাজ-মান সম্পন্ন দেশের তুলনায় আমেরিকার লোকের অশ্লীল বড়লোকী মনোভাব বেশী। সেখানে অর্জিত ধনই মস্তিষ্কের পরিমাপ বলে গৃহীত। যে লোকটি প্রচুর ধন উপার্জন করতে পেরেছে সে-ই বুদ্ধিমান, যে পারেনি সে বোকা। কেউ বোকা হতে চায় না, তাই অর্থচিন্তায় উদ্বিগ্ন থাকতে হয় বলে অনিশ্চিত বাজারে লোকের মনের অবস্থা হয় তরুণ পরীক্ষার্থীর মনের অবস্থার মতো অস্থির।

আমার মনে হয়, ব্যাবসায়ীর উদ্বেগের সঙ্গে প্রায়ই স্বাভাবিক—যদিও খানিকটা অযৌক্তিকও—বিনাশের পরিণামচিন্তায় ভীতি মিশ্রিত থাকে। আর্নল্ড বেনেটের 'ক্লে-হ্যাঙ্গার' যতই বহু ধনের মালিক হচ্ছিলেন, ততই পাছে তাঁকে কারখানায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে হয়, এই ভয়ে ভীত ছিলেন।··· যে লোক শৈশবে দারিদ্র্যে ভুগেছে তারা যে সন্তানদের অনুরূপ দুঃখ পাওয়ার চিন্তায় উদ্বিগ্ন হবে তা স্বাভাবিক। পরিবার রক্ষার পক্ষে যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজনয় সে পরিমাণ অর্থ উপার্জন সম্ভব মনে হয় না বলে তাদের চিন্তার অন্ত

থাকে না। প্রথম পুরুষে এই ধরনের ভীতি অনিবার্য কিন্তু যাদের কোনদিন প্রকৃত দারিদ্র্যের সম্মুখীন হতে হয় নি, তাদের এ-বিষয়ে ভয়ে ভীত হওয়ার কোন কারণই থাকতে পারে না। তাই অনেকের বেলায়ই এই দুঃখ-ভীতি স্বকপোলকল্পিত ব্যাপার। প্রতিযোগিতা-মূলক কৃতকার্যতাকে সুখের উৎস মনে করা হয় বলেই মানুষের এই ধরনের দুর্ভোগ ভুগতে হয়। কৃতকার্যতা জীবনে উপভোগের জন্য প্রয়োজনীয়, স্বীকার করি, যৌবনে অনাদৃত চিত্রকরটি যদি হঠাৎ দেখতে পায় যে তার প্রতিভার কদর হচ্ছে তো সে সুখী না হয়ে পারে না। আর এ-কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, অর্থ কিছু দুর পর্যন্ত আমাদের সুখের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু তার বেশী সুখ দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। যা বলতে চাচ্ছি, কৃতকার্যতা সুখের একটি উপাদান বটে কিন্তু অপরাপর উপাদানের বিনিময়ে কেনা হলে অনেক বেশী দাম দেওয়া হয়।

ব্যবসায়ী মহলের জীবন-দর্শন তাদের দুঃখের গোড়ায়। ইউরোপে এমন অনেক মহল রয়েছে যেখানে লোকেরা মানুষের আন্তরিক সম্মান ও শ্রদ্ধা পেয়ে থাকেন, যেমন অভিজাতশ্রেণী, শিক্ষাব্রতী, সৈন্য ও নৌবিভাগের কর্মচারী। ইউরোপে এরা বিশেষ সম্মানের পাত্র। অবশ্য প্রত্যেক কাজেই কৃতকার্যতার কথা প্রধান হয়ে দাঁড়ায় এবং কৃতকার্যতার ব্যাপারে একটা প্রতিযোগিতার দিকও আছে। কিন্তু এসব অস্বীকার না করেও বলা চলে যে, সেখানে যে-জিনিসটা লোকের শ্রদ্ধা পেয়ে থাকে, তা কৃতকার্যতা নয়, যে গুণের জন্য লোকে কৃতকার্যতা লাভ করে তা। অর্থকেই কৃতকার্যতার প্রতীকরূপে দেখার অশ্লীলতা সেখানে নেই। লোকে আসলে গুণের দিকেই তাকায়, কৃতকার্যতার দিকে নয়। একজন বৈজ্ঞানিক, চাই তিনি টাকা করুন কি না করুন, সকল সময়ে সমান শ্রদ্ধা পাবেন। একজন বিখ্যাত সেনাপতি বা নৌ-সেনাপতিকে দরিদ্র দেখে কেউ বিস্মিত হয় না; বরং এসব ক্ষেত্রে দারিদ্র্য নিজেই যেন ভূষণ হয়ে দাঁড়ায়। এসব

কারণে আর্থিক প্রতিযোগিতা ইউরোপে মাত্র কয়েকটি মহলে আবদ্ধ এবং প্রভাব ও সম্মান কোন দিক দিয়েই এ-সবের কোন গুরুত্ব নেই। আমেরিকার ব্যাপারটি ঠিক তার উল্টো: এখানে টাকার দ্বারাই সম্মানের মাত্রা নির্ধারিত হয়। যে-সব পেশাতে সুশিক্ষার প্রয়োজন, যেমন ডাক্তারি ওকালতি সে-সবেও কার কতখানি জ্ঞান রয়েছে ধার্য হয় অর্থের পরিমাপে। অধ্যাপকরা তো সওদাগরদের গোলাম, তাই প্রাচীন দুনিয়ায় তাঁরা যতটা সম্মান পেয়ে থাকেন, এখানে তার অর্ধেকও পান না। ইউরোপীয় পেশাদারদের চালচলনে কেমন একটা সক্রিয়তা ফুটে ওঠে, আমেরিকার পেশাদারদের চালচলনে তেমন কিছু চোখ পড়ে না। ব্যবসায়ীদের অনুসরণ করে চলাই তাঁরা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন। তাই প্রতিযোগিতার অবিমিশ্র অশ্লীল দ্বন্দ্বের ক্ষতিপূরণ করতে পারে আমেরিকার ধনিক শ্রেণী জুড়ে এমন কোন ব্যাপার দেখতে পাওয়া যায় না।

অতি শৈশবেই সে দেশের শিশুরা উপলব্ধি করে, অর্থ উপার্জনই জীবনের একমাত্র প্রয়োজনীয় ব্যাপার, অপরাপর ব্যাপারে তার সহায়ক মাত্র। তাই অর্থ সম্পর্কহীন শিক্ষা সম্বন্ধে মাথা ঘামান তাদের কাছে সময় ও মস্তিষ্কের অপব্যবহার ছাড়া আর কিছুই নয়। শিক্ষার জন্যই শিক্ষা, এই মতবাদ আমেরিকায় অচল। তার মানে আমেরিকার লোকেরা স্থূলতার পূজারী, সূক্ষ্ম সুখ উপভোগের ক্ষমতা তাদের নেই। শিক্ষাকে এককালে মনে করা হত জীবন উপভোগের ক্ষমতা অনুশীলনের উপায়। (জীবন উপভোগ বললে অবিদগ্ধজনের পক্ষে যা লাভ করা অসম্ভব সেই সূক্ষ্ম সুখকে বুঝায়)। অষ্টাদশ শতকে সাহিত্য, শিল্প ও সংগীতে বিশ্লেষণ ও বিচারজাত আনন্দ-লাভের ক্ষমতা ভদ্রলোকের পরিচয়-চিহ্ন ছিল। এখন আমরা তার রুচির সমর্থক না হতে পারি, কিন্তু সে যে একটা সত্যিকার রুচির অধিকারী ছিল তা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। বর্তমান কালের ধনী-লোকেরা সম্পূর্ণ উল্টো ধরনের। তারা কখনো বই পড়ে না।

সুনাম বৃদ্ধির জন্য তারা যদি চিত্রশালা নির্মাণ করে তো চিত্র নির্বাচনের ব্যাপারে তাদের নির্ভর করতে হয় চিত্র সমঝদারের উপর। যে আনন্দ তারা চিত্র থেকে পায় তা চেয়ে দেখার আনন্দ নয়, অপর ধনী ব্যক্তিদের তা থেকে বঞ্চিত করার আনন্দ। এখানেও প্রতিযোগিতার প্রবৃত্তিটই বড় হয়ে উঠে। উপভোগের ইচ্ছায় নয়। সংগীতের ব্যাপারেও সেই এক কথা। ধনী লোকটি যদি ইহুদি হয়ে থাকে, তো তিনি সত্যিকারের সংগীত রসিক হবেন নইলে অপরাপর শিল্পের মতো সংগীতের বেলায়ও তিনি মূঢ়তার পরিচয় দেবেন। ফল এই দাঁড়ায় যে, অবসর নিয়ে কি করবে, ধনী ব্যক্তিরা তা ঠিক করে উঠতে পারে না। যতই তারা ধনী হতে থাকে ততই অর্থ উপার্জন তাদের পক্ষে সহজ হয়ে ওঠে। প্রতি পাঁচ মিনিটে তাদের এত আয় হয় যে, খরচ করার উপায় ঠাওরে উঠা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কৃতকার্যতাকে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে গণ্য করার এই শোচনীয় পরিণাম। কৃতকার্যতা লাভের পর কি করতে হয় না জানলে তা শেষ পর্যন্ত বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

প্রতিযোগিতার সবচেয়ে বড় ত্রুটি এই যে তা নিজের এলাকার বাইরেও আক্রমণ চালায়। পুস্তক পাঠের দৃষ্টান্ত নিলেই ব্যাপারটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। পুস্তক পাঠের দুইটি উদ্দেশ্য ঃ একটি আনন্দ লাভ আরেকটি অহমিকা তৃপ্তি। অহমিকা তৃপ্তির দিকেই আমেরিকানদের অধিক ঝোঁক। তারা যেন বই পড়ার ব্যাপারেও প্রতিযোগিতা চালাতে চায়। তুই পড়িস নি? আমি পড়েছি বলে অপরকে হারিয়ে দেওয়ার ইচ্ছাতেই যেন তারা বই পড়ে। আনন্দ লাভের জন্য নয়। প্রত্যেক মাসে কয়েকখানা বিশেষ বিশেষ পুস্তক পড়া আমেরিকার মহিলাদের রেওয়াজে দাঁড়িয়েছে। কেননা তা না হলে কালচার্ড বলে গণ্য হওয়া যায় না। তাই কেউ সমগ্রভাবে, কেউ প্রথম পরিচ্ছেদ কেউ বা বইগুলির সমালোচনা মাত্র পড়ে, কিন্তু সকলের টেবিলের উপর বইগুলি দেখতে পাওয়া যায়। বইগুলি

সম্বন্ধে কিছু বলতে পারলেই তো হল, কেননা তা হলেই 'বাহবা' পাওয়া যাবে, আর 'বাহবা' পাওয়াই তো বই পড়ার উদ্দেশ্য। যে বইগুলির বাজারে খুব কাটতি সাধারণতঃ সেগুলিই তারা পড়ে। 'হ্যামলেট' বা 'কিংলিয়ারের' মতো বই কখনো 'বুক ক্লাবের' দ্বারা নির্বাচিত হয় না। কোন মাসে 'দান্তেকে' জানার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয় না। বর্তমানে মাঝারি 'গোছের' রচনাগুলিই পড়া হয়, শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি স্পর্শ করাও হয় না। এ-ই প্রতিযোগিতার ফল। তবু এর একটা ভালো দিকও আছে। তাঁদের সাহিত্য গুরু অথবা উপদেষ্টারা নির্বাচিত করে না দিলে তাঁরা হয়তো আরো নিম্নস্তরের বইগুলিই পড়তেন। (জ্ঞানের জগতে প্রতিযোগিতা চলে না, কেননা প্রতিযোগিতা আনন্দের অন্তরায়, আর জ্ঞানের উদ্দেশ্য আনন্দ লাভ। তাই আমেরিকাতে জ্ঞানচর্চার নামে যা চলে তা আসলে জ্ঞান অনুশীলন নয়, 'জ্ঞান অনুশীলনের' অভিনয়। অন্তরে গভীর-ভাবে দাগ কাটতে পারে না বলে জ্ঞানকে আরাধনার বস্তু করে তোলা সেখানকার লোকদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই জ্ঞানের ব্যাপারে তন্ময় হওয়ার আনন্দ থেকে তারা বঞ্চিত)।

তিন

'অগাস্টাসের আমলের পরে যেমন জীবনমান অনেক নীচে নেমে গিয়েছিল, 'প্রতিযোগিতার উপর জোর দেওয়ার ফলে আধুনিক কালেও তেমনি 'জীবনমান অনেক' নীচে নেমে যাচ্ছে। দিন দিন নর-নারীর সূক্ষ্ম মানসিক উপভোগের ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। মানুষ যেন ক্রমেই জীবনশিল্প হারিয়ে বসছে। আঠারো শতকের ফরাসী সেলুনে আলাপ-চারিতা বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছিল; পঞ্চাশ কি ষাট বছর পূর্বেও সেই ঐতিহ্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যেত। এটি এমন

একটি চমৎকার কলা ছিল যে, সামান্য ক্ষণস্থায়ী ব্যাপারকে আশ্রয় করেও তা' মানুষের ভেতরের সর্বাপেক্ষা উঁচু ও সূক্ষ্ম বৃত্তিসমূহকে খেপিয়ে তুলতে পারত। আধুনিক জগৎ কিন্তু এ ধরনের বিশ্রাম-সুখের পক্ষপাতী নয়। বিশ বছর পূর্বেও চীন দেশে এই শিল্প পূর্ণ বিকশিত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যেত; কিন্তু জাতীয়তাবাদীদের প্রচারধর্মী উৎসাহের ফলে তা' বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। একশো বছর আগে যে সাহিত্যজ্ঞানে প্রায় সকল শিক্ষিত লোকেরই অধিকার ছিল, আজ তা মাত্র কয়েকজন অধ্যাপকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। শান্তি ও স্নিগ্ধ সুখের অনুসরণ বর্তমানে একেবারে পরিত্যক্ত হয়েছে। প্রয়োজনাতিরিক্ত জিনিস মাত্রেরই মূল্য দিতে মানুষ নারাজ। বলাবাহুল্য এ মূল্যবোধের উন্নয়ন নয়—অধঃপতন। কোন বসন্তদিনে কয়েকটি আমেরিকান ছাত্র হাঁটতে হাঁটতে আমাকে তাদের শিবির-সংলগ্ন বনে নিয়ে গিয়েছিল। বনটিতে সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটে ছিল। কিন্তু দেখতে পাওয়া গেল আমার পথপ্রদর্শকদের কেউই তাদের কোনটিরই নাম জানে না। জানবেই বা কেন? যে-জ্ঞানে আয় বাড়ার সম্ভাবনা নেই তা জেনে কি লাভ?

মুশকিলটা কেবল ব্যক্তিগত নয়, তাই ব্যক্তিগতভাবে এই বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করা যেতে পারে না। এর মূলে আছে সর্বজন-স্বীকৃত জীবনদর্শন, যার মতে জীবন হচ্ছে একটি প্রতিযোগিতা—সংগ্রাম, আর যে ব্যক্তি এই সংগ্রামে জয়লাভ করবে সে-ই হবে সম্মানের পাত্র। এই মতবাদের দরুন ইচ্ছাশক্তির অনুশীলন হয় অত্যন্ত বেশী এবং বুদ্ধি ও অনুভূতির অনুশীলন এক রকম পরিত্যক্ত হয়েই থাকে অথবা একথা বলতে গিয়ে আমরা ঘোড়ার আগেই গাড়ী সাজানর অপরাধ করছি, প্রতিযোগিতার আদর্শের ফলে ইচ্ছাশক্তির অধিক অনুশীলন হচ্ছে, এ কথা না বলে বলা উচিত, ইচ্ছাশক্তির অত্যধিক চর্চার ফলেই প্রতিযোগিতার ইচ্ছা জাগছে। পবিত্রতাপন্থী নীতিবিদরা আধুনিককালে সর্বদাই ইচ্ছাশক্তির উপর জোর দিচ্ছেন,

কিন্তু গুরুতে দিতেন বিশ্বাসের উপর। হতে পারে পবিত্রতাপন্থার যুগ এমন এক ধরনের লোক সৃষ্টি করেছে, যাদের মধ্যে ইচ্ছাশক্তির বিকাশ অত্যন্ত বেশী হয়েছে বলে বুদ্ধিঅনুভূতি উপোসী থাকতে বাধ্য হয়েছে। এই লোকেরাই তাদের স্বভাবের সঙ্গে খাপ খায় ব'লে প্রতিযোগিতার নীতি অবলম্বন করেছে। সে যাই হোক, আধুনিক ডাইনোসোরদের (ডাইনোসোর এক প্রকারের অতিকায় জন্তু, যার বংশ লোপ পেয়েছে) বিস্ময়কর কৃতকার্যতা তাদের সকলেরই অনুকরণীয় করে তুলেছে। এরা এদের ঐতিহাসিক পূর্বগামীদের মতো বুদ্ধির চেয়ে শক্তিকে বড় মনে করে। শ্বেতকায় জাতিরা সর্বত্র এদের আদর্শরূপে গ্রহণ করেছে এবং আগামী একশো বছর ধরে হয়তো এদের প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে। যাঁরা এ ধারার অনুসারক নন, তাঁরা এই ভেবে খুশী হ'তে পারেন যে ডাইনোসোররা শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারে নি, পরস্পর হানাহানি ক'রে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং বুদ্ধিমান দর্শকরা তাদের পরিত্যক্ত স্থান দখল ক'রে বসে। আমাদের আধুনিক ডাইনোসোররাও নিজেদের ধ্বংস ক'রে ফেলছে। গড়পড়তা প্রতি বিয়েতে তারা দু'টির বেশী সন্তান লাভ করে না; যে আনন্দ উপভোগের প্রাচুর্য সন্তান জন্মদানের অনুকূলে, তা থেকে তারা বঞ্চিত। এ থেকে এই প্রমাণিত হয় যে, পিউরিটান পূর্ব-পুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া এই অযথা-কঠোর জীবনদর্শন জগতের পক্ষে অনুপযুক্ত। কঠোর নিরানন্দ জীবনদর্শনের ফলে মানুষের আনন্দানুভূতি মরে যায়, আর আনন্দানুভূতির অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সন্তান জন্মদানের ক্ষমতাও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এই ধরনের আনন্দবর্জিত লোকেরা শরীরতত্ত্বের দিক দিয়ে মৃত। অল্পদিনের মধ্যেই তাদের বিনাশ ঘটবে এবং তাদের স্থান দখল করবে এমন একদল মানুষ, প্রফুল্লতা ও আনন্দচঞ্চলতায় যাদের জীবন উদ্বেল তাদের পদস্পর্শের পুলক লাভ করবার জন্যই পৃথিবী অপেক্ষা করছে।

প্রতিযোগিতা জীবনের প্রধান ব্যাপার বলে বিবেচিত হলে, তা' এতো কঠোর, এতো বিকট ও এত একগুঁয়ে হয়ে পড়ে যে, শেষ পর্যন্ত তা' দৃঢ় সংযোজিত ইচ্ছা ও শক্ত মাংসপেশীর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তাই এই নীতি দু'এক পুরুষের বেশী জীবনের সম্ভব ভিত্তি হিসাবে চলতে পারে না। অচিরেই এমন একটা সময় আসে যখন স্নায়ু ক্লান্তি বোধ করে এবং তার থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সুখের অন্বেষণে এমন কতিপয় পলায়নীবৃত্তির উদ্ভব হয়, যা কঠোরতা ও খিচুনির দিক দিয়ে কাজেরই দোসর। মুক্তি তারা পায় না, কেননা সংকোচন তাদের মজ্জাগত হ'য়ে যায়, আর সংকোচনের ফলে শিথিলতার আনন্দ পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। পরিণাম নির্জীবতা-বশতঃ লয় প্রাপ্তি। প্রতিযোগিতাদর্শনের ফলে যে কেবল কাজই বিষিয়ে উঠে তা' নয়, অবসরও বিষিয়ে ওঠে। স্নিগ্ধকর স্বাস্থ্যপ্রদ অবসরে প্রতিযোগিতাধর্মীরা বিরক্তিবোধ করে। নিরবচ্ছিন্ন ক্ষিপ্রকারিতার ফলে মাদকদ্রব্য সেবন ও অবসন্নতা তাদের ভাগ্য হয়ে দাঁড়ায়। সুসমঞ্জস আদর্শ জীবনে সুস্থ ও স্নিগ্ধ আমোদের স্থান স্বীকার করে না নিলে, এই দুর্ভাগ্য থেকে নিস্তার পাওয়া কঠিন।

(জীবনের উদ্দেশ্য জীবন-উপভোগ, কৃতকার্যতা নয়, কৃতকার্যতা একটি উপায় মাত্র এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পারলেই প্রতিযোগিতার বালাই থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। নইলে তার নিষ্করুণ অত্যাচারে জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। সব ভুলে মরিয়া হয়ে যখন মানুষ প্রতিযোগিতায় মাতে, তখন জীবনে ধ্বংসকেই ডেকে আনা হয়। অথচ প্রতিযোগিতার এমনি অন্ধ মোহ যে, মানুষ তা' উপলব্ধি করতেই পারে না। এই অন্ধতা থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র পথ, লক্ষ্য আর উপায়ের পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন থাকা। লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যই উপায়, তার নিজের কোন মূল্য নেই। লক্ষ্যকে বিস্মৃত হ'য়ে উপায় নিজে যেখানে মাথা তুলে দাঁড়ায়, সেখানে কোন প্রকার সার্থকতা লাভ করা যায় না। প্রতিযোগিতার লক্ষ্য কৃতকার্যতা

আর কৃতকার্যতার লক্ষ্য জীবন উপভোগ। প্রতিযোগিতা যখন সেই জীবন-উপভোগের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, তখন তাকে আর আশকারা দেওয়া উচিত নয়। লক্ষ্যের প্রতি সব সময় দৃষ্টি রাখা দরকার।)

প্রতিযোগিতা যে নিজের এলাকা ছাড়া অপর এলাকায়ও আক্রমণ চালায় তার নজিরস্বরূপ রাসেল বই পড়ার প্রতিযোগিতার উল্লেখ করেছেন। অন্যত্রও এই মনোভাবের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যেমন সাহিত্য ও ধর্ম-বিষয়ে। সাহিত্যিকরা প্রতিযোগিতার অনুরাগী নয়, কেননা তাঁরা জানে প্রতিযোগিতার মনোবৃত্তি সাহিত্যিক উৎকর্ষের পক্ষে অন্তরায়। সাহিত্য ব্যাপারে প্রতিযোগিতার মনোবৃত্তি পোষণ করে জাতীয়গরিমাকামী মানুষ। সে চায় অপরাপর ব্যাপারের মতো এ ব্যাপারেও তার জাতি অন্যান্য জাতিকে পেছনে ফেলে যাক এবং পেছনে ফেলার আনন্দের জন্যই সে সাহিত্যিক উন্নতি কামনা করে, সাহিত্যের আনন্দের জন্য নয়। আমরা নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এই মনোবৃত্তির দু'টি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

আমি তখন ইস্কুলে পড়াচ্ছি। একবার দশম শ্রেণীর একটি বালককে রবীন্দ্রনাথের নামে খুব উল্লসিত হতে দেখলুম। যখন তার উল্লাসের হেতুটি জানতে চাইলুম তখন সে বললে: বলেন কি স্যার? রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের মান বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁর নামে খুশী হব না, তো কার নামে খুশী হব?—আমি বললুম রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ইজ্জত বাড়িয়ে দিয়েছেন বলে আমাদের গৌরববোধ করা স্বাভাবিক, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নামে খুশী হওয়ার কারণ কি শুধু এই? আর কি কোন সুষ্ঠু কারণ নাই? রবীন্দ্রনাথ আমাদের জীবনকে প্রিয় করেছেন, মধুর করেছেন প্রকৃতির সঙ্গে, মানবসংসারের সঙ্গে যুক্ত করে তিনি আমাদের দরিদ্র জীবনে মানসিক সুখ বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন। সেজন্যই রবীন্দ্রনাথের নামে উল্লসিত হওয়া ঠিক নয় কি? গৌরব তো বাইরের ব্যাপার, ভেতরের ব্যাপার হচ্ছে আনন্দ। সেই আনন্দের তাগিদেই কবির নামে আমাদের

বেশী উল্লসিত হওয়া উচিত। কবিকে গৌরবের বস্তুরূপে দেখা, আর তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখা এক কথা।

আমি জানতুম, আমি যা বলছিলাম ছেলেটির পক্ষে তা' বোঝা কঠিন। তবুও বলছিলাম এইজন্য যে, একদল লোকের উপর আমার রাগ ছিল। তারা দেবতাজ্ঞানে নমস্কার করে কবিকে দূরে সরিয়ে রাখে, তাকে নিয়ে গর্ব করে, কিন্তু আনন্দ করে না, তাঁর পূজা করে; কিন্তু জীবন উন্নয়নের প্রেরণারূপে তাঁকে গ্রহণ করে না। তারা হয়তো আসলে রকফেলারের চেলা অথচ দেখায় যেন কত রবীন্দ্রভক্ত! এসব ভণ্ড ভক্তদের উপর আমার যে রাগ ছিল; তা-ই তিরস্কারের রূপ নিয়ে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ছিল। আমি ছেলেটিকে তাদেরই একজন বলে ধরে নিয়ে ঝাল ঝাড়ছিলাম।

শেষে তাকে কাছে ডেকে এনে বললুম: দেখ রবীন্দ্রনাথকে গৌরবের বস্তু করে দেখা ঠিক দেখা নয়, আনন্দের বস্তু করে দেখাই ঠিক দেখা। গৌরব তাকে আমাদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে, আনন্দ তাকে কাছে টেনে আনবে। রবীন্দ্রনাথ কবি, তিনি আমাদের জন্য আনন্দের আয়োজন করেছেন। সেজন্যই তাঁকে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা করা উচিত এবং ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার ভিতর দিয়েই তাঁকে আপন করে পাওয়া যাবে, গর্বের ভেতর দিয়ে নয়। যারা বোঝে না, তারাই তাঁকে নিয়ে গর্ব করে, যারা বোঝে তারা আনন্দ করে।

ছেলেটি এবার যেন কিছু বুঝলে; মৃদু হেসে সে চলে গেল।

চার

আজ আরেক দিনের ঘটনা বলছি। সপ্তম শ্রেণীতে গিয়ে দেখি সেখানে একটা থমথমে ভাব, সকলের চেহারায় একটা উদ্বেগের লক্ষণ পরিস্ফুট। ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করার পূর্বেই চোখ পড়ল কোণের দু'টি ছেলের উপরে। দেখলুম তাদের চক্ষু শ্রাবণের

আকাশের মতো জলভারাক্রান্ত। বোধ হয় একটু নাড়া পেলেই ঝরঝর করে বৃষ্টি নামবে। মাথার চুল তাদের উসকখুসক; চেহারা ঈষৎ রক্তিমাভ। বুঝলুম একটা কিছু ঘটেছে।

জিজ্ঞেস করে জানলুম উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি হতে হতে হাতাহাতি হয়ে গেছে এবং কথা কাটাকাটির বিষয় হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ বড় কি নজরুল ইসলাম বড় এই প্রশ্ন। বলাবাহুল্য যিনি নজরুল ইসলামকে বড় বলছিলেন তিনি মুসলমান সমাজের উদ্ধারকর্তা, আর যিনি রবীন্দ্রনাথকে বড় বলছিলেন তিনি হিন্দু সমাজের। হিন্দু ছেলেটিকে বললুম রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আওড়াতে, আর মুসলমান ছেলেটিকে বললুম নজরুল ইসলামের একটি কবিতা মুখস্থ বলতে। দু'জনই সমান পারদর্শিতার পরিচয় দিলে। শ্রীমান হিন্দু ও শ্রীমান মুসলমান উভয়ই নীরবতার প্রতীক হয়ে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। আমি দু'টি ছেলেকেই ভালো করে জানতুম। এদের কেউই রবীন্দ্রনাথ কি নজরুল ইসলাম কাউকেই পড়েনি এবং পড়বেও না। অথচ তুলনামূলক সমালোচনায় অবতীর্ণ হতে এদের কোন সংকোচ নেই। অহমিকাজাত প্রতিযোগিতা মনোবৃত্তির প্রধান ত্রুটি এই যে, তা মানুষকে সৃষ্টিধর্মী না করে অনুকরণ ও অনুসরণধর্মী করে তুলে। অমুকে করেছে, সুতরাং আমাকেও করতে হবে, এই মনোভাব যখন মানুষের জীবনে বড় হয়ে ওঠে, তখন তার দ্বারা কোন সত্যিকার কাজই হতে পারে না। অমুক করলেই সে করবে, নইলে চুপ করে থাকবে। এ অবস্থা মনের জড়ত্বেরই প্রকাশক, আর জড়ত্ব স্বাস্থ্য নয়, ব্যাধি। সজীব ও সুস্থ্য মন কাজ করে মনের তাগিদে, প্রতিযোগিতার তাগিদে নয়। তথাপি প্রতিযোগিতার নাগপাশ থেকে মানুষ মুক্তি পায় না। ব্যক্তিগত অহমিকার মতো জাতীয় অহমিকাও মন্দ, কেননা বুদ্ধিবিচার নষ্ট করে দিয়ে তা মানুষকে অন্ধ করে দেয়, যতদিন মানুষের মনে এ-বোধ সঞ্চারিত না হচ্ছে ততদিন তার মুক্তি নেই—ততদিন অন্ধের মতো প্রতিযোগিতার ঘানি টেনে চলা তার ললাটলিপি।

মাঝে মাঝে আমাদের সাহিত্যিক দৈন্যের জন্য বন্ধুবান্ধবকে আফশোস করতে শুনি। একটু তলিয়ে দেখলে টের পাওয়া যায়, তাদের আফশোসের মূলে রয়েছে অহমিকাজাত প্রতিযোগিতার মনোবৃত্তি, সত্যিকার সাহিত্যপ্রীতি নয়। তাদের কথার সুরের দিকে তাকালেই আমার কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে : ইস্, হিন্দু সমাজে কত সাহিত্যিক কবি জন্মগ্রহণ করেছে। আমাদের সমাজ একেবারে দীন ; নজরুল ইসলামের পরে আর উল্লেখযোগ্য লেখক আসেনি বললেই হয়। কী দীনতা! লজ্জায় মাথা কাটা যায়?— তারা সাহিত্য চায় গৌরবের জন্য তথা লজ্জা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য—আনন্দ তথা জীবনবোধের জন্য নয়।

প্রীতির তাগিদে না এসে গৌরবের তাগিদে আসায়, সাহিত্যিক দীনতাবোধ এদের সৃষ্টিধর্মী করে তুলতে পারে না। তার প্রমাণ পাওয়া যায় দু'টি ব্যাপারে। প্রথমতঃ যেসব সত্যিকার সাহিত্যিক সমাজে জন্ম গ্রহণ করেছেন তাঁদের প্রতি এরা খুব শ্রদ্ধান্বিত নয় ; অনেক সময় এরা তাঁদের প্রতি এমন নজরে তাকায় যেন তাঁরা সমাজের বন্ধু নন, দুষমন। যে নজরুল ইসলামকে নিয়ে এরা এত বড়াই করে, সেই নজরুল ইসলামের প্রতিও তারা সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল নয়। সাহিত্য না চেয়ে সাহিত্যজনিত গৌরবটুকু চাওয়া হয় বলেই এদের এই মানসিক অনৈক্য। দ্বিতীয়তঃ সাহিত্যিক দীনতার কারণ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণায় পৌঁছা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তারা এমনভাবে কথা বলে যে, শুনে মনে হয়, সাহিত্য আর সমাজ দু'টো আলাদা ব্যাপার—একটার সঙ্গে আরেক-টার কোন সম্পর্ক নেই। আসলে সাহিত্যের জন্য আফশোস না করে যে সমাজের জন্য আফশোস করা দরকার, কেননা সামাজিক দৈন্যই সাহিত্যিক দৈনরূপে প্রকাশ পায়—তা তারা একেবারেই উপলব্ধি করতে পারে না। তাই সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি অপরিবর্তিত রেখেই সাহিত্যিক কৃতকার্যতার স্বপ্ন দেখা তাদের কাছে অবাস্তব ও

অদ্ভুত বলে মনে হয় না। নইলে তারা টের পেত সামাজিক নীরবতা ও অন্ধতার দরুন জীবন বিকশিত হচ্ছে না বলেই সাহিত্য সৃষ্টি ব্যাহত হচ্ছে। তাই সাহিত্য সৃষ্টির জন্য যে জিনিসটা সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয় তা হচ্ছে মুক্তবুদ্ধি ও সরস-সুন্দর জীবন—জীবনচর্চার অভাবেই সাহিত্যচর্চা অসার্থক থেকে যাচ্ছে। দুঃখটি ভেতরের ব্যাপার না হয়ে বাইরের ব্যাপার হওয়াতেই তারা বিষয়টির গোড়ায় হাত দিতে পারছে না। ফলে ঘোড়ার আগে গাড়ী সাজানর ব্যাপার চলছে।

ধর্মের ব্যাপারেও প্রতিযোগিতার নিদর্শন মিলে। মানুষ যখন চীৎকার করে বলে যে, তার ধর্মই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং তার ধর্মপ্রবর্তক জগতের শ্রেষ্ঠতম মহাপুরুষ, তখন তা সত্যিকার ধর্মোপলব্ধি বা সত্যোপলব্ধির ব্যাপার না হয়ে অহমিকাতৃপ্তির ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্য ধর্ম ও ধর্মপ্রবর্তকের মহত্ব উপলব্ধি করাও তার পক্ষে সম্ভব হয় না। অন্তর অহঙ্কারে পূর্ণ থাকে বলে মহত্ব সৌন্দর্য প্রভৃতি ঐশীভাব সেখানে স্থান খুঁজে পায় না। সত্যি-সত্যি ধার্মিক হতে চাইলে ধর্মটি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম আর মহাপুরুষটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মহাপুরুষ না হলেও ধার্মিক হওয়া যায়, যেমন শিক্ষকটি প্রথম শ্রেণীর না হলেও ছাত্রটি প্রথম বিভাগে পাস করতে পারে আর শিক্ষকটি প্রথম শ্রেণীর হলেও ছাত্রটির পক্ষে ফেল করা অসম্ভব কিছু নয়। আসল ব্যাপার হচ্ছে সাধনা, ঐকান্তিক আগ্রহ। ভগবদ-উপলব্ধির আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে প্রকৃত জীবন থেকে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নীত করে। ধর্ম ও ধর্মগুরুর শ্রেষ্ঠতা ঘোষণায় প্রতিযোগিতার আনন্দ ছাড়া আর কোন লাভ নেই। এ একটা আত্মপ্রসাদ লাভের উপায়, তার বেশী কিছু নয়। তাতে আত্মার সৃষ্টিধর্ম ব্যাহত হয়। কবি সাহিত্যিকদের যেমন নিজের একটি পথ সৃষ্টি করে নিতে হয় নইলে তাদের কাব্য ও সাহিত্য-সাধনা সার্থক হয় না ধার্মিককেও তেমনি একটি নিজস্ব পথ সৃষ্টি করে নিতে হয়

নইলে তাদের সাধনা অসার্থক থেকে যায়। অন্যান্য বড় জিনিসের মতো ধর্মকেও নিজের ভেতরে সৃষ্টি করে নিতে হয়। 'রেডিমেড' যে-সব ধর্ম পাওয়া যায় তাতে বিশেষ লাভ হয় না। অনুসরণ ধর্ম নয়, ধর্মের নকলনবিশি মাত্র। মানুষের ভেতরে সত্যিকার ঐশী-চেতনা জাগাতে পারে না বলে তা মূল্যহীন।

ধর্ম-ব্যাপারে প্রতিযোগিতার সব চাইতে বড় ত্রুটি এই যে, তা মানুষকে ধীরে ধীরে মূর্তিপূজকে পরিণত করে। অথচ সে তা একেবারেই উপলব্ধি করতে পারে না। প্রতিযোগিতার তাগিদে মানুষ মনুষ্যত্ব বা সত্যের ধারাকে বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে দ্বিধা করে না। তখন সত্যের অব্যাহত গতি অবরুদ্ধ হয় বলে সেই ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান মূর্তিতুল্য হয়ে দাঁড়ায়। তখন তাদের প্রতি মানুষের যে আকর্ষণ তা মোহের আকর্ষণ, মনুষ্যত্বের আকর্ষণ নয়। তার প্রমাণ এখানে যে, অন্যত্রও সে অনুরূপ আকর্ষণ অনুভব করে না—সারা বিশ্ব জুড়ে মনুষ্যত্বের যে মুক্তধারা প্রবাহিত তা তার মনে কোনপ্রকার সাড়া জাগাতে পারে না। এ জড়তার অবস্থা, চেতনার অবস্থা নয়—আর মূর্তিপূজার ফলেই এই অবস্থার সৃষ্টি। মূর্তি যে কেবল মাটির নয়, ভাবেরও হতে পারে, যে সকল হতভাগ্য তা উপলব্ধি করতে অক্ষম তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে তা দেখান সম্ভব নয়। কেননা চক্ষু থাকা সত্ত্বেও যারা অন্ধ তাদের দেখান কঠিন। অনেক সময় ব্যক্তিবিশেষকেও মূর্তিতে পরিণত করা হয়। যখন জীবন-প্রেরণার জন্য না তাকিয়ে স্রেফ মোহবশতঃ কারো প্রতি তাকান হয়, তখন তিনি সত্য-সত্যই মূর্তিতে পরিণত হন। ধ্যান-কল্পনার বলে মূর্তিতে প্রাণ সঞ্চার করা হয় বলে একটা কথা আছে, কিন্তু এখানে তাও হয় না। অতএব তাকে মূর্তিপূজা না বলে তার চেয়েও অপকৃষ্ট নামে অভিহিত করা দরকার; আর তা হচ্ছে স্থূলতার পূজা। এই পূজায় মানুষ যতটা স্থূলবুদ্ধি হয়, মূর্তিপূজায় ততটা হয় না। কেননা মূর্তিপূজায় বুদ্ধিবিচারের সম্পর্ক রহিত

হলেও ধ্যানকল্পনার সম্পর্ক রহিত নয়। কিন্তু এখানে বুদ্ধিবিচারের তো কথাই আসে না; ধ্যানকল্পনারও নাম গন্ধ নেই। এটা একেবারে নির্জলা মরুভূমি। মানুষবিশেষকে নির্বিচারে গ্রহণ করার অনুপ্রবৃত্তিই এই স্থূলতা পূজার মূলে। মনুষ্যত্ববোধের উৎসটি একেবারে রুদ্ধ করে দেয় বলে এর কবল থেকে মুক্তি পাওয়া একান্ত দরকার। মনুষ্যত্বকে কোন বিশেষ মানুষে আবদ্ধ না করে তাকে সর্বত্র উপলব্ধি করার চেষ্টা করলেই এ-দুর্ভোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সর্বত্র মনুষ্যত্বকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হলে যে জাগ্রতচিত্ততার প্রয়োজন, কোন বিশেষ ব্যক্তিকে একান্তভাবে শ্রদ্ধা নিবেদনে সে জাগ্রতচিত্ততার প্রয়োজন হয় না; তা হয়ে থাকে একটা অন্ধ অভ্যাসের ব্যাপার—যান্ত্রিক ব্যাপার বললেও আপত্তি নেই। তাতে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না, বিনাশ হয়।

যা বলছিলাম। প্রতিযোগিতার তাগিদে কোন জিনিস গ্রহণ না করে আনন্দের তাগিদে গ্রহণ করা উচিত। আনন্দই আমাদের সৃষ্টিধর্মী করতে পারে, প্রতিযোগিতা নয়। তাই প্রতিযোগিতার প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিতে না তাকানই ভালো। প্রতিযোগিতার মস্ত ত্রুটি এই যে, প্রতিযোগির অভাবে মানুষ কোন প্রকার কর্মপ্রেরণা অনুভব করে না এবং কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমিয়ে কাল কাটায়। এ মনোভাব স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়: তাই যত শীঘ্র তা বর্জন করা যায় ততই মঙ্গল। কাজ করতে হবে কাজেরই আনন্দে, কাউকে হারিয়ে দেওয়ার জন্য নয়। সুস্থ মানুষ তাই করে; অসুস্থ মানুষের জন্যই প্রতিযোগিতার [illegible] দরকার হয়।

অবসাদ

অবসাদ নানা প্রকারের। তন্মধ্যে কোন-কোনটি সুখের বিশেষ শত্রু। শারীরিক অবসাদ মাত্রা অতিক্রম করে না গেলে সুখেরই হেতু হয়ে দাঁড়ায়। তাতে ক্ষুধা বাড়ে, নিদ্রাহীনতা দূর হয় এবং অবসরের দিনগুলি মাধুর্যে ভরে ওঠে। আল্‌সেমির মধ্যে যে একটা সুখ রয়েছে, শারীরিক পরিশ্রমের হাতেই তার পরিবেশনের ভার। কিন্তু মাত্রাধিক্য ঘটলেই তা মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর সমাজের মেয়েরা অতিরিক্ত মেহনতের দরুন কুড়িতেই বুড়ি হয়ে যায়। শিল্পযুগের প্রথম দিকে অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হ'ত এবং মেহনতের ধাক্কা সামলাতে না পেরে তাদের অনেকেই অকালে অক্কা পেত। যারা বেঁচে থাকত, তারাও বাঁচার স্বাদ পেত না, মরার মত জীবনযাপন করত। যেখানে শিল্পযুগ সবেমাত্র শুরু হয়েছে, সেখানে অনুরূপ ব্যাপারটি এখনো ঘটে। চীন, জাপান এবং দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন অনুন্নত রাষ্ট্রের পানে তাকিয়ে সহজেই একথা বলা যায়। সে-সব দেশে অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে জীবন এতোই দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে যে, সেখানকার লোকেরা শিল্পায়নকে আশীর্বাদ মনে না করে অভিশাপই মনে করে। এর ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায় শুধু বিজ্ঞান-উন্নত অগ্রসর দেশসমূহে। অবস্থার উন্নয়নের দ্বারা সেখানে শারীরিক অবসাদ এতটা দূর করা হয়েছে যে, নেই বললেই চলে। অগ্রসর সম্প্রদায়ের মধ্যে যে-অবসাদটি আজকাল চোখে পড়ে,

সেটি হচ্ছে স্নায়বিক অবসাদ, শারীরিক অবসাদ নয়। দরিদ্রদের চেয়ে অবস্থাপন্নরাই তাতে ভোগে বেশী। বুদ্ধিজীবী ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে তা যতটা দেখতে পাওয়া যায়, দিনমজুরদের মধ্যে ততটা চোখে পড়ে না। বর্তমানে সভ্যসমাজে শারীরিক অবসাদের চেয়ে স্নায়বিক অবসাদের সমস্যাই অধিক জটিল। তাই সেদিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার।

আধুনিক কালের স্নায়বিক অবসাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাজার চেষ্টা করেও মানুষ তা থেকে মুক্তি পাচ্ছে না। স্নায়বিক অবসাদের কারণ অনেক। তন্মধ্যে প্রথমেই উচ্চনিনাদ বা কোলাহলবেষ্টিত জীবনের কথা বলতে হয়। অতিরিক্ত কোলাহলের জালে আবদ্ধ হয়ে বাস করতে হচ্ছে বলে শহরবাসীদের স্নায়ুতে জীর্ণতা দেখা দিচ্ছে। শহরে সুস্থ স্নায়ুর লোক নেই বললেই চলে। আপনি যে সকল শব্দই শোনবার চেষ্টা করেন তা নয়, অনেক কিছুই এড়িয়ে যেতে চান। কিন্তু এই যে না শোনবার সজ্ঞান চেষ্টা এটাই স্নায়ুর পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। স্নায়ুপীড়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে নিত্যনবাগতের সাক্ষাৎ। প্রাণীর মতো মানুষেরও স্বভাব হচ্ছে, যাদের সঙ্গে দেখা হয় তাদের সঙ্গে শত্রুভাবে কি মিত্রভাবে ব্যবহার করতে হবে তা ভেবে দেখা। এতে করে জীবনে একটা সাবধানতার দরকার হয়ে পড়ে, আর সাবধানতা পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সহজ হতে পারে না বলে অতিরিক্ত সাবধান লোকেরা দুঃখই পেয়ে থাকে। ট্রেনে যে সকল যাত্রী ভিড়ের সময় চলাফেরা করে, তাদের চেহারায় যে একটা অস্বস্তির ভাব ফুটে ওঠে, তা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন। অপরিচিত লোকদের মধ্যে চলতে হচ্ছে বলে তারা সহজ হতে পারছে না, আর সহজ হতে পারছে না বলে সুখও পাচ্ছে না। তারপর ভোরের গাড়ী ধরার তাড়াহুড়া ও তজ্জনিত অগ্নিমান্দ্য তো আছেই। এ-সব কারণে অফিসে এসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই কালো কোটপরা কর্মচারী

বাবুদের স্নায়ু অবসন্ন হয়ে পড়ে। তখন মানব জাতিকে শ্রদ্ধা করার মতো কিছুই তারা খুঁজে পায় না—সে তাদের কাছে একটা বালাই বা জঞ্জাল হয়ে দেখা দেয়। মন শ্রদ্ধাবিমুখ হলেও চাকরী রক্ষার জন্য তাদের জোর করে শ্রদ্ধার অভিনয় করতে হয়। তাতে ফল হয় আরো খারাপ। স্বতঃস্ফূর্ততার অভাবে স্নায়ু আরও অবসন্ন হয়ে পড়ে। সপ্তাহের মধ্যে একবার যদি তারা মনিবটির কান মলে বুঝিয়ে দিতে পারতো, তার সম্বন্ধে সত্যি সত্যি তারা কী ধারণা পোষণ করে, তো স্নায়ুবিক উত্তেজনার অনেকটা লাঘব হত। কিন্তু এতে করে কর্মচারীটির মুক্তি হলেও মনিবটির মুক্তি হয় না। সে যে-তিমিরে সে-তিমিরেই পড়ে থাকে।

কর্মচারীদের বেলা ভয় যেমন চাকরী যাওয়ার, মনিবদের বেলা তেমনি দেউলে হওয়ার। কেউ-কেউ যে এই সম্ভাবনার উর্ধ্বে গিয়ে পৌঁছেনা তা নয়। কিন্তু তাতেও বিশেষ লাভ হয় না। পৃথিবীর ব্যবসায়ের খুঁটিনাটি খবর রাখা এবং প্রতিযোগীদের চাল ব্যর্থ করে দেওয়ার চেষ্টা—এসবের জন্যে যে সতর্কতার প্রয়োজন হয়, তাতে অসন্দিগ্ধ কৃতকার্যতা লাভের পূর্বেই তাদের স্নায়বিক দৌর্বল্য দেখা দেয় এবং উদ্বেগের ভাবটি এমন দৃঢ়মূল হয়ে পড়ে যে, যখন সত্যি সত্যি কোন উদ্বেগ কারণ থাকে না, তখনো তারা উদ্বিগ্ন না হয়ে পারে না। উদ্বেগ অস্থিমজ্জাগত হয়ে যায় বলে দেউলে হওয়ার জুজুর ভয় থেকে তারা নিষ্কৃতি পায় না। বিনা পরিশ্রমে প্রচুর ধনের মালিক হওয়ার দরুন ধনীসন্তানদের এরূপ উদ্বেগ প্রবণতা না থাকারই কথা। কিন্তু উদ্বেগের বাস্তব কারণ না থাকলেও তারা মাঝে মাঝে এমন উদ্বেগের পরিচয় দেয় যা দরিদ্র সন্তানদেরই মানায়। বাজীধরা, জুয়াখেলা ইত্যাদি কুক্রিয়াসক্ত হয়ে তারা পিতার বিরাগভাজন হয়। ফলে উদ্বেগের মাত্রা বেড়ে যায়। পিতার মন পাওয়া যাবে না ভেবে তারা হয়রান হয়ে পড়ে। আমোদের খাতিরে ঘুমের মাত্রা কমিয়ে দিয়েও তারা স্নায়বিক অবসাদ ডেকে

আনে। ফল দাঁড়ায় এই যে, যখন বিয়ে-থা করে গেরেস্তালি পাতে, তখন তাদের জনকদের মতো তাদেরও স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা বিগড়ে যায়। তখন তাদের অবস্থা আর গরীবদের অবস্থার কোনই পার্থক্য থাকে না। গরীবের ভোগের ক্ষমতা আছে, আয়োজন নেই। এদের বেলায় আয়োজন আছে, কিন্তু ক্ষমতার অভাব। ইচ্ছায় হোক, প্রয়োজনের তাগিদে হোক অথবা নির্বাচনের টানে হোক, অনিচ্ছায় হোক যেভাবেই হোক না কেন, আধুনিকতাপন্থীদের অনেকেই এমন জীবনের অনুরাগী হয়ে পড়ে, যার পরিণতি স্নায়ু পীড়া। স্নায়বিক অবসাদের ফলে স্বাভাবিক স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাওয়ার দরুন সুরার সাহায্য ব্যতীত তারা আর সুখ পায় না।

এইসব নির্বোধ ধনীদের ছেড়ে দিয়ে এখন আমরা তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করবো, যাদের অবসাদ জীবন ধারণের জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফল। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই অবসাদও আসলে দুশ্চিন্তারই সৃষ্টি। আর দুশ্চিন্তা দূর করবার উপায় হচ্ছে উন্নততর জীবনদর্শন আর মানসিক নিয়ন্ত্রণ। অনেক লোক তাদের মনের উপর কোনপ্রকার শাসন রাখতে পারে না—সময়ের চিন্তা সময়ে করা তাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে মনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় আর বিশৃঙ্খল মন উত্তরোত্তর উদ্বেগ বাড়িয়েই চলে। শুতে যাওয়ার সময় ব্যবসায়ের চিন্তা করা ঠিক নয়, কেননা তাতে নিদ্রার ব্যঘাতই ঘটে, সমস্যার সমাধান হয় না। তথাপি বেশীর ভাগ মানুষ তা-ই করে। যে সময় পরিপূর্ণ মানসিক বিশ্রামের দ্বারা আগামী দিনের সংগ্রামের জন্য শক্তি সঞ্চয় করা দরকার, সে সময়ে সমস্যাগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে তারা নিজেদের অনর্থক বিক্ষুব্ধ করে তোলে। মধ্যরাত্রে বিক্ষোভের জের ভোরেও থেকে যায়। ফলে বিচারক্ষমতা যায় ঘোলাটে হয়ে, মেজাজ যায় বিগড়ে, আর প্রতিটি বাধা দেখা দেয় উন্মাদকর ক্রোধের কারণ হয়ে। বুদ্ধিমান লোকেরা কিন্তু এ পথের পথিক হয় না। তারা যখন দুঃখের কথা

ভাবে, তখন তার থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা পন্থা নির্ধারণের উদ্দেশ্য নিয়েই ভাবে, পাগলের মতো বিনা উদ্দেশ্যে ভাবে না। অন্য সময় তারা অন্য চিন্তা করে; অথবা বললে যদি অন্যায় না হয়, তো বলতে পারা যায়, কোন বিষয়েই চিন্তা করে না। অবশ্য গভীর সংকটের সময় যে বিপদের কথা চিন্তা না করেও থাকা যায়, এমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আপনি যদি দেখতে পান আপনার বিপদ আসন্ন, অথবা আপনার স্ত্রীর বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে, তো আপনি উদ্বিগ্ন না হয়ে পারেন না, (সুনিয়ন্ত্রিত মনের অধিকারী হলেও অবশ্য এ অবস্থায়ও আপনার পক্ষে অনুদ্বিগ্ন থাকা অসম্ভব নয়।) সাধারণ দুঃখ ও বিপদের সময় কিন্তু মানুষ এতটা উদ্বিগ্ন না হলেও পারে। তবু যে হয় তার কারণ মানসিক শৃঙ্খলার অভাব। মানসিক শৃঙ্খলার সাধনা করলে যে সুখ ও কার্যনিপুণতা বাড়ে, তা সত্যই বিস্ময়কর। এই ধরণের সাধকরা ঠিক সময় ঠিক ভাবনাটি ভাবে, অসময়ে ভেবে নিজেকে তিক্তবিরক্ত করে না। একটা কঠিন সমস্যার সমাধান করতে হলে উপাত্তগুলি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে সম্বন্ধে বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে ভেবে দেখা দরকার। তাহলেই একটা সার্থক সমাধানে এসে পৌঁছা সহজ হয়। নতুন কোন তথ্য চোখে না পড়া পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করা সঙ্গত হবে না। বার বার বিনা কারণে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ফলে মনের প্রশান্তি নষ্ট হয়ে যায়; অনিশ্চয়তার দোলায় দুলে মন ক্লান্ত ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

উদ্বেগের কারণটি অকিঞ্চিৎকর, একথা জানতে পারলেই অনেক দুশ্চিন্তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। অনেক সময় অত্যন্ত বাজে ব্যাপারেও আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। মুক্তির আলোকে দেখলে টের পাওয়া যাবে, ব্যাপারটি যতটা বাড়িয়ে দেখা হয়েছে আসলে কিন্তু ততটা বাড়িয়ে দেখার মতো কিছু নয়। নিজের জীবনে এ-কথার

প্রমাণ পেয়েছি অনেকবার। সুতরাং তাকে একটা খেয়াল বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমি এককালে অনেক বক্তৃতা করেছি। কিন্তু প্রতিবারেই বক্তৃতা দেওয়ার সময় এতটা ঘাবড়ে যেতুম যে, বক্তব্যটুকু ভাল করে প্রকাশ করতে পারতুম না। বক্তৃতা দেওয়ার পূর্ব থেকেই পা দুটি কাঁপতে শুরু করতো এবং 'পা দুটি ভেঙ্গে গেলেই বক্তৃতা দেওয়ার দায় থেকে রক্ষা পাই' এমনি ভাবনা আমাকে পেয়ে বসতো। পরে আস্তে আস্তে নিজেকে এই বোঝালুম যে, আমার ভাল কি মন্দ বলায় পৃথিবীর কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই—তা যে ভাবে ছিল সে ভাবেই থাকবে। অতএব নিজের বক্তৃতার উৎকর্ষাপকর্ষ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। ফলে এই দেখতে পেলুম যে বক্তৃতার উৎকর্ষ সম্বন্ধে আমি যতই কম ভেবেছি আমার ভাষণ ততই কম খারাপ হয়েছে এবং সে অনুপাতে আমার স্নায়বিক অবসাদও কমেছে। বেশীর ভাগ স্নায়বিক অবসাদের গোড়ায় রয়েছে দুশ্চিন্তা, আর দুশ্চিন্তার গোড়ায় নিজের কাজ সম্বন্ধে অতিরিক্ত উচ্চ ধারণা। আমার কাজের উপর পৃথিবীর ভালমন্দ নির্ভর করে না, একথা নিজকে বোঝাতে পারলেই সহজতার আনন্দে জীবন ভরে ওঠে। শুধু সাধারণ উদ্বেগ নয়, কঠিন উদ্বেগ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়ও এই। জীবনে মাঝে মাঝে এমন বিপদ দেখা দেয় যে, মনে হয়, আর কখনো সুখের মুখ দেখা সম্ভব হবে না। কিন্তু কালক্রমে সেই ভয়ংকর বিপদও নিশ্চিহ্ন হতে দেখা যায়। মেঘ কেটে গিয়ে আবার সূর্য আত্মপ্রকাশ করে। অতএব বিপদকে বাড়িয়ে না দেখাই ভালো। আপনি নিশ্চয়ই অনেকবার বিপদে পড়েছেন এবং প্রত্যেকবারই মনে করেছেন, এবার আর বাঁচোয়া নেই। কিন্তু প্রত্যেকবারই আপনি বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং দেখতে পেয়েছেন যে, প্রথম অবস্থায় তার হাঁ-টা যত ভয়ংকর মনে হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তত ভয়ংকর মনে হয়নি। সময়ে সবই সয়ে যাবে, এই উপলব্ধির উপর নির্ভর করতে পারলে উদ্বেগ বেশ

হাল্কা হয়ে যায়। বিপদ আসে আমাদের ধৈর্য ও সাহস পরীক্ষা করতে, এ-ক্ষেত্রে এ-কথাটিও মনে রাখা দরকার। নিজের সম্বন্ধে অধিক ভাবতে নেই, ভাবলে মন বিগড়ে যায়, আর মন বিগড়ে গেলে সহজ আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। তাই দেখতে পাওয়া যায়, আত্মকেন্দ্রিক লোকের তুলনায় আত্মাতিগ লোকের জীবন অনেক শান্তির। বিশ্বের কথা ভাবনেওয়ালাদের চেয়ে নিজের কথা ভাবনে-ওয়ালাদের জীবন অনেক দুঃখময়।

স্নায়ুর স্বাস্থ্যনীতি সম্বন্ধে এখনো বিশেষ গবেষণা হয়নি। হলে অনেক লাভ হত। অবসাদের কারণ অনুসন্ধানে বিস্তৃত অভিযান চালিয়ে শ্রমমনস্তত্ত্ব এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছে যে, অধিকক্ষণ কাজে লেগে থাকলে, মনে অবসন্নতা দেখা দেবেই। এ-এমন একটা সিদ্ধান্ত যার জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজন হয় না—যা অবৈজ্ঞানিক লোকের পক্ষেও বলা সহজ। মনস্তাত্ত্বিকগণ চিন্তা করছে কেবল শারীবিক অবসাদ নিয়ে। শিশু ছাত্রদের অবসাদ নিয়েও কিছুটা গবেষণা হয়েছে। কিন্তু আধুনিককালে যে দিকটা গুরুত্বপূর্ণ, সেই মনস্তাত্ত্বিক দিকটা সম্বন্ধে বিশেষ কোন গবেষণা হয়নি। শারীরিক অবসাদের মত মানসিক অবসাদের দাওয়াইও ঘুম। ঘুমুলেই উভয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আবেগবর্জিত মানসিক শ্রমের ফলে—যেমন দীর্ঘ হিসাবের দরুন—প্রতিদিন যে অবসাদ আসে, নিদ্রাই তা ঝেঁটিয়ে দূর করতে সক্ষম। আবেগ সংক্রান্ত অবসাদকে কিন্তু অত সহজে তাড়ানো যায় না। তা বেশ জটিল। তার প্রধান ত্রুটি এই যে, যে অবসর ও নিদ্রা অবসাদের দাওয়াই, তাকেই তা অসম্ভব করে তোলে। স্নায়বিক স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণ অতিরিক্ত কাজ, আর অতিরিক্ত কর্মস্পৃহার মূলে রয়েছে আবেগ সংক্রান্ত উদ্বেগ। এর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই মানুষ নিজেকে অনবরত কাজে ডুবিয়ে রাখতে চায়। তাই তার ছুটি মেলে না, বিছানায় গিয়েও তাকে চিন্তায় ছটফট করতে হয়। কিন্তু তাতে ক্ষতি ছাড়া লাভ হয় না। ধরা যাক,

লোকটির চিন্তার কারণ তার দেউলে হওয়রে সম্ভাবনা। সে-ক্ষেত্রে তার উদ্বেগ আর তার কাজ একসূত্রে গ্রথিত। উদ্বেগের তাড়নায় সে এত বেশী কাজ ও চিন্তা করে চলে যে, তার বুদ্ধি ঘোলাটে হয়ে যায় এবং ফলে যে সময় দেউলে হওয়ার সম্ভাবনা, তার বহু পূর্বেই তাকে দেউলের খাতায় নাম লেখাতে হয়। মনে রাখা দরকার, অতিরিক্ত কাজের দরুন যতটা স্বাস্থ্যহানি ঘটে, তার অনেক বেশী ঘটে মানসিক উদ্বেগের দরুন। অতএব শ্রম কমালেই মানুষের মুক্তি হবে, এ-ধারণা ভুল। উদ্বেগও কমাতে হবে, নইলে সুস্থ মানুষের সাক্ষাৎ মিলবে না।

উদ্বেগের মনস্তত্ত্ব মোটেই সরল নয়। মানসিক শৃঙ্খলার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সময়ের চিন্তা সময়ে করলে অনেক লাভ। প্রথমতঃ তাতে কম চিন্তা খরচ করে কাজ করা সম্ভব হয় ; দ্বিতীয়তঃ তা নিদ্রাহীনতার দাওয়াই ; তৃতীয়তঃ বুদ্ধি ও নিপুণতা বাড়িয়ে দেয় বলে তাতে সহজেই একটা সার্থক সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছা যায়। কিন্তু নির্জ্ঞান বা অচেতনকে স্পর্শ করতে না পারলে শোচনীয় অবস্থায় এ-পদ্ধতি প্রয়োগে বিশেষ ফায়দা হয় না। সচেতনের উপর অচেতনের প্রভাব নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে, অচেতনের উপর সচেতনের প্রভাব নিয়ে তত আলোচনা হয়নি। হলে অনেক লাভ হত। অচেতনের উপর যুক্তিবিচারলব্ধ সচেতন ধারণার গভীর প্রভাব থাকা দরকার, নইলে তা বিশেষ কার্যকরী হয় না। অমুক বিপদটা যদি আসে তো তেমন ভয়ের কারণ নেই, একথা কেবল সচেতন বুদ্ধি দিয়ে বললে চলবে না, অবচেতনেও এর সমর্থন থাকা চাই। নইলে চিন্তা ও কাজে মিল থাকবে না। সচেতন করায় চিন্তা, আর অচেতন করায় কাজ, একথাটা মনে রাখা দরকার। আমার মনে হয়, ইচ্ছাশক্তির জোরে সচেতনবুদ্ধিলব্ধ ধারণাকে অচেতনের ব্যাপার করে তোলা যায়। একটা ভাবনার উপর বারবার জোর দেওয়া হলে তা শেষ পর্যন্ত নির্জ্ঞানের ব্যাপার না

হয়ে পারে না। আজকের সচেতন লোকের ব্যাপার কালকে অচেতনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, এতো হামেশাই দেখতে পাওয়া যায়। তরুণ বয়সের প্রবল প্রেমাবেগ বৃদ্ধ বয়সে মরে যায় না, গভীরে তলিয়ে যায়, আর এই গভীরে তলিয়ে যাওয়ারই অপর নাম অচেতনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। যা বেশী সময়ে আপনা-আপনিই হয়, চেষ্টার দ্বারা তা অল্প সময়েই ঘটিয়ে তোলা যায়। তা হলে 'মানসিক শৃঙ্খলা জীবনের পক্ষে কল্যাণকর, আর সময়ের চিন্তা সময়ে করাই মানসিক শৃঙ্খলা রক্ষার উপায়' সচেতনবুদ্ধিলব্ধ এই ধারণাটাকে বার বার চেষ্টার দ্বারা নির্জ্ঞান বা অচেতনে ঢুকিয়ে দেওয়া যেতে পারে। সত্য যখন বাইরের ব্যাপার থাকে তখন তা দিয়ে বিশেষ ফায়দা হয় না, যখন ভেতরের তথা অচেতনের ব্যাপার হয়ে ওঠে, তখনই তা জীবনে সোনা ফলায়। নিজের জীবনে এর প্রমাণ পেয়েছি। আমি যখন কোন কঠিন রচনা লিখতে চাই তখন এই পথটি অনুসরণ করে চলি: প্রথমতঃ যতটা গভীরভাবে ভাবা আমার পক্ষে সম্ভব, ততটা গভীরভাবে আমি বিষয়টা সম্বন্ধে কিছুদিন ভাবি। পরে ও সম্বন্ধে ভাবনা ছেড়ে দিয়ে ব্যাপারটাকে গভীরে তলিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিই। তিন-চার মাস পরে যখন কাজটায় পুনরায় হাত দিই, তখন দেখতে পাই রচনাটা একরকম হয়েই আছে, কেবল লিখে গেলেই হলো। মাঝখানের সময়টাতে আমি অন্য চিন্তা বা অন্য কাজ করি। এই পদ্ধতিটি আবিষ্কার করার পূর্বে এ-সময়টুকু আমাকে বেশ উদ্বেগে কাটাতে হতো। তাতে লাভ হোত না কিছুই। যে-কাজটা ধরা হয়েছিল, সেটা তো হতই না অন্যটাও হতো না। অন্তর্বর্তী সময়টুকু এখন আমি নিশ্চিন্তে অন্য কাজে লাগাতে পারি। মানসিক শৃঙ্খলার ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। অনুরূপ পদ্ধতি খাটিয়ে অন্যান্য উদ্বেগের হাত থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়। যখন কোন দুর্ভাগ্যের সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন তার শোচনীয়তা কতটা নিদারুণ হতে পারে, তা একবার

ভাল করে দেখে নিন। তার পরে নিজেকে এরূপ বোঝান যে, বিপদটি যদি সত্য-সত্যই আসে তো তাতে তেমন কোনো ক্ষতির কারণ নেই। অনুরূপ বিপদ পূর্বেও অনেকবার এসেছে, কিন্তু তাতে বিশেষ ক্ষতি হয়নি।—এভাবে বোঝাতে বোঝাতে আপনার অচেতনে গিয়ে কথাটির প্রভাব পৌঁছবে। তখন বিপদ দেখে আপনি ততটা ঘাবড়াবেন না। আপনি বা আপনার বন্ধুবান্ধব তো কতো বিপদেই পড়েছেন; কিন্তু প্রথম অবস্থায় বিপদটা যত সর্বনাশকর মনে হয়েছিল; শেষ পর্যন্ত তো তা তত সর্বনাশকর মনে হয়নি। অতএব আপনার নিজের অথবা আপনার বন্ধুবান্ধবদের জীবন থেকে নজির নিয়েই আপনি নিজেকে বোঝাতে পারেন: 'মেঘ দু'দণ্ডের, সূর্য চিরদিনের। 'শীত যদি এলোই, তো বসন্তের আর দেরী নেই। 'মাঘ মরিবে ফাগুন হয়ে খেয়ে ফুলের মার গো।' তার মানে এই যে, দুঃখের দিকে তাকাবেন না, তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন? না, তা নয়। দুঃখের দিকে নিশ্চয়ই তাকাবেন, ভালো করেই তাকাবেন। নইলে অপরিচয়ের ভয় থেকে যাবে যে। তাকাতে তাকাতে যখন দুঃখের স্বরূপটা আর অজানা থাকবে না, তখনই ভয়ের হাত থেকে আপনি রক্ষা পাবেন। তার আগে নয়।

উদ্বেগ এক প্রকারের ভয়, আর ভয় থেকে জন্মে অবসাদ। ভয় দূর করার কায়দাটি জানা থাকলে অবসাদের হাত থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়। প্রত্যেক মানুষের মনেই ভয় লুকিয়ে আছে, সুবিধা পেলেই দাবী জানায়। অবশ্য ভয়ের কারণটি যে সব মানুষের বেলায় এক, তা নয়। বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন কারণে ভয় পায়। কেউবা ক্যান্সারকে ভয় করে, কেউবা করে দারিদ্র্যকে; কারো কাছে ভয়ের কারণ গোপন রহস্য উদ্‌ঘাটনের সম্ভাবনা, কারো কাছে বা মৃত্যুর পরে নরকে যাওয়ার চিন্তা। এদের প্রত্যেকে কিন্তু ভুল পথই অনুসরণ করে ভয় থেকে নিষ্কৃতি পেতে চায়। ভয়টি যখনই মনে উঁকি মারে, তখনই তারা তা থেকে পালিয়ে যাওয়ার

চেষ্টা করে—হয় অন্য চিন্তায় রত হয়ে, নয় ফুর্তি-ফার্তি করে নিজেদের ভোলাবার চেষ্টা পায়। তা কিন্তু ভুল। ভয় থেকে পালিয়ে যেতে চাইলেই ভয়ের ভয়ংকরতা বেড়ে যায়। সামনা-সানি হয়েই তাকে পর্যবেক্ষণ করা দরকার। তার সম্বন্ধে ভাবতে হবে, কল্পনা করতে হবে—তার স্বরূপটি নির্ধারণ করতে হলে যা যা করা দরকার, তা তা করতে হবে। তা হলেই ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে তার ধারটুকু ভোতা হয়ে যাবে। তখন তার সম্বন্ধে ভাবতে আর ভালো লাগবে না, বিরক্তি বোধ হবে। মন আপনা-আপনি তার থেকে মুখ ফিরাবে, পূর্বে জোর করে যা করা হত, এখন সহজে, একরকম বিনা চেষ্টায়ই তা হবে। কোন বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করতে হলে চূড়ান্তভাবেই করা দরকার; নইলে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না।

'ভয়কে যারা মানে, তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়।'—ভয়কে মানে কারা? তারাই, যারা ভয় সম্বন্ধে ভাবে না, তার স্বরূপটি তলিয়ে দেখতে চায় না। ভয়ের স্বরূপটি উপলব্ধি করতে পারলেই ভয় দূর হয়ে যায়। ছেলেবেলায় দূর থেকে অস্পষ্ট আলোয় যখন দেখেছি, তখন অনেক কিছুই ভূতের মতো মনে হয়েছে। কাছে গিয়ে দেখলেই মনে হয়েছে তা ভূত নয়, পঞ্চভূতের সমষ্টি বস্তু বা প্রাণী মাত্র। কাছে গিয়ে দেখলে যেমন ভূতের ভয় থাকে না তেমনি ভয়ের ভূতও দূরে চলে যায়।

ভয়ের ব্যাপারে প্রচলিত নীতি ত্রুটিমুক্ত নয়। ভয়কে তা জাগিয়ে রাখতেই চায়, দূর করতে চায় না। অথচ ভীতি জিনিসটা দুর্নীতির চূড়ান্ত। আপনি বলবেন: কেন, শারীরিক সাহস তো যথেষ্ট প্রশংসাই পেয়ে থাকে; নইলে যুদ্ধের সময় হাজার হাজার লোক শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে যুদ্ধ করতে চাইবে কেন? 'শির দেগা নাহি দেগা আমামা', এতো সাহসেরই বাণী, আর প্রচলিত নীতি যে এ বাণীর সমর্থক, এ কালের যুদ্ধের হিড়িক থেকেই তা সহজেই

প্রমাণিত হয়। নইলে 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' করে লোকেরা যুদ্ধের নামে পাগল হয়ে উঠতো না এবং 'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তারি লাগি কাড়াকাড়ি' পড়ে যেতো না।—আপনি ঠিকই বলেছেন, শারীরিক সাহসের মূল্য সমাজ সত্য সত্যই দেয়। কিন্তু নৈতিক সাহসের মূল্য? না তা একেবারেই দেওয়া হয় না। তাকে সমাজ ভয় করে। আপনি যে আপনার মনোভাবটি খুলে বলতে সাহস করেন না—বলতে গেলে চারিদিকে তাকান, কেউবা শুনতে পেলো ভেবে চমকে ওঠেন—তার হেতুও এখানে। সমাজ চোখ রাঙায়, আর আপনি সমাজের চোখ রাঙানিকে ভয় করেন।

(নারীর বেলা কথাটি আরও সত্য। সাহসিনী নারীকে আমরা শুধু পুঁথিতেই ভালোবাসি, বাস্তবে নৈব নৈব চ। নারী হবে স্বল্পভাষিনী, মৃদুহাসিনী, ধীরগামিনী; চোখের জলের মুক্তা ঝরবে তার নয়নে, সাত চড়ে রা'টি করবে না, কেবলই নীরবে যন্ত্রণা সইবে—নারী সম্বন্ধে এমনি আমাদের ধারণা।)

নৈতিক সাহসকে যে সমাজ পছন্দ করে না তার প্রমাণ জনমত-ভীতি। জনমতের প্রতি যে উদাসীন হতে চেয়েছে, সে-ই তার ফলভোগ করেছে। কিন্তু হওয়া উচিত তার বিপরীত। নৈতিক সাহসের মূল্য না দিলে আত্মা দীন থেকে যায়। দেখা গেছে সামাজিক চাহিদার ফলে শারীরিক সাহসের মাত্রা অনেক বেড়ে যায়। প্রশংসা পায় বলেই সৈন্যরা সাহসের পরিচয় দিতে ভালো-বাসে। তেমনিভাবে সামাজিক চাহিদা বাড়িয়ে দিয়ে নৈতিক সাহসের মাত্রাও বাড়ানো সম্ভব। তাতে লাভ হবে এই যে, সাহসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অবসাদের মাত্রাও কমতে থাকবে। কেননা অবসাদের গোড়ায় ভয়—পাছে না জানি কি হয়, এই চিন্তা।

অবসাদের আরেকটি কারণ উত্তেজনা-প্রীতি। উত্তেজনার জন্য যে শারীরিক শ্রম দরকার হয়, তা-ই অবসাদ ডেকে আনে। লোকটি যদি ভাল করে ঘুমুতে পারতো তো অবসন্ন হওয়ার কোন কারণ থাকতো না। 'রাত্রের তৃপ্তির শেষে প্রভাতের স্নিগ্ধ জাগরণে'

তার সমস্ত অবসাদ দূর হয়ে যেতো। কিন্তু তা হবার যো নেই। দিনের হাড়ভাঙা খাটুনির শেষে সে একটু ফুরসৎ পায়। সুতরাং সে সময়ে উত্তেজনার হাতে নিজেকে ছেড়ে না দিয়ে থাকা যায় কি করে? কিন্তু মুশকিল এই যে, শ্রমের মতো উত্তেজক স্ফূর্তিও ক্ষয়কর। তাতে স্নায়ুর অবসাদই বাড়ে, তৃপ্তি হয় না। কামনার গোড়ায় রয়েছে অতৃপ্ত বাসনা। কোন সহজ প্রবৃত্তির ব্যর্থতার ফলে মন বিগড়ে যাওয়ার দরুনই মানুষ উত্তেজনার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। সেকালে অল্প বয়সে বিয়ে হতো বলে এমনটি হতো না। এ-কালে অর্থাভাবের দরুন বিয়ের বয়সকে অনেক পিছিয়ে দিতে হচ্ছে। যথেষ্ট টাকা-পয়সা না হলে বিয়ে করতে নেই—এটা যেন হালের নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর্থিক সঙ্গতি লাভ করতে অনেক সময় লাগে। এই সময়ের মধ্যে উত্তেজনা-প্রীতি এমন বদ্ধমূল হয়ে পড়ে যে, বিয়ের পরেও তা আর ছাড়া যায় না। জিহ্বার সহজ স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা কমে গেলে যেমন লংকামরিচের ডাঙশ মারার দরকার হয়ে পড়ে, সহজ উপভোগের ক্ষমতা কমে গেলেও তেমনি উত্তেজনার ডাঙশের প্রয়োজন হয়। বিয়ের ব্যাপারটাকে সহজ করে দিতে না পারলে এ অবস্থা থেকে মুক্তি নেই। কিন্তু ওকথা বলা অন্যায়। প্রচলিত নীতি তা সহ্য করবে না। একথা বলার জন্যই তো জর্জ লিণ্ডসের মতো মহাপ্রাণ ব্যক্তিকে নিন্দা সহ্য করতে হয়েছিল। অথচ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। প্রবীণদের গোঁড়ামির দরুন তরুণরা যে অকারণ দুঃখভোগ করে, তা থেকে তাদের রক্ষা করাই ছিল তাঁর নিয়ত। অতিরিক্ত সংযম অথবা গোপনতার পাপ উভয়ই জীবনকে জীর্ণ ও ক্লিন্ন করে তোলে। লিণ্ডসে চেয়েছিলেন সখ্য-বিবাহের প্রবর্তন করে এই উভয় পাপ থেকে তরুণদের রক্ষা করতে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য সার্থক হয়নি। গোঁড়া মোড়ল সম্প্রদায় তাঁর কথায় সায় দেয়নি। বরং উল্টো তাঁর নিষ্কলংক চরিত্রে নিন্দার

কালি ছিটিয়ে দিয়েছিল। প্রায় দেখা যায় সমাজের সত্যকার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীরাই সমাজের শত্রু হয়ে দেখা দেয়, আর স্বার্থপর লোকেরাই বন্ধু বলে বিবেচিত হয়। সমাজের মিত্র কারা? যারা সমাজের তোষামোদ করে চলে তারা, না যারা সমাজকে আঘাত করে তারা? তোষামোদকারীরা তো স্বার্থের পূজারী। তারা জানে, সমাজের মন রেখে চললেই তাদের পোয়াবারো—সমাজ যে আদর্শটি চোখের সামনে তুলে ধরেছে তাকে সেলাম ঠুকলেই তাদের লাভ। তাই কাজের বেলা যাই করুক না কেন, সেলামের বেলা তারা ঠিক থাকে। তারা বুদ্ধিমান। নিজের স্বার্থসিদ্ধির দিকেই তাদের নজর। সমাজকে আঘাত করে বোকারা—যারা নিজের স্বার্থের চেয়ে সমাজের স্বার্থকে বড় করে দেখে তারা। তাই তাদের জীবনে জোটে নিন্দা আর দুঃখ। লিণ্ডসেও এমনি বোকামির পরিচয় দিয়েছিলেন।

সমাজনীতির তথা বিবাহনীতির পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত উত্তেজক স্ফূর্তির প্রয়োজন থাকবেই। তথাপি, যাকে স্নিগ্ধসুখ বলা হয়, উত্তেজক স্ফূর্তি তা নয়, এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার মাত্রা কমিয়ে দেওয়াও সম্ভব হবে। এ ব্যাপারে সহায়তা করতে পারে আরেকটি চিন্তা। এককালে তো বিয়ে করতে হবেই, কিন্তু জীর্ণ অবসন্ন স্নায়ু নিয়ে বিয়ে করে কী লাভ—এ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তেজনার আসক্তি ধীরে ধীরে কমে আসতে বাধ্য।

স্নায়বিক অবসন্নতার সবচেয়ে বড় ত্রুটি এই যে, তা বাইরের জগৎ ও রোগীটির মাঝখানে একটি পর্দা টানিয়ে দেয়। তখন জগৎ তার উপর যে ছাপ রেখে যায় তা অপূর্ণ, অস্পষ্ট—ঝাপসা-ঝাপসা। মানুষকে দেখে সে আনন্দ পায় না, বরং তার ধরন-ধারণ তাকে বিরক্ত করেই তোলে। খাওয়া তাকে তৃপ্তি দেয় না, সূর্যের আলো অভিনন্দন জানায় না, বিশ্ব-প্রকৃতি থেকে যায় মৃত স্পন্দনহীন। কতিপয় কাজে একান্তভাবে মনোনিবেশ করার দরুন বৃহৎ

বিশ্ব যায় চোখের সামনে থেকে সরে ; প্রাণের জগতে পড়ে তাই ঘাটতি। অবসর? না, অবসর তার জীবনে নেই। খেটে খেটে সে হয়রান হয়ে মরবে, তবু অবসর নেবে না। মাটির সহজ ছন্দের সঙ্গে সম্পর্কহীন হওয়ার দরুনই এরূপটি ঘটে। আধুনিক শহুরে জীবনে ইঁটকাঠের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকার ফলেই মানুষ জীবনের সহজ রস থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। 'ইঁটের পরে ইঁট, মাঝে মানুষ কীট, নাইকো ভালোবাসা নাইকো খেলা।' 'মাটির স্পর্শ-বঞ্চিত' শহুরে মানুষের জীবনে আর সহজ লীলা নেই। তাই দরকার হয় উত্তেজনার, আর উত্তেজনা নিয়ে আসে অবসাদ-ক্লান্তি। *

* কোন ইংরেজ লেখকের অনুসরণে।

পাপসচেতনতা

পাপসচেতনতা সম্বন্ধে প্রচলিত নীতির যে ধারণা, আধুনিক মনস্তত্ত্বের ধোপে তা টেকে না। প্রটেস্‌টান্টরা মনে করে অন্যায় কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বেই বিবেক জানিয়ে দেয় কাজটা মন্দ এবং তা করার দরুন মানুষ অনুতাপের দুঃখ ভোগ করে; কিন্তু এই দুঃখভোগ একেবারে বেফায়দা নয়, তাতে করে মানুষ পাপমুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়। প্রটেস্‌টান্ট দেশসমূহে বিশ্বাসহারা লোকেরাও অনেকদিন এই মতটি সমর্থন করে আসছিল। কিন্তু হালে এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়েছে। শুধু যে উদারনৈতিকরাই তা বিশ্বাস করে না, তা নয়, গোঁড়ারাও আর সে পথের পথিক হতে চায় না। পাপমন্যতাকে সকলেই ভয় করে। বিবেক আজকাল আর ঐশীবাণী নয়। দেখতেই তো পাওয়া যায় বিবেক সব দেশে এক কথা বলে না, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কথা বলে এবং মোটের উপর দেশীয় আচারের অনুমোদনই তার কাজ হয়ে দাঁড়ায়। তা হলে বিবেকের কামড়ানির মানেটা কী?

বিবেক আসলে বিভিন্ন অনুভূতির সংহত রূপ, যার মধ্যে সরলতমটি হচ্ছে 'পাছে ধরা পড়ি' বা 'পাছে লোকে কিছু বলে' এই ভয়। 'করিতে পারি না কাজ সদা ভয় সদা লাজ, সংশয়ে হৃদয় সদা টলে, পাছে লোকে কিছু বলে।' ধরা পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিলেই অপরাধীরা অনুতাপের জ্বালা বোধ করে, নইলে এক রকম নিরুদ্বেগেই কাল কাটায়। অপহরণজীবীদের বেলা অবিশ্যি কথাটা

সত্য নয়, কারাবাসের সম্ভাবনা মেনে নিয়েই তারা তাদের ব্যবসায়ে অগ্রসর হয়। কিন্তু যে ব্যাংক-ম্যানেজারটি হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় তহবিল তসরূপ করে বসেছে, অথবা যে পাদ্রী সাহেবটি দুর্বল মুহূর্তে নারীর ফাঁদে পা দিয়ে বসেছে, তার বেলা সত্য।

'পাছে ধরা পড়ে শাস্তি পাই' এই বোধের কাছাকাছি রয়েছে দলচ্যুত হওয়ার ভয়। যে ভদ্রলোকটি তাস খেলায় চুরি করে অথবা ঋণ-পরিশোধে শৈথিল্য দেখায়, ধরা পড়লে সে দলের কাছে মাথা নত করে থাকে এবং অন্যায়-বোধে তার অন্তর কালো হয়ে যায়। এদিকে বিপ্লবী বা সংস্কারকদের সঙ্গে তার সাদৃশ্য নেই। তারা ভয়ে মুষড়ে পড়ে না, ভবিষ্যতের পানে তাকিয়ে সমস্ত দুঃখ-অপমান সহ্য করে যায়। দলের বিরোধ সত্ত্বেও যে তারা নিজেদের পাপী মনে করে না, তার কারণ দলের নীতির বিরুদ্ধেই তাদের লড়াই। যা মানতে পারে না তার বিরুদ্ধে গিয়ে সহজেই তারা দুঃখ ভোগ করে। আত্মার মহিমা উপলব্ধি করা যায় বলে এ দুঃখভোগে একটি আনন্দ আছে। নীতির ব্যত্যয় তাদেরই পীড়ার কারণ হয় যারা নীতিকে মেনে নেয়। দলচ্যুতি ও অন্যান্য শাস্তির কথা ভেবে তাদেরই বুক দুরুদুরু করে। যেখানেই শাস্তির সম্ভাবনা, সেখানেই পাপবোধ। ইউরোপীয় সমাজে সমর্থিত বলে প্রাগবিবাহ অনুরাগ সেখানে পাপ-বোধের জন্ম দেয় না, আমাদের দেশে দেয়, কেননা আমাদের দেশে ও জিনিসটার চল্ নেই। পাড়াপড়শীরা শুনলে কী বলবে এই ভয়ে আমরা সংকুচিত।

পাপচেতনা যে কেবল মনের উপরের স্তরে থাকে, তা নয়, গভীরেও শিকড় চালায়। তখন তা আর ধরা পড়ার বা দলচ্যুতির ভয়ে জন্মে না, জন্মে এক রকম বিনা কারণেই। দেখতে পাওয়া যায় এমন অনেক কাজকে লোকে পাপ মনে করে, যাদের পাপ মনে করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। তাই অকারণের পাপবোধে জীবন ছেয়ে যায়। শেষে মানুষ ভাবতে বাধ্য হয়: পাপ মন্দ, কিন্তু সংসারে

বাস করতে হলে পাপহীন জীবন অসম্ভব। তাই সে সারা জীবন পাপমগ্নতায় ভোগে, আর এই বোধ বিষিয়ে দেয় তার মন, কর্মশক্তি, সবকিছু। অথচ খামখা এ দুর্ভোগ, একটা অন্ধ বিশ্বাসের ফলেই তার সৃষ্টি। এর গোড়ায় কিন্তু ধরা পড়ার কি দলচ্যুত হওয়ার ভয় নেই, আছে নিজেরই মনের অকারণ সন্দেহ। কথায় যে বলে 'বনের বাঘে খায় না মনের বাঘে খায়' এখানে তাই ঘটে। 'পাপ করছি' এই বিশ্বাসের দরুন মানুষ অনুতাপের আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরে এবং অনুতাপের এই ভাবপ্রবণ মুহূর্তকেই শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত বলে গণ্য করে। কিন্তু তা ভুল। অনুতাপের দুর্বল মুহূর্ত নয়, আত্মবিশ্বাসের সবল মুহূর্তই জীবনের শ্রেষ্ঠ ক্ষণ।

অতি শৈশবে মা অথবা দাইয়ের কাছ থেকে শেখা অযৌক্তিক নীতিই পাপবোধের গোড়ায়। তাদের স্নেহ পাওয়াটাই বালা জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ, আর তা পাওয়া যায় মা-বাবার কথাগুলি নির্বিচারে মেনে চললেই। তাই তাদের শেখান নীতিকে সমীহ ক'রে চলা শিশুদের স্বভাব হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে চলতে চলতে মনে যে সংস্কার জন্মে যায় তা-ই পাপবোধের ভিত্তি।

শৈশব-নীতি সবচেয়ে ক্ষতিকর হয়ে দেখা দেয় যৌন ব্যাপারে। রুক্ষ-প্রকৃতির মা-বাবার হাতে মানুষ হলে সেক্সের ভয়ংকরতা ছেলেমেয়েদের মনে এমন বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, পরে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তা থেকে আর মুক্তি পাওয়া যায় না। সেক্সের নাম শুনলেই মন কুঁকড়ে যায়, যেন অশ্লীল কিছুর স্পর্শ পাচ্ছে এমনভাবে। এ ব্যাপারকে আরো জোরদার করে মায়ের পবিত্র স্মৃতি। শৈশবে যে মেয়েটিকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসা হত তার সঙ্গে তো যৌন-সম্বন্ধ ছিল না, অতএব যৌন-সম্বন্ধ মন্দ, আর যে মেয়েটির সঙ্গে যৌন-সম্বন্ধ স্থাপিত হল সেও মন্দ। অনেকে যে নিজের পত্নীকে শ্রদ্ধার নজরে দেখতে পারে না, তার হেতুও এখানে। কামনাহীন পত্নীদেরই তারা শ্রদ্ধা করে, কামনাবতীদের নয়। কিন্তু মুশকিল এই যে,

যাদের শ্রদ্ধা করা যায়, তাদের কাছ থেকে সোহাগ পাওয়া যায় না। তাই তার জন্য যেতে হয় অন্য রমণীর কাছে। কিন্তু সেখানে যে সুখ পাওয়া যায়, তাও ক্ষণস্থায়ী। পাপবোধের ফলে অচিরেই তা উবে যায় এবং সুখের পালা শেষ হয়ে গিয়ে দুঃখের পালা শুরু হয়। দেহের সুখে মেয়েদের প্রায়ই সায় থাকে না। স্বামীর কাছে যে তারা যায়, তাও কর্তব্যের তাগিদে, সুখের তাগিদে নয়। ফলে স্বামীটিও সুখ পায় না, সে নিজেও না। স্বামীটিকে হয়তো বেচারী সুখী করতে চায়, কিন্তু সুখী করার কায়দাটি জানা নেই বলে সে তাকে খুশী করতে পারে না। সে খুশী হলেই যে স্বামীটি খুশী হয়, তার অধরে তৃপ্তির হাসিটিই যে স্বামীর সব চেয়ে বেশী উপভোগ্য, তা সে বুঝতে পারে না, আর সে বুঝতে পারে না বলে বিমর্ষতায় জীবন ছেয়ে যায়। অবশ্য হালে মেয়েরা অনেকখানি সংস্কারমুক্ত হয়েছে। পূর্বের মতো তারা আর সেক্সের নামে আঁতকে ওঠে না। জীবনে এর স্বাভাবিক স্থান মেনে নিয়েছে বলে সহজেই তারা খুশী হতে পারছে। কিন্তু পুরুষরা এখনো এতটা সংস্কারমুক্ত হতে পারেনি। সেক্সের ব্যাপারে পাপবোধ এখনো তাদের মন বিষিয়ে দেয়। কিন্তু এরও আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। অচিরেই পুরুষদের বাঁধন খসবে।

পুরোনো যৌন-নীতি সম্বন্ধে মানুষ ধীরে ধীরে সচেতন হচ্ছে, তাই যুক্তিবাদী নব-নীতির প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সেটা কী হবে তা বাতলানো আমার উদ্দেশ্য নয় আমার উদ্দেশ্য সে নীতির মূল লক্ষ্যটা কী হবে তার ইঙ্গিত দেয়া। যুক্তিবাদী নীতির লক্ষ্য হবে অযৌক্তিক নীতির বিপরীত। অযৌক্তিক নীতি সুখকে করতে চেয়েছে পর, যুক্তিবাদী নীতি করতে চাইবে আপন। যা সুখকর তা-ই গ্রহণ-যোগ্য এ-ই হবে এর অভিমত। প্রচলিত নীতির পশ্চাতে যে বৈরাগ্যের প্রেরণা রয়েছে, সেখানে তা থাকবে না। নিজে খুশী হও, অপরকে খুশী হতে দাও, এই হবে নব-নীতির মর্মবাণী।

দেখতে হবে শুধু সুখের উপাদানটা নিজের কি অপরের কোন ক্ষতি করে কি-না। বর্তমান নীতির মারফতে মানুষের দুঃখের মাত্রা বেড়েছে, নবনীতির মারফতে বাড়বে সুখের মাত্রা।

[এ পর্যন্ত মানুষ দুঃখী কৃচ্ছ্রসাধককেই শ্রদ্ধা জানিয়েছে, এখন থেকে জানাবে সুখী মানুষকে। যে যত বেশী সুখের আয়োজন করবে, শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞানে নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির পরিচয় দেবে, সে তত বেশী শ্রদ্ধা লাভ করবে। মনে রাখা দরকার, সুখ জিনিসটাও সৃষ্টির ব্যাপার, বাইরে থেকে হাত পেতে নেয়ার ব্যাপার নয়। তাই সুখী মানুষের অর্থ হবে সৃষ্টিধর্মী ক্রমবর্ধনশীল মানুষ, আলস্য-প্রিয়, ইতর ভোগলিপসু মানুষ নয়। সুখের প্রতিষ্ঠা হলেই মানুষ ছোটলোকোমির হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে, নইলে তার মুক্তি নেই। নীচতা-হীনতাকে ঘৃণা না করলে যে আলো-হাওয়ার অভিনন্দন পাওয়া যায় না, প্রকৃত সুখ ছাড়া তা আর কেউ আমাদের শেখাতে পারে না। একথা জানার ফলে মানুষ সুখের তাগিদেই সৎ ও সুন্দর হয়, নীতির তাগিদে নয়। নীতির তাগিদে যে চরিত্রের সৃষ্টি হয়, তা নীরস ও নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে, তাতে সৃজনীবুদ্ধির জাগরণ হয় না, ধ্বংস হয়। ছোটলোকোমিমুক্ত হওয়াটাই একটা মস্ত সুখ, যেদিন আমরা এ কথাটা ভালো করে বুঝতে পারি, সে দিন আমাদের পরম দিন। সে দিন আকাশে আলোর বাঁশি বেজে ওঠে, অশ্রুতপূর্ব সংগীতে প্রাণমন পুলকিত হয়ে উঠে।]

অনেক সময়ে চেতনলোকে মানুষটি যুক্তিবাদী হলেও অচেতনে অযৌক্তিকই থেকে যায়। বিপদের সময়ে চেতন-মনের আদেশের পরিবর্তে অচেতন-মনের ইংগিতই কার্যকরী হয়ে ওঠে। বাহ্যতঃ স্বীকার না করলেও ভেতরে-ভেতরে পাপবোধের জ্বালা অন্তরকে খেয়ে ফেলতে থাকে। এ দায় থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে সচেতন মনের আহৃত কথাটি দুরমুশ করে অচেতনে ঢুকিয়ে দেওয়া। বার বার শুনতে শুনতে সচেতন মনের কথাগুলিই

অচেতন মনের কথা হয়ে যায়। অচেতন মনের নিজের কোন কথা নেই, পূর্বে শুনা কথাগুলিই তার নিজের কথা হয়ে ওঠে।' যা তর্কের সময় বিশ্বাস করা হয় অন্য সময় তা মনে রাখতে হবে এবং তা যে শুধু তর্কের খাতিরে সমর্থনীয় নয়, সত্যি সত্যি শ্রদ্ধেয় ব্যাপার, তা বিশ্বাস করতে হবে। নইলে চেতনের আহৃত বিশ্বাসটি অচেতনের সহজ সামগ্রী হয়ে উঠবে না। সুখের তাগিদে একবার এটা আবার ওটা বিশ্বাস করলে মন খামখেয়ালির বশীভূত হয়ে পড়ে, কোন ভাবই ধাতস্থ হওয়ার সুযোগ পায় না।

অবসাদ, পীড়া, সুরাপান ইত্যাদির ফলে যখন চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তখনই পাপবোধের জয়জয়কার। বাদলা দিনের সরীসৃপের মতো অচেতন মনের গুহা থেকে বেরিয়ে এসে তখন তা মানুষকে দংশন করতে থাকে। এরকম দুর্বল মুহূর্তে (সুরাপানজনিত দুর্বল মুহূর্তের কথা অবশ্যি এখানে ধরা হচ্ছে না) মানুষের মনে যে ভাব জাগে, সাধারণতঃ তাকে একটা অপৌরুষের বাণীর মর্যাদা দেওয়া হয়। শয়তানটি দুর্বল হয়ে পড়েছে বলে মানুষটি এখন পবিত্রাত্মা সাধু হয়ে উঠছে, এ-ই সাধারণের বিশ্বাস হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু শক্তির মুহূর্তের চেয়ে দুর্বলতার মুহূর্তেই মানুষ অধিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দেয়, একথা স্বীকার করলে চিরকাল তার জন্য মানুষকে অসুস্থ থাকতে হয়। দুর্বল মুহূর্তে মানুষ শিশু হয়ে যায়, তাই তখন অযৌক্তিক শৈশবনীতি বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু যৌবনের যুক্তিবিচারলব্ধ নীতির চেয়ে শৈশবের অযৌক্তিক নীতিই বড়, একথা ভাবা ভুল। যৌবনের পূর্ণশক্তি যে নীতি সৃষ্টি করে, তা-ই স্বাস্থ্যপ্রদ। যখনই কোন কাজের জন্য অযৌক্তিক পীড়া বোধ করবেন, তখনই ভাববেন লুকিয়ে-থাকা শৈশবনীতিটা সুযোগ পেয়ে আবার দাবী জানাতে চাচ্ছে, তাকে আমল দেওয়া ঠিক হবে না। যুক্তিবিচারের আলো ফেলে তাকে স্তব্ধ করে দিন, নইলে তার অত্যাচারে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে।

কিন্তু অযৌক্তিক ধারণাগুলিকে এড়িয়ে গেলে চলবে না। তাদের দিকে ভালো করে তাকাতে হবে, তাদের অপদার্থতা সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে, তারা যে জীবন-বিকাশের অন্তরায়, সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে হবে তা হলেই শৈশবনীতির অত্যাচারে আপনার জীবন আর জীর্ণ হয়ে যাবে না, আপনি বুদ্ধি ও অনুভূতি সরসতা বজায় রাখতে পারবেন। ভাবের হাতে নিজকে ছাড়বেন না, যুক্তিবিচারের হাতে ছাড়বেন। ভাব বড় চঞ্চল, সে আপনাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে, একবার এদিকে, আবার ওদিকে নিয়ে যাবে। তখন আপনার অবস্থাটা হবে বাত্যাতাড়িত কর্ণধারহীন তরীর মতো অসহায়। কিন্তু যুক্তিবিচার তা করবে না, সে আপনার সার্থকতার পথটি দেখিয়ে দেবে। সে পথ আলোছায়াময় অস্পষ্ট পথ নয়, সূর্যকরোজ্জ্বল সুস্পষ্ট পথ। যুক্তি-বিচারের হাতে 'আধেক ধরা পড়েছি গো আধেক আছে বাকি' অবস্থায় থাকলে চলবে না, সম্পূর্ণ ধরা দিতে হবে। নইলে মুক্তি নেই। এ ব্যাপারে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় ছেলেবেলাকার শ্রদ্ধা। ছেলেবেলায় যাদের শ্রদ্ধা করা হয়েছে সেই মা-বাবা বা গুরুজনেরা তো যুক্তিবাদী ছিলেন না। তাদের বেলা তা হলে কী করা যায়? তাদের কি তবে অশ্রদ্ধা করতে হবে? হ্যাঁ, তা-ই করতে হবে। তাদের শ্রদ্ধা করা আর অসত্যকে শ্রদ্ধা করা, ভাবপ্রবণতাকে শ্রদ্ধা করা এক কথা। আপনি তখন দুর্বল ছিলেন বলেই তাদের শক্তিমান ও জ্ঞানীগুণী মনে করতেন, এখন যখন আপনার শক্তি ও জ্ঞান বাড়ছে, তখন তাদের আর শক্তিমান ও জ্ঞানীগুণী ভাবা ঠিক হবে না। হ্যাঁ, আপনি তাদের শ্রদ্ধাও করতে পারেন, কিন্তু সে মা-বাবা হিসেবেই, জ্ঞানীগুণী হিসেবে নয়। চুল পাকলেই জ্ঞান বাড়ে, এ বিশ্বাস যত শীঘ্র দূর হয় ততই ভালো। তাই বলে যে আপনি তাদের ভাত-কাপড় দেবেন না, মন্দ বলবেন তা নয়। ভাত-কাপড় আর সুন্দর ব্যবহার দিয়ে তাদের খুশী রাখাই আপনার কর্তব্য হবে, তাদের শেখান নীতি মেনে

চলা নয়। কিন্তু আমরা ভুল করি ; তাদের নীতিবাক্য আমরা মাথায় তুলে নেই, তাদের যত্ন নেওয়ার চেষ্টা করিনে। তাই আমাদের প্রাণদৈন্যের অন্ত থাকে না। যে জাতি যত বেশী পিতৃ নীতির ভক্ত, সে জাতি তত বেশী অনগ্রসর—পেছনফেরা দৃষ্টি তাদের সামনে এগিয়ে যেতে দেয় না। অচলায়তনের বাসিন্দা বলে সে জাতি আলোহাওয়ার স্পর্শ থেকে বঞ্চিত।

প্রচলিত নীতি ক্ষতি করেছে কি কল্যাণ করেছে, সেটা তলিয়ে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে, তার ফলে কুসংস্কারেই অন্তর পূর্ণ হয়েছে, সুন্দর ও সুস্থ বিশ্বাসে নয়। সত্যিকার অন্যায়কে সে বাধা দিতে পারেনি, দিয়েছে কাল্পনিক অন্যায়কেই। ব্যবসায়ে অসততা, ঘুষ খাওয়া (আমরা সকলেই উপরি পাওনার প্রত্যাশী ; পুত্রটি একশো টাকা মাইনের উপরে আরো একশো টাকা পায়—এ কথা ভেবে ধার্মিকপ্রবরও খুশীতে বাগবাগ হন, আর দোয়া করেন আল্লা যেন তাঁর ছেলের রুজি আরো বাড়িয়ে দেন), কালোবাজারি, সন্তান-সন্ততি আর পত্নীর প্রতি নিষ্ঠুরতা, অধীন কর্মচারীর প্রতি মন্দ ব্যবহার, সমব্যবসায়ীর প্রতি বিদ্বেষ, রাষ্ট্রিক দ্বন্দ্বে রূঢ়তার আশ্রয়, এসবই হচ্ছে ক্ষতিকর পাপ। এ সবের দরুনই পৃথিবী দুঃখপূর্ণ হয় এবং সভ্যতার ভিত্তি নড়ে ওঠে। কিন্তু প্রচলিত নীতি এ সবের বিরুদ্ধে লড়াই করতে শেখায় না, শেখায় অযৌক্তিক পাপের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে। অসুস্থ অবস্থায় যে পাপের ভয়ে মানুষ ভীত হয়, তার তালিকার মধ্যে এ সব পড়ে না, পড়ে অযৌক্তিক অন্যায়ের স্মৃতি। কোন্ দিন কোন্ মেয়েকে চুমু খেয়েছিলাম, এবং (মেয়ে হলে) কোন দিন পরপুরুষের সঙ্গে একটু হাল্কা সুরে কথা বলেছিলাম, এ সব ভেবে ভেবে মন কাহিল হয়ে পড়ে। অথচ এ সব সত্যি সত্যি ক্ষতিকর কিছু নয়, তাতে নিজের কি পরের কারো কোন অকল্যাণ হয় না, বরং মন খুশী হওয়ার ব্যাপার বলে লাভই হয়।

অথচ প্রচলিত নীতির অভিযান এ-সবের বিরুদ্ধেই, সত্যকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে নয়। [একটি লোককে জানি, তিনি ইংরেজী পড়েছিলেন বলে বৃদ্ধ বয়সে চোখের জল ফেলতেন, আরেকটি লোক গর্ববোধ করতেন জীবনে ফটো তোলেননি বলে। কিন্তু ঘুষ খাওয়া কি কালোবাজারির জন্য চোখের জল ফেলতে দেখা যায় খুব কম লোককেই। প্রচলিত নীতি মূল্যবোধহীন; কোন্ কাজ ন্যায়, কোন্ কাজ অন্যায়, কোন্ কাজ সুন্দর, কোন্ কাজ অসুন্দর তা সে ভালো করে বুঝতে পারে না। ছেলেবেলাকার নির্বোধ ও অযৌক্তিক নীতি শিক্ষার ফলেই মানুষের এ দুরবস্থা। অমুক্তবুদ্ধি মানুষের রচা, এই নীতির বিরুদ্ধে না গেলে মানসিক স্বাস্থ্য ফিরে পাওয়া কঠিন।]

কিন্তু পাপবোধ সহজে যাওয়ার জিনিস নয়। যুক্তির আলো ফেলে বারবার তার ভেতরের অযৌক্তিকতাকে প্রত্যক্ষ না করলে তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায় না। ইঁদুরের মতো সে গর্তে লুকিয়ে থাকে এবং অচেতন মুহূর্তে এসে আপনার ফসল খেয়ে যায়, আপনি টের পান না।

পাপচেতনাকে অনেকে সৎ-জীবনের সহায় মনে করে। কিন্তু তা ঠিক নয়। পাপচেতনার ফলে মানুষ অসুখী হয়ে পড়ে আর নিজেকে নীচ ভাবতে শেখে। অসুখী হওয়া আর নিজেকে নীচ ভাবা উভয়ই মন্দ; কেননা উভয়ই সৃজনশীলতার বিরুদ্ধে। নিজেকে মন্দ জানা মানে অপরকে বড় মনে করা। আর অপরকে বড় জানা আর তাকে বিদ্বেষ করা এক কথা। হীনমন্য মানুষটির পক্ষে বিদ্বেষই সহজ হয়, ভালোবাসা নয়। যাকে সে নিজের চেয়ে বড় মনে করে তার দিকে তাকাতে তার কলজে ছিঁড়ে যায়। পরশ্রীকাতরতার দরুন মানুষ তার এবং সে মানুষের চক্ষুশূল হতে থাকে। হীনমন্যতার এই ফল। অপরের উদার সহৃদয় মনোভাব কেবল অপরকেই নয়, নিজেকেও সুখী করে। ভালোবাসা পাওয়ার মত সুখের জিনিস আর

কী আছে, আর তা পাওয়া যায় মানুষকে ভালোবাসলেই। কিন্তু পাপসচেতন মানুষটি এই ভালোবাসার পরিচয় দিতে পারে না। নিজেকে সে হতভাগ্য মনে করে, আর এই হতভাগ্যতাবোধ তার প্রাণের স্ফূর্তি কমিয়ে দেয়। সে মনমরা অবস্থায় কাল কাটায়। দ্বন্দ্বহীন অটুট মনই স্ফূর্তির আধার। সেখানেই বয়ে চলে অনন্ত প্রাণের প্রবাহ। কিন্তু যেখানে এই অটুটভাব নেই, ওপরের স্তরে এক, নীচের স্তরে অন্য কথা, সেই দ্বিখণ্ডিত মনে প্রাণের প্রবাহ কম। পাপচেতনার ফলেই এমনটি হয়। তাই তা নিন্দনীয়।

শুধু অযৌক্তিক অন্যায়ের বেলাই নয়, যুক্তিসমর্থিত অন্যায়ের ক্ষেত্রেও পাপবোধের প্রভাব মন্দ। অন্যায় যা হয়ে গেছে, যাতে সেটা আর না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখলেই চলবে, তা নিয়ে হায়-আফসোস করে লাভ নেই। তাতে জীবন বিষিয়ে ওঠে, মনের স্ফূর্তি নষ্ট হয়, কর্ম ও বুদ্ধিশক্তি লোপ পেয়ে যায়। তাই পাপবোধ, তো পুরানো শৈশবনীতি লঙ্ঘনের দরুনই হোক, আর আধুনিক, যুক্তিসমর্থিত নীতির বিচ্যুতিতেই ঘটুক, ক্ষতিকর। তা সৃষ্টির অনুকূল নয়, প্রতিকূল। 'পাপ করেছি' বলে চোখের জল ফেললে দৃষ্টিশক্তি আচ্ছন্ন হয়; পরিচ্ছন্ন হয় না।

দ্বিধান্বিত মনে অটুট ভাব ফিরিয়ে আনতে হলে যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়, তা হচ্ছে যুক্তির আলোকে যে সিদ্ধান্তে এসে পৌঁচেছেন তাতে আস্থা স্থাপন করা, আর বিপরীতটা যে মিথ্যা, সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া। তা হলেই দো-মনা ভাবের পরিবর্তে একমনা ভাবের আবির্ভাব হবে এবং আপনি দ্বন্দ্বমুক্ত হয়ে শক্তির তথা সুখের স্বাদ পাবেন। দ্বিধাকুয়াশামুক্ত হয়ে জীবনসূর্য আপনাকে অভিনন্দন জানাবে। পুরাতন নীতির অত্যাচার থেকে মুক্ত পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে নবনীতির হাতে ধরা দেওয়া, আর নবনীতির উদ্দেশ্য যে সার্থকতার স্বাদ পাওয়ানো, সে সম্বন্ধে বোধ হয় আর না বলাই ভালো।

পাপচেতনার ক্ষতিকরতা সম্বন্ধে সাধু রামকৃষ্ণ সচেতন ছিলেন। তাঁর মতে, পাপবোধের টান উর্ধ্বমুখী নয়, নিম্নমুখী। তিনি মানুষকে পাপমন্যতা তথা হীনমন্যতার প্রশ্রয় দিতে নিষেধ করেছেন :

Certain Christians & Brahmans see in as ense of sin the sum total of religion. Their ideal of a devout man is one who prays ; 'O Lord, I am a sinner! Deign to pardon my sins !··· They forget that a sense of sin is a sign of the first and the lowest step of spiritual development. They do not take the force of habit into consideration. If you say : 'I am a sinner', eternally, you will remain a sinner to all eternity···you ought rather to repeat : 'I am not bound, I am not bound···who can bind me ? I am the son of God, the king of kings···' make your will work and you will be free···The miserable man, who repeats tirelessly : 'I am a sinner,' really becomes a sinner. *

অনেকে যুক্তিবিচারকে তেমন শ্রদ্ধার নজরে দেখতে চায় না। তাদের ধারণা, তা গভীরতর আবেগের শত্রু। কিন্তু তা সত্য নয়। যুক্তিবিচার সম্বন্ধে ভুল ধারণার ফলেই এই মনোভাবের সৃষ্টি। যুক্তি-বিচারের কাজ আবেগের গলায় দড়ি পরানো নয়, অশুভ আবেগের গতিরোধ করা। সে আবেগের শত্রু নয়, বন্ধু। মানুষের ভেতরে অমৃত ও বিষ উভয় আছে। যুক্তিবিচারের কাজ কোন্‌টা শুভ, কোন্‌টা অশুভ, তা দেখিয়ে দেওয়া।

[স্নেহ ও প্রেম, বন্ধুতা ও মহত্ত্ব, বিজ্ঞান ও শিল্পানুরাগ এ সবের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা তার উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য অশিব ও ও অসুন্দরকে ঘৃণা করতে শেখানো। নিষ্ঠুরতা তার দু' চোখের

* The life of Ramakrishna—Romain Rolland.

বিষ। ধর্মের নাম, জাতির নাম, সমাজের নাম—যে নাম নিয়েই আসুক না কেন, সে তাকে সহ্য করতে অপ্রস্তুত। সে চায় মানুষের সুন্দর ও সার্থক প্রকাশ। তাই মানুষের ভেতরে যা কিছু শ্রেষ্ঠ তারি সে সমর্থক, নিকৃষ্টকে সে একদম সইতে পারে না। যুক্তিবিচার আর আবেগে দা কুমড়ো ভাব নেই। সুন্দর আবেগকে সে হত্যা করতে চায় না রক্ষা করতেই চায়। আবেগের হাতে মানুষকে তুলে দেওয়াই তার উদ্দেশ্য। কিন্তু কোন্ আবেগের হাতে? ধ্বংসকর না সৃষ্টিকর আবেগের হাতে, তা-ই সে ভেবে দেখতে চায়। আবেগের পুকুরে আপনি স্নান করতে চান, ভালো। কিন্তু দেখতেই তো পাচ্ছেন পুকুরটা দামঢাকা। দাম সরিয়ে না নিলে ওখানে স্নান করে আরাম নেই। সে কাজটা করবে কে? সে তো যুক্তিবিচারের কাজ। পূর্ণ ও অবিমিশ্র তৃপ্তির জন্য তাই যুক্তিবিচারের এত প্রয়োজন।]

প্রচলিত নীতি অতিরিক্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং পাপবোধ ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতারই ফল। নিজের সম্বন্ধে বেশী ভাবা হলে সেই ভাবনাটা মানুষকে কারাগারের মতো রুদ্ধ করে রাখে। তখন সে আর বাইরের আলোহাওয়ার স্পর্শ পায় না। পাপবোধ এই আলো-হাওয়াহীন আবহাওয়ারই সৃষ্টি। নিজের সম্বন্ধে অধিক চিন্তা করা—সে চিন্তা পাপেরই হোক বা পুণ্যেরই হোক—মন্দ। তার ফলে মানুষ আত্মমুখী হয়ে পড়ে, আর আত্মমুখিতা থেকে জন্ম নেয় অবসাদ আর ক্লান্তি।

প্রচলিত নীতির অধীনে যাদের মন দ্বিধান্বিত হয় না, তারা একরকম থাকে বেশ। বিচারবুদ্ধির প্রয়োজন তাদের হয় না। কিন্তু যারা একবার এ রোগে ভুগছে, বিচারবুদ্ধির পরামর্শ ছাড়া তাদের নিষ্কৃতি নেই। একথা স্বীকার করতেই হবে, দ্বন্দ্বে ভোগাটা একে-বারে মন্দ নয়, তার ভালো দিক আছে। আত্মিক উন্নতির জন্য তার প্রয়োজন অবধারিত। সাঁওতাল-কোল-ভীলরা দ্বন্দ্বে ভোগে না।

কিন্তু তাই বলে কি তারা আমাদের চেয়ে ভালো? নিশ্চয়ই নয়। দ্বন্দ্বহীন লোকদের চেয়ে দ্বন্দ্বকাতর লোকেরা অনেক উঁচু স্তরের। ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে তারা একধাপ অগ্রসর। আরো অগ্রসর হচ্ছে দ্বন্দ্বমুক্ত লোকেরা। (দ্বন্দ্বহীন আর দ্বন্দ্বমুক্ত কথা দুটো এক নয়, মনে রাখবেন।) এই মুক্তি ঘটে যুক্তিবিচারের কল্যাণে। যুক্তিবিচার ভাবালুতার মেঘ সরিয়ে দিয়ে অন্তর-আকাশকে সূর্যকরোজ্জ্বল করে তোলে। তখন আর সুখের অবধি থাকে না।

(দ্বন্দ্বকাতরতাকে দ্বন্দ্বহীনতার চেয়ে উৎকৃষ্টতর বলা হয়েছে। কিন্তু দেখতে হবে কোন ধরনের দ্বন্দ্ব। অযৌক্তিক পাপচেতনার দ্বন্দ্বে ভুগে লাভ নেই। তাতে আত্মার উন্নয়ন হয় না, অবনয়ন হয়। যৌক্তিক পাপচেতনার দ্বন্দ্বই মানুষকে উন্নতির দিকে নিয়ে যায়। তা-ই মানুষকে অন্যায়মুক্ত করে ন্যায়ে দীক্ষিত করে। অযৌক্তিক পাপচেতনার সে ক্ষমতা নেই—তা শুধু চোখের জল ঝরায়। তা বন্ধ্যা।)

'গভীর ও প্রকৃত সুখ কামনা করে না বলেই মানুষ যুক্তিবিচারের হাতে ধরা না দিয়ে নেশার হাতে আত্মসমর্পণ করতে চায়। সে ভাবে জীবনে তো আর সুখ পাওয়া যায় না, নেশা থেকে যা একটু পাওয়া যায় যুক্তিবিচার বেটা সেটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিতে চায়। বেটা পাজি, বলে কিনা নেশা হারাম, বুদ্ধিমান লোকেরা নেশার হাতে ধরা দেয় না। বলি, নেশা ছাড়া সুখ আছে কিসে হে?—বিচারবুদ্ধি নেশার সুখ নিয়ে যায় তা সত্যি, কিন্তু তা যে একটা বড় দিকে লক্ষ্য রেখে, সে কথাটা তারা বুঝতে পারে না। পলায়নী ক্ষণস্থায়ী সুখের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সৃজনধর্মী গভীর সুখের কাছে নিয়ে যাওয়াই তার উদ্দেশ্য। দ্বন্দ্বমুক্ত করে মনের অটুট ভাব রক্ষা করা আর নিজের শক্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই তার কাজ। আর তাতেই মানুষের শ্রেষ্ঠ সুখ। মানসিক সক্রিয়তা থেকে যে আনন্দ পাওয়া যায় তার তুলনা নেই।

যে-লোকটির শক্তি অটুট, বুদ্ধি সজাগ ও সক্রিয়, সে-ই তো সুখী, আর তার পানে চেয়েই তো আমাদের আনন্দ। স্বচ্ছতোয়া ঝর্ণাধারার মতো সে নিত্যপ্রবাহিত। তার মতো যেন আমরা হই। কিন্তু পাপবোধের অন্তর্লীন পার্বত্য অন্তরায় ব্যাহত করে। তাই তার সম্বন্ধে সাবধান হওয়া দরকার।

নির্যাতন-স্পৃহা

কোন কোন মানুষের খেয়াল লোকেরা তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত. কেউ না কেউ তাদের জেল খাটাতে চায়, আর কেউবা চায় দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে। এই কাল্পনিক ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে তারা অনেক সময় এমন কাণ্ড করে বসে যে, তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করে থাকা যায় না। তাই নিমপাগলামি সুখের অন্তরায় আর মাত্রা পেরিয়ে গেলে তা-ই পুরা পাগলামিতে পরিণত হয়। পুরা পাগলদের সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলবার নেই, তাদের যেতে হবে সাইকিএট্রিস্টদের কাছে। নিমপাগলরা আমাদের কথা শুনলে লাভবান হতে পারে। তাই তাদের দিকে তাকিয়ে কয়েকটা কথা বলছি।

দেখা হলেই দুঃখের কাহিনী শোনায়, এমন লোক তো হামেশাই চোখে পড়ে। হয় প্রতারণার, নয় কৃতঘ্নতার কথা তুলে তারা মানুষের সহানুভূতি পেতে চায়। তারা যা বলতে চায় তা যে একেবারে মিথ্যা তা হয়তো নয়। হয়তো বা তাদের প্রতি সত্যি সত্যি অন্যায় করা হয়েছে। আর সে অন্যায়ের প্রতিকারও হয় না। কিন্তু মুশকিল এই যে, সব কিছুই তারা দেখে বাড়িয়ে। তিলকে তাল করা তাদের স্বভাব। রং চড়াতে না পারলে তারা খুশী হয় না। তাই যখন দেখবেন সকলের বিরুদ্ধেই তারা নালিশ আনছে এবং তাদের দৃষ্টিতে শয়তান ছাড়া মানুষ নেই, তখন তাদের কথায় আর সন্দিহান না হয়ে পারবেন না। সকলেই যদি একজনের প্রতি মন্দ ব্যবহার করে তো মন্দটা তার না অপরের সেটা ভেবে দেখবার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

হয় তার প্রতি কেউ মন্দ ব্যবহার করে না, সেটা সম্পূর্ণ বানানো ব্যাপার, নয়, তার অজান্তে সে মানুষকে এমন আঘাত করে বসে যে, প্রতিদানে সে মন্দ ব্যবহার পেয়ে থাকে। কিন্তু মুশকিলে পড়তে হয় এমন লোককে নিয়ে। •সহানুভূতি কি অসহানুভূতি উভয়ের ছোঁয়াতেই সে ভাবাবেগের পরিচয় দেয়। তার কাহিনীটি বিশ্বাস করলে সে এমন ভাবে বর্ণনায় মেতে যাবে যে, সত্য-মিথ্যার সীমারেখা মানবে না, আর না করলে আপনার মধ্যেও আরেকটি নিষ্ঠুর মানুষের সাক্ষাৎ পেয়ে ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়ে উঠবে। এসব লোকের সঙ্গে কথা বলতে হয় খুব সাবধানে। আবেগ বর্জন করে সংযত বুদ্ধির আলোকে দুর্বলতাটুকু বুঝিয়ে দিতে পারলেই তারা নিজেদের শোধরাতে পারে। নইলে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা।

পরনিন্দায় আস্থা স্থাপনের স্পৃহা প্রায় সার্বজনীন। যুক্তি প্রমাণের ধার না ধেরেই আমরা তা বিশ্বাস করে বসি। লোকের তারিফটা আমরা সহজে গ্রহণ করতে চাই নে। নিন্দাটা নেই লুফে। লোকের নিন্দা শুনলে যেন আমাদের সারা দেহে প্রাণ জেগে ওঠে, অর্থাৎ কুপথ্যের মত তা' গিলতে থাকি। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, পরের বেলায় যা খুশী হয়ে উপভোগ করা হয়, নিজের বেলায় তা-ই জাগায় তীব্র ক্রোধ। নিজের নিন্দা শুনলেই আমরা ক্ষেপে উঠি, বলি : কী, আমার বিরুদ্ধে অপবাদ! আচ্ছা দেখে নেবো। এই ভাবটা উগ্রতর হলেই নির্যাতন-স্পৃহার জন্ম হয়। তখন বিক্ষুব্ধ মন কেবলই প্রতিশোধ নেবার সুযোগ খুঁজতে থাকে। প্রত্যেকেই আমাদের ভালোবাসুক ও শ্রদ্ধা করুক এইটে আমরা চাই যদিও অপরকে সম্মান, প্রীতি ও শ্রদ্ধা দেওয়ার ইচ্ছে আমাদের আদৌ নেই। আমরা কেবলই নিজের কোলে ঝোল টানতে ভালোবাসি। নিজের গুণ ও অপরের দোষকে অতিকায় করে দেখা আমাদের স্বভাব। অপরের বিরুদ্ধে

যা বলি তার শতাংশের একাংশও আমরা মনে রাখি নে, পক্ষে যা বলি তার প্রায় সবটাই মনে থেকে যায়। তাই অপরের মুখে আমাদের বদনাম শুনলে আমরা বিস্মিত হয়ে বলে উঠি: কই, আমি তো তার বিরুদ্ধে কিছুই বলিনি, বরং তার প্রশংসাই করেছি, আর তার এই ফল; হায়রে মানুষ!

মানুষের মন জানবার ইন্দ্রজালটি পাওয়া গেলে তার প্রথম ফল হতো বন্ধুত্বের অবলুপ্তি। কেননা মানুষের ভেতরটা জেনে ফেলতুম বলে আমরা আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারতুম না। কিন্তু বন্ধুবিহীন জীবন অসম্ভব, তাই পরিণামে তা' বন্ধুতারই প্রতিষ্ঠা করত। আর এবার বন্ধুতার প্রতিষ্ঠাভূমি হত সৎ অর্থাৎ বাস্তব, কল্পনা বা ভাবাতিরেক নয়। সম্পূর্ণ দোষমুক্ত না হলেও যে মানুষ বন্ধু বলে গৃহীত হতে পারে এবার তা' সহজেই স্বীকৃত হত। বন্ধুদের নির্দোষ আদর্শ মানুষরূপে দেখা হয় বলেই এখন আর তা' সম্ভব হয় না। তাই মেকআপ আর অভিনয়ের দরকার হয়ে পড়ে। আপনি যা নন তাই আপনাকে সাজতে হয়। ফলে, আপনাকে অত্যন্ত সাবধান হয়ে চলতে হয় এবং কেউ একটুখানি দোষের ইঙ্গিত করলেই আপনি অসহিষ্ণুতার পরিচয় দেন। নিজেকে সম্পূর্ণ দোষমুক্ত ভাবেন বলেই আপনার এই দুরবস্থা। নইলে অপ্রমত্ত শান্ত জীবন-যাপন করা আপনার পক্ষে অসম্ভব হত না।

নির্যাতন-স্পৃহার গোড়ার কথা এই নির্দোষম্মন্যতা। আমি নির্দোষ, কিন্তু লোকেরা অনর্থক আমার ত্রুটি খুঁজে বেড়ায়, বিনা কারণে দুর্নাম রটায়, এ-কথা ভেবে আমরা রোষ প্রকাশ করি। তাতে ক্ষতিটা হয় আমাদেরই, পৃথিবীর নয়। না-হক রাগের অনলে আমরা জ্বলে-পুড়ে ছারখার হই। নিজের ত্রুটিকে সহজে স্বীকার করে নিতে না পারলে এ-জ্বালা থেকে মুক্তি নেই।

ধরা যাক এমন একজন নাটক লিখিয়ের কথা যার রচনার কাটতি কম। সে ভাবে: আমি যে একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, পক্ষ

পাতহীন মানুষ মাত্রই তা স্বীকার করবে। কিন্তু আমার নাটকগুলি যে মঞ্চস্থ হয় না অথবা হলেও ভালো উৎরায় না তার কারণ নাট্যমঞ্চের ম্যানেজার, অভিনেতা, সমালোচক সকলেই আমার বিরুদ্ধে। অবশ্য তাদের বিরুদ্ধতা আমার পক্ষে সম্মানেরই ব্যাপার, অসম্মানের নয়। আমি যে তাদের কাছে কোনোদিন মাথা নত করিনি এটা তারই প্রমাণ। আরেকটা কথা আছে : আমার রচনায় এমন অনেক শাদা সত্য থাকে যে, লোকদের তা সহ্যই হয় না। মূর্তিপূজা করতে শেখাইনে বলে লোকেরা আমার ওপর বীতরাগ। সমাজের তোষামোদ যারা করে তারাই তো শ্রদ্ধা পায়, সমালোচকের ভাগ্যে জোটে কেবল নিন্দা আর বিদ্রূপ। তাই আমার অমর্ত্য-প্রতিভা অবজ্ঞাতই রইল।

অবজ্ঞাত আবিষ্কারকরাও অনুরূপ ভাবের পরিচয় দিয়ে থাকে। তারা ভাবে কারখানার মালিকরা তো সেই মান্ধাতার আমলের রীতি বজায় রেখেই চলছে, নতুন নির্মাণ-পদ্ধতির ধারই ধারতে চায় না তারা, আর যারা ধারে সেই প্রগতিশীলরাও তাদের নিজেদের লোকই রাখে। তাই নতুন আবিষ্কারকদের ঠাঁই নেই। নতুন আবিষ্কারকদের স্বীকার করা আর তাদের নিজেদের প্রতি শত্রুতা করা তো এক কথা। দল, দল। সকলেই চায় দলের স্বার্থ রক্ষা করতে। আপনি যদি কোনো প্রকারে একবার দলে ঢুকতে পারেন তো আপনার প্রতিভাও স্বীকৃত হবে, নইলে কস্মিনকালেও তার মূল্য দেওয়া হবে না। এই স্বার্থপর যুগে প্রতিভা সহজে স্বীকৃত হওয়ার যো নেই। প্রতিভাবান হলে দুঃখই পেতে হয়, আমিও পাচ্ছি।

এতো গেলো মিথ্যা অভিযোগে মন খারাপির দৃষ্টান্ত। সত্যকার অভিযোগে মন খারাপির দৃষ্টান্ত তো যত্রতত্র মেলে। মুশকিল এই যে, এই ধরনের অভিযোগীরা মাত্রা ডিঙ্গিয়ে যায়। একটা ক্ষুদ্র ব্যাপার থেকে তারা চট করে একটা সাধারণ সত্যে এসে পৌঁছে। নিজের বেলা যা ঘটেছে বিশ্বব্যাপারেও তা সত্য এমনি

তাঁদের ধারণা হয়ে দাঁড়ায়। তাদের ধারণা এই রকম: চালাকি পেয়েছো বাবা, আমায় ফাঁকি দিতে পারবে না, কিছুই আমার দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না মনে রেখো। ধরুন সরকার গোপন রাখতে চায় গুপ্তচর বিভাগের এমন কোন ত্রুটি কেউ ধরতে পেরেছে কিন্তু হোমরা চোমরা কেউ নয় বলে সে তা' প্রকাশ করতে পারছে না। প্রকাশ করলে বিশ্বাস করবে কে। তাই সে মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের কাছে গিয়ে ব্যাপারটা জানায়। কিন্তু তাতেও লাভ হয় না কিছুই। তারা যে কথাটা বিশ্বাস করেনা তা নয়, কিন্তু তা নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করতে রাজি হয় না। এপর্যন্ত তার অভিযোগটি হয়ত সত্য। কিন্তু এর ওপর নির্ভর করে তার যে সিদ্ধান্ত, সব বড় লোকেরাই সরকারের ধামাধরা আর তাদের বড়লোকত্বটা এই ধামাধরা বৃত্তিরই ফল—এটা হয়ত সত্য নয়। সামান্য একটা তথ্যের ওপর নির্ভর করে এত বড় একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছা অন্যায়। ব্যতিক্রমকেই আইন বলে গ্রহণ করা হচ্ছে কি না তা' লোকটি ভেবে দেখতে চাচ্ছে না। তাই সে মেজাজ খারাপ করে আর বঞ্চনাপূর্ণ পৃথিবীর পানে তাকিয়ে মুখ খিঁচায়।

মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে যারা মানুষের উপকার করতে চায়, সে সব পরোপকারী মানব বন্ধুদের জীবনেও নির্যাতন-স্পৃহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। মানুষের অকৃতজ্ঞতা দেখে তারা বিস্মিত হয়, আর মনে মনে নেমকহারাম মানবজাতিকে অভিশাপ দিতে থাকে। পরোপকারের গোড়ায়ও যে একটা স্বার্থকামনা থাকতে পারে তা' তারা ভেবে দেখে না। তাই লোকের সামান্যতম উদাসীনতায়ও তারা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তাদের মনে থাকেনা যে, অনেক সময়ে শক্তির এষণাই মানুষকে পরোপকারী করে তোলে। আবার কখনো কখনো পরোপকারের গোড়ায় থাকে ছদ্মবেশী বিদ্বেষ। পাপীদের বিরুদ্ধে নিষ্পাপদের, অসতীদের বিরুদ্ধে সতীদের যে আন্দোলন তা' এই বিদ্বেষজাত আক্রমণেরই ফল। অপরের সুখ

ছিনিয়ে নেওয়ার আনন্দ পায় বলেই লোকেরা এই আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়। অসততার বিরুদ্ধে নয়, অসৎদের সুখের বিরুদ্ধেই তাদের অভিযান। মজাটা মারবে অথচ শাস্তিটা এড়িয়ে যাবে তা' তো সহ্য করা যায় না। তাই মানবহিতের নামে তারা এগিয়ে আসে আক্রোশ মেটাতে। দেখা গেছে, আমেরিকায় ধূমপানের বিরুদ্ধে যারা ভোট দিতে এগিয়ে আসে তারা প্রায়ই অধূমপায়ী। ধূমপায়ীর সুখ কেড়ে নেওয়াই তাদের উদ্দেশ্য। মানবহিতৈষীরা যখন মানুষের অকৃতজ্ঞতায় ক্ষুব্ধ হয়, তখন এ কথা ভেবে দেখে না, তাই অকারণ ক্ষোভের জ্বালায় ছটফটিয়ে মরে। চারটি কথা মনে রাখলে তারা এই অকারণ ক্ষোভ থেকে রক্ষা পেতে পারে :

প্রথমতঃ, আপনার ইচ্ছাটা যত পরার্থপর মনে করেন, আসলে তা তত পরার্থপর না-ও হতে পারে। এমনো হতে পারে যে, পরার্থপরতার আচ্ছাদনে আপনি স্বার্থপরতাকেই লুকিয়ে রেখেছেন। আপনার উদ্দেশ্য আসলে পরোপকার নয়, পরোপকার করতে গিয়ে যে শক্তির স্বাদ পাওয়া যায় তাই।

দ্বিতীয়তঃ, নিজের গুণগরিমা সম্বন্ধে অতিরিক্ত বড় ধারণা না রাখাই ভালো। তা' হলে ত্রুটিমুক্ত হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়, আর লোকনিন্দায় অভিভূত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে না। নিজেকে সর্বগুণাধার ভাবেন বলেই আপনি নিন্দায় কাবু হয়ে পড়েন।

তৃতীয়তঃ, আপনি আপনার ব্যাপারে যতটা মনোযোগ দেন অপরও আপনার ব্যাপারে ততটা মনোযোগ দেবে, এমন প্রত্যাশা না করাই ভালো। করলে ব্যর্থতার দুঃখ ভোগ করতে হবে।

চতুর্থতঃ, এমন কল্পনা করবেন না যে, আপনাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য সকলে ওৎ পেতে আছে। না, তা' কখনো নয়। সকলেরই নিজ কাজ রয়েছে, আপনার দিকে তাকিয়ে থাকার সময় কোথায়? অতিরিক্ত আত্মসচেতন লোকেরা সংসারে দুঃখই পায়, তাই অতিরিক্ত আত্মসচেতনতার পরিচয় না দেওয়াই ভালো।

শাসক ও মানব হিতৈষী সম্প্রদায়ের নিজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটু-খানি সন্দেহ থাকা দরকার। নইলে ইচ্ছার উগ্র প্রয়োগের ফলে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা। জগৎ বা তার অংশ বিশেষ কিরূপ হবে সে সম্বন্ধে তাদের একটা স্বপ্ন থাকে এবং সে-স্বপ্ন অনুযায়ী কাজ করলে লোকের উপকার না হয়ে যায় না এমনি প্রতীতিও তাদের পেয়ে বসে। তাই অপরের মনের দিকে না তাকিয়ে জবরদস্তি চালাতে তারা দ্বিধা করে না। অপরেরও যে একটা মত পোষণ করবার অধিকার আছে, অতি আগ্রহের ফলে সে কথাটা তারা ভুলে যায়। শাসকশ্রেণীর লোকেরাই অধিক গোঁয়ারতুমির পরিচয় দেয়। নিজের ধারণার সত্যতায় তারা এমন নিঃসন্দেহ হয়ে পড়ে যে, অপরের ধারণাকে অগ্রাহ্য করতে মোটেই বিচলিত হয় না। কিন্তু নিজেদের যতই পরোপকারী মনে করুক না কেন আসলে তাদের হিতৈষণার পেছনেও রয়েছে কর্তৃত্বের সুখ। যে পরিবর্তনটা আসবে তার হেতু হবে তারা, এই সুখ-চিন্তাই তাদের কাজের দ্যোতনা। কর্তৃত্ব, তথা শক্তিলাভের সম্ভাবনা না থাকলে নিছক পরোপকারের তাগিদে তারা কোনোদিন কাজে অবতীর্ণ হত কি-না সন্দেহ। শক্তি-কামনার সঙ্গে থাকে আরেকটা বিশ্রী জিনিস, সেটা হচ্ছে অহমিকা-তৃপ্তি। অহংকারের তাগিদেও লোকেরা পরোপকার বিলাসে রত হয়। ফলে তাদের দেমাক যায় বেড়ে, একটা অসম্ভব রকম কাজ করেছে ভেবে মাটিতে আর পা রাখতে চায় না। কিন্তু সেটা ভুল, তাতে সুখ বাড়ে না, কমে।

এই অহংকার-বোধের জন্য দায়ী হচ্ছে প্রচলিত নীতি। মানব-হিতকে একটা অসাধারণ নিঃস্বার্থ ব্যাপারে ভাবা হয়েছে বলেই মানুষ পরোপকারে এমন গর্ব বোধ করে। নইলে কখনো তা করতো না। এই অহংকার থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় হচ্ছে স্বার্থচিন্তাকে স্বীকার করে নেওয়া। আমরা সকলেই কমবেশী স্বার্থপর, আর স্বার্থ চিন্তার প্রয়োজন আছে, একথা স্বীকার করে নিলেই মানবহিতের

নির্যাতন-স্পৃহা

জন্য আমরা আর অযথা বড়াই করতুম না। কাজটা কোনো না কোনোভাবে আমাদের তৃপ্তি দিয়েছে, এটা ভাবতে পারতুম বলে অহংকার আর মাথাচাড়া দিয়ে উঠত না। আর অহংকার মাথাচাড়া দিয়ে উঠত না বলে নির্যাতন-স্পৃহারও জন্ম হত না। নির্যাতন-স্পৃহার গোড়ায় অবজ্ঞাত অহংবোধ এ-কথাটা মনে রাখা দরকার। আমি ওদের জন্য এত করলুম অথচ ওরা আমাকে মানতেই চায় না। আচ্ছা দেখে নেব। অবজ্ঞাত অহংকারবোধই আমাদের মুখ দিয়ে এমনি বলিয়ে নেয়। কাজটা শুধু পরোপকারের জন্য নয়, আনন্দের তাগিদে করা হয়েছে এটা ভাবতে পারলেই অহংকারের পীড়ন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

মহত্ত্বের মতো নিজের গুণ সম্বন্ধেও অতিরিক্ত বড় ধারণা রাখা ভালো নয়। যে-সব নাটকলিখিয়ের বই ভালো বাটেনা তাদের স্বীকার করে নেওয়া উচিত, তাদের রচনা উঁচু কিছু নয়। নইলে ব্যর্থতার ভোগ অনিবার্য হয়ে উঠবে। পৃথিবীতে অবজ্ঞাত গুণী যে নেই তা' নয়, কিন্তু তাদের সংখ্যা নগণ্য। নিজেকে সেই স্বল্প কতিপয়ের একজন মনে করা ভুল। আপনি যদি প্রতিভাবান হন তো আপনার কাজ হবে লোকের অবজ্ঞাকে অবজ্ঞা করে সামনে এগিয়ে চলা, আর প্রতিভাবান না হলে কাজ ছেড়ে দেওয়াই ভালো। খামোখা মিথ্যা বিশ্বাসের ওপর ভর করে নিজেকে ভুলিয়ে রাখা ঠিক নয়। প্রতিভাবান বলে পরবর্তী ঐতিহাসিক আপনার প্রয়াসকে 'বীরোচিত' বিশেষণে বিশেষিত করবে, আর না হলে 'হাস্যকর' বলবে। কিন্তু আপনি প্রতিভাবান কি অপ্রতিভাবান তা' আগে থাকতে জানবেন কি করে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে একটা পরীক্ষা আছে সেটা প্রয়োগ করে দেখা যেতে পারে। সেটা হচ্ছে আপনি লেখেন কেন, প্রশংসার জন্য, না প্রাণের তাগিদে তা' ভালো করে ভেবে দেখা। প্রকৃত শিল্পীর জীবনে যে প্রশংসার তাগিদ থাকে না তা' নয়। কিন্তু সেখানে প্রশংসার চেয়ে বড় হয়ে ওঠে

প্রকাশের বেদনা। তবেই সে বাঁচে। তাই হাততালি না মিললেও সে খুশী মনে কাজটি করে যায় প্রকাশভঙ্গি কি বিষয়বস্তু কিছুই বদলায় না। অপরপক্ষে প্রশংসাপ্রিয় কিন্তু তবু সে ছাড়বে না, নিজেকে প্রতিভাহীন ভাবতে তার কলজে ছিঁড়ে যাবে। লোকটি হাততালির লোভে অনবরত পরিবর্তনের স্রোতে ভেসে চলে। অন্তরের অকৃত্রিম তাগিদ নয়, হাততালির মোহই তার প্রেরণা। Clap trap তথা করতালির ফাঁদ পেতে যাওয়াই তার কাজ। তাই তার রচনায় যুগের ফ্যাশন ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। তার ভেতরে কিছুই নেই, সে নিঃস্ব। শিল্পের জন্য তার প্রাণগত উৎকণ্ঠা নেই, আছে চাহিদাশ্রয়ী মোহ। এমন লোকের পক্ষে শিল্প ছেড়ে দেওয়াই সমীচীন।

নিজের সম্বন্ধে সত্য ধারণাটা প্রথমে পীড়াদায়ক হলেও পরিণামে সুখদায়ী। মোহমুক্তির দরুন নিজের সহজ শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মানুষ সার্থকতার পথ খুঁজে পায়। তখন আর সুখের অবধি থাকে না। তা' ছাড়া মিথ্যা দায় থেকে মুক্তি পাওয়া সেও একটা বড় রকমের আনন্দ। মনে হয় ঘাড় থেকে একটা মস্ত বোঝা নেমে গেলো। কি মুক্তি! প্রকৃতিবিরুদ্ধ কঠিন পথটি অনুসরণ করে চললে অকৃতকার্যতার দরুন আপনি খামখা লোকের ওপর রাগ করে চলবেন, আর বিশ্বসংসার আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এ-কথা ভেবে না-হক মেজাজ খারাপির দুঃখ পাবেন। অক্রুদ্ধ থাকার উপায় হচ্ছে নিজেকে সার্থকতার পথে চালনা করা। নইলে চণ্ডালের মত ক্রুদ্ধ জীবনই হবে আপনার ভাগ্যে। রাগে ক্ষোভে আপনি পৃথিবীকে আঁচড়ে ছিড়ে ফেলতে চাইবেন।

আমাদের তৃতীয় বাণীতে অন্যের কাছ থেকে খুব বেশী আশা করতে নিষেধ করা হয়েছে। সেটাও দেখবার মতো। আপনার কাছ থেকে বেশী কিছু আশা করলে আপনি অসুখী হবেন, আর অসুখী মানুষেরা অভিযোগী মনের পরিচয় না দিয়ে পারে না।

অসুখের পথে না হাঁটাই ভালো। অনেক সময় দেখা যায় রুগ্ন মা-বাপেরা ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে অনেক বেশী সেবা প্রত্যাশা করেন। সেটা কিন্তু ভুল। আশানুরূপ সেবা পাননা বলে তাঁদের ব্যর্থতার দুঃখ ভোগ করতে হয়। যত কম চাইবেন তত বেশী পাবেন, বেশী কামনা করলেই কম পাওয়া যাবে। সুখতত্ত্বের এই গোড়ার কথাটা মনে না রাখলে সুখী হওয়া যায় না। আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলের বেলায়ই কথাটা মনে রাখা দরকার। আপনি যেমন সমস্ত ব্যাপারে নিজের স্বার্থটাকে বড় করে তোলেন, অপরেও তাই করে। এটা মনে না রাখলে আপনি নিজের ইচ্ছাকে সংকুচিত করার দায়িত্ব বোধ করবেন না এবং অপূর্ণ ইচ্ছার বেদনায় আপনাকে ছটফট করতে হবে। সকলের ইচ্ছার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চললেই সুখ পাওয়া যায় নইলে কপালে ঢুঢু। নিজের জীবনের মূল উদ্দেশ্যকে বিপন্ন না করেই মানুষ অপরের দিকে তাকাতে পারে। বিপন্ন করে নয়। তাই রুগ্ন পিতাটি যদি চান তাঁর কন্যাদের মধ্যে একটি বিয়ে না করে তাঁর সেবায় রত থাকুক তো সেটা হবে অতি-চাওয়া, আর ওই 'অতি ইচ্ছার সংকট হতে মুক্তি পাওয়ার উপায় হচ্ছে মেয়েটির কামনা-বাসনার মূল্য দেওয়া। নইলে ব্যর্থতায় ভুগতে হবে আর ব্যর্থতা থেকে জন্ম নেবে নির্যাতন-স্পৃহা।

সকলেই নিজের চরকায় তেল দেয়, অপরের চরকায় নয়। তাই সকলেই আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, এমনটি ভাবা ভুল। অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক বলেই আপনি এমন কথা বলতে পারেন, নইলে কস্মিন-কালেও তা মুখে আনতেন না। মনে রাখবেন, আত্মকেন্দ্রিকতা এক প্রকারের রোগ, আর তা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় হচ্ছে নিজেকে ভুলে বাইরের দিকে তাকানো। বিচিত্র বিশ্ব আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছে, সে দিকে তাকান সুখ পাবেন।

আরেকটা কথা। বড় লোকদের বিরুদ্ধেই লোকেরা লাগে, আর তাতে তারা দুঃখিত না হয়ে ক্ষমাশীলতার, আরো সত্য করে বলতে গেলে উদাসীনতারই পরিচয় দেয়। লোকনিন্দায় আপনি যে ক্রুদ্ধ

হচ্ছেন তবেই প্রমাণিত হচ্ছে, আপনি নিজেকে যতটা বড় মনে করেন আসলে ততটা বড় নন। আপনার আত্মপ্রত্যয় কম। নইলে অপরের সমালোচনায় আপনি অপ্রমত্ত থাকতে পারবেন। নিজের সম্বন্ধে সত্য ধারণাটাই ভালো। মিথ্যা ধারণাটা পরের কাছ থেকে বেশী চাওয়ার ফলে দুঃখই নিয়ে আসে। 'হায় হায়' আমার প্রকৃত মূল্য লোকেরা দেয় না বলে মিথ্যা ধারণার বশবর্তীরাই কান্না জুড়ে দেয়। কান্না-রাগে পরিণত হয়, আর রাগ প্রতিশোধ-স্পৃহায় ফেটে পড়তে চায়।

তাই দুঃখ থেকে বাঁচার উপায় হলো নিজের সম্বন্ধে অসম্ভব ধারণা পোষণ না করা। তা হলেই আক্রোশমুক্ত হয়ে সহজে জগতের পানে তাকাতে পারবেন; আর জগত প্রতিদানে রূপ-রসে আপনার জীবনকে ভরে তুলবে। সেটাই হবে আপনার পক্ষে সত্যকার বাঁচা। নির্যাতন থেকে মুক্তি পাওয়ার ও-ই উপায়।

নিজেকে খিঁচুনিমুক্ত রাখার চেষ্টা করুন, তা হলেই নির্যাতন-স্পৃহার নির্যাতন থেকে মুক্তি পেয়ে সহজ হতে পারবেন। আর সহজ হওয়াই সুখী হওয়া।

যাদের সঙ্গে আত্মীয়তা রয়েছে বিশেষ করে যাদের সাথে বাস করা হচ্ছে, জীবনের ধরন-ধারণ ও মতাদর্শে তাদের সঙ্গে মিল না থাকলে সুখ পাওয়া যায় না। আধুনিক সমাজের বৈশিষ্ট্য এই দাঁড়িয়েছে যে, তা নানা দলে বিভক্ত এবং প্রতিটি দল নিজ নিজ মতবিশ্বাসের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলতে ইচ্ছুক। তাই এক পরিবেশে একাত্ম হয়ে থাকবার আনন্দ আজকাল আর পাওয়া যায় না। বন্ধুরা যেন দূরে-দূরে ঘুরে বেড়ায়, কাছে খুঁজে পাওয়া যায় না। এই অবস্থার সূত্রপাত হয়েছে রিফরমেশনের আমল থেকে। আরো সত্য করে বলতে গেলে রেনেসাঁসের কাল থেকে। রেনেসাঁসের শব্দগত অর্থ যাই হোকনা কেন, আসল অর্থ হচ্ছে বুদ্ধির মুক্তি। আর বুদ্ধির মুক্তি যে চিন্তা-ভাবনার একঘেয়েমির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করবে এতো স্বাভাবিক। তাই রেনেসাঁসের শুরু থেকে ইউরোপে দেখা দিল নানা মত, নানা বিশ্বাস, নানা দৃষ্টিভঙ্গি। প্রটেস্‌টান্‌ট্‌ ও ক্যাথোলিক, অভিজাত ও বুর্জোয়া, ফ্রি থিংকার ও অবাধ স্বাধীনতাকামী, সমাজতন্ত্রী ও গণতন্ত্রী—এই ধরনের কতো দলের যে সৃষ্টি হলো ও হচ্ছে তা হিসেব করে বলা শক্ত। এ সকল মতবিশ্বাস যে কেবল বাইরের ব্যাপার হিসেবে রয়েছে তা নয়, জীবনের গভীরেও প্রভাব বিস্তার করেছে অনেকখানি। সত্য বলতে কি, জীবনভঙ্গিকেই তারা বদলে দিয়েছে। ইংরেজি ভাষাভাষী লোকদের মধ্যে এই বিভিন্নতা অনেক বেশী। এখানে কোন দল আর্টের গুণগ্রাহী, আবার কোন দল বা তাকে মনে করে শয়তানের কারসাজি। কারো কাছে সাম্রাজ্যপূজার চেয়ে শ্রেষ্ঠ পুণ্য আর নেই, কারো কাছে বা এটা

পাপ—নির্বোধের অনুসরণীয় ব্যাপার। প্রচলিত নীতির সমর্থকদের কাছে যৌন ব্যভিচারের মতো ঘৃণ্য পাপ আর দ্বিতীয়টি নেই; অপরেরা তাকে ক্ষমার যোগ্য লঘুপাপ বলেই মনে করে। ক্যাথোলিকরা তালাকের নাম শুনলে মূর্ছা যায়, অপরের কাছে তা তেমন মারাত্মক কিছু নয়. বিয়ের মতোই একটা সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাপার।

এই মতবিশ্বাসের বিভিন্নতার দরুন মানুষ এক পরিবেশে যেমন খাপ খায় না তেমনি অপর পরিবেশে বেমালুম মিশ খেয়ে যায়। সকল সময় নিজেদের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না বলে তরুণদের জীবন দুঃখময় হয়ে ওঠে। বাতাসে-ওড়া ভাবধারার ভক্ত হয়ে পড়ার দরুন তরুণ-তরুণীরা সাধারণতঃ সামাজের বিদ্রূপ ও নিন্দাভাজনই হয়ে থাকে। অচিরে তারা টের পায়, তাদের প্রতি সমাজের প্রসন্ন দৃষ্টি নেই, নতুন ভাব নতুন চিন্তাকে সে বিষের নজরেই দেখে। তাই তারা মনে করে, সামাজিক প্রতিকূলতার এই দুঃখ তাদের ললাটলিপি—এর থেকে নিস্তার পাওয়ার কোন উপায় নেই। এক পরিবেশে যে ভাব নিন্দনীয়, অপর পরিবেশে যে তা সহজ ও স্বাভাবিক হতে পারে তা তারা ভাবতেই পারে না। তাই অজ্ঞানতাবশতঃ যৌবনে, কোন কোন ক্ষেত্রে বা সারাজীবন তাদের দুঃখ পেতে হয়। শুধু তাই নয়, সামাজিক বিরোধের ফলে অনেক সময় ভীরুতাও জন্মে—আর ভীরুতা ধীরে ধীরে জীবনকে ক্ষয়ের দিকে নিয়ে যায়।

পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মনের মতো মানুষ খুঁজে পাননি বলে ব্রোনটি ভগ্নীদ্বয়কে একান্ত নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করতে হয়েছিল। সাহসিকা এমিলি তাতে মোটেই কাবু হয়নি। কিন্তু যথেষ্ট গুণপনা সত্ত্বেও শিক্ষয়িত্রীর মনোভাবের ঊর্ধ্বে যেতে না পারার দরুন শার্লে'টি বেশ অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। ব্লেককেও একা থাকতে হয়েছিল। কিন্তু একাকিত্ব তাঁকে দমিয়ে দিতে পারেনি। এমিলির মতো তাঁরও যথেষ্ট মনের জোর ছিল। তিনিই ঠিক,

অপরের ভুল—এই বিশ্বাসের দরুন তিনি সবসময়ই মনের সাহস ও উদ্যমকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। যে মানসিক শক্তি থাকলে লোকের অবজ্ঞা গ্রাহ্য না করেও চলা যায়, তা তাঁর ছিল। জনমতের প্রতি তাঁর মনোভাবটি কী নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি থেকে তা সহজেই প্রমাণিত হবে :

একটি মাত্র লোককে জানি, মিশলে যাহার সঙ্গে
ইচ্ছে কভু করে নাকো থুথু ফেলতে অঙ্গে।
খ্রীস্টান নয়, ইহুদী সে, 'ফুসেলি' তার নাম,
বহুদূরের অধিবাসী, তুরস্ক তার ধাম।
কেবল তাকেই দেখে কেন পরাণ খুশী হয়,
তোমাদের তা প্রশ্ন করি, খ্রীস্টান মহাশয়।

কিন্তু অন্তর্জীবনের এতটা শক্তি সকলের থাকে না। সহানুভূতিশীল পরিবেশ না হলে অনেকেই সুখ পায় না। তবে দেখতে পাওয়া যায়, বেশীর ভাগ লোকের বেলায়ই পরিবেশটি সহানুভূতিশীল হয়ে থাকে। তারা যে পরিবেশের স্তন্য পান করে মানুষ, সাধারণতঃ সে পরিবেশের মতাদর্শেরই ভক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু শিল্পী ও চিন্তাশীলদের বেলা এরূপটি ঘটে না। সজাগ মনের লোক বলে তারা সহজে প্রচলিত বিশ্বাসে সায় দিতে পারে না। তাই মন তাদের নিকট একটা বালাই হয়ে দেখা দেয়; রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র নির্ঝরের মতো মফঃস্বলের বুদ্ধিমান আগ্রহশীল বালক মাত্রেই দেখতে পায় তার আগ্রহের চারিদিকে কেবলই বাধার প্রাচীর। (সেই প্রাচীরে মাথা কুটে-কুটে সে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখনই সমাজ তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলে: বেশ ঠাণ্ডা ছেলেটি, জিতা রহো, বাবা!—জয়ী হও, একথাটা সমাজ কোনদিন বলেনা। কেননা, সমাজের প্রেম জীবন্মৃতের প্রতি, জীবন্তের প্রতি নয়।) কোন গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তক পড়তে চাইলে সমবয়স্করা করে তাকে ঠাট্টা,

শিক্ষকরা করে নিরুৎসাহিত, আর প্রচলিত মতে আস্থাহীন ভেবে গুরুজনরা দেখে তা সন্দেহের চোখে। শিল্পের দিকে ঝুঁকলে সঙ্গীরা ভীরু ভেবে করে তাচ্ছিল্য, অভিভাবকরা দুর্নীতিপরায়ণ মনে করে শাসায়। আর সমাজের মধ্যে চল্ নেই, এমন কোন পেশার অনুরক্ত হলে সকলে তার বিরুদ্ধে গিয়ে বলে : ফাজলামি ছেড়ে দাও, অত ফর-ফর কোরোনা, বাবার পেশাটি আঁকড়ে ধরে নিশ্চিন্তে জীবন-যাপন করার চেষ্টা করো। বেশী উড়তে চেয়োনা 'পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে'—মনে রেখো। মাতাপিতায় ধর্মীয় অথবা রাজনৈতিক বিশ্বাসের একটুখানি সমালোচনা করলে কেউ তা সহ্য করে না। সকলে হৈ-হৈ করে তেড়ে আসে শাস্তি দিতে। বাধা, বাধা, বাধা—তার চারদিকে কেবলই বাধা। সেই বাধাকে পরাভূত করে চলা যে কত কঠিন তা সে-ই জানে। এজন্য অসাধারণ বুদ্ধি-সম্পন্ন তরুণ-তরুণীদের বয়ঃসন্ধিকাল দুঃখময় হয়ে ওঠে। তাদের সমবয়স্করা এ সময়টা বেশ স্ফূর্তিতেই কাটায়। কিন্তু তাদের কপাল মন্দ। গভীর কিছু কামনা করে বলে তারা না নবীন না প্রবীণ কারো মধ্যেই সুরের মিল খুঁজে পায় না। পরিবেশের সঙ্গে সহজে নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পারার দরুন তারা সব সময়ই মনে মনে একটা পীড়া অনুভব করে। এই দুঃখ ছন্দোপতনের দুঃখ—মনের মতো মানুষ খুঁজে না পাওয়ার দুঃখ। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় তারা কয়েকটা বৎসর বেশ সুখে কাটায়—এই সময় সহমর্মী তরুণদের সান্নিধ্যলাভের সুযোগ পায় বলে। এদের মধ্যে যারা বেশ ভাগ্যবান তারা বিশ্ববিদ্যালয়-ত্যাগের পরেও এমন একটা কাজ জোটাতে সক্ষম হয় যেখানে সহমর্মী খুঁজে পাওয়া মোটেই কঠিন হয় না। লণ্ডন অথবা নিউইয়র্কের মতো বড় শহরে বাস করলে সমরুচি-সম্পন্ন মানুষের এমন একটা দল খুঁজে নেওয়া যায়, যেখানে দমন অথবা পীড়নের মোটেই দরকার হয় না—যেখানে খোলা মনে চলাফেরা করা সম্ভব। কিন্তু কাজটি যদি এমন হয় যে, সাধারণের শ্রদ্ধা না

পেলে উন্নতি সম্ভব হয় না তো তাকে সারা জীবন অভিনয় করে যেতে হয়। ডাক্তার এবং উকিলদের জীবনে অনেক সময় এ অভিনয় দরকার হয়ে পড়ে। রুচি ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে খোলা মনের পরিচয় দিলে তারা লোকের শ্রদ্ধা হারিয়ে বসে এবং শ্রদ্ধা হারাবার দরুন পসারটিও মাটি হয়ে যায়। আমেরিকার মতো বিরাট দেশে মাঝে মাঝে এমন লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যাদের চেহারায় একাকিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। বই পড়ে অবশ্য তারা জানতে পায় যে, পৃথিবীতে এমন জায়গাও আছে যেখানে গোপনতা নিষ্প্রয়োজন—যেখানে মন খুলে কথাবার্তা বলা যায়। কিন্তু বাস্তবে তারা কখনো সে সুযোগ পায় না। তাই বহুলোকের মধ্যে থাকলেও তারা আসলে একা। ব্লেক ও এমিলির মতো জোরালো মনের অধিকারী না হলে এ ধরনের লোকেরা সত্যকার সুখ পায়না। তাই সুখকে সম্ভব করে তুলতে হলে জনমতের পীড়নকে দমিয়ে দিতে হবে এবং বুদ্ধিমান লোকেরা যাতে পরস্পরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। সেটা কি করে করা যায়, তা-ই ভেবে দেখা দরকার।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত ভীতি অবস্থাকে শোচনীয় করে তোলে। প্রায় দেখতে পাওয়া যায় জনমতকে যে ভয় করে, জনমত তাকেই কাবু করে বসে—যে ভয় করে না তাকে কিছুই করতে পারে না। কুকুরকে ভয় করলেই কুকুর তেড়ে কামড়াতে আসে, ভয় না করলে কিছুক্ষণ ঘেউ ঘেউ করে লেজ গুটিয়ে চলে যায়। সাহসই সব চেয়ে বড় জিনিস, এ কথা মনে রাখা দরকার। সাহসহারা হলেই ভয়ের ভূত অথবা ভূতের ভয় পেয়ে বসে। অবশ্য 'সব কিছুই উড়িয়ে দাও' এমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। বোকার মতো অযৌক্তিক সাহস দেখাতে গেলে বিপদে পড়তেই হবে। কেন্‌সিন্‌গ্‌টনে বাস করে যদি রাশিয়ার, অথবা রাশিয়ায় বাস করে কেন্‌সিন্‌গ্‌টনের মতবিশ্বাসের পরিচয় দেন তো আপনাকে তার ফল ভোগ করতেই হবে। এই ধরনের উগ্রবিরোধের কথা নয়, আমি আরো মৃদু স্খলন-

পতনের কথাই বলছি। বেশভূষার ত্রুটি, চার্চের নির্দেশ পালনে অমনোযোগ, নিষিদ্ধ বুদ্ধিদীপ্ত পুস্তক-পাঠে আসক্তি—সমাজকে আঘাত করার উদ্দেশ্য নিয়ে যদি না হয় তো সমাজ তাতে ভ্রুক্ষেপও করে না। এ সব স্খলন-পতনকে সে ক্ষমার চোখেই দেখে। এ ধরনের লোককে সমাজ 'পাগলা' বলে আদর করে এবং অপরের বেলা যে ত্রুটি অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য, তার বেলা তা অপরাধ বলেই ধরা হয় না। আসল কথা: সমাজ তাকাবে আপনার দৃষ্টিভঙ্গীর দিকে। আপনি যা করছেন তা কি সমাজকে আঘাত করার উদ্দেশ্য নিয়ে করছেন, না আপনার সহজ জীবনছন্দের তাগিদে করছেন, সমাজ তাই দেখবে। আপনার আচরণে সমালোচনার ভাবটি ফুটে না উঠলেই সে খুশী। সে চায় আপনার সহানুভূতি। সহানুভূতিহীন লোককে সে কখনো সহ্য করে না। প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়, সমাজের সঙ্গে যারা নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে না, তাদের আচরণে সমাজের প্রতি একটা অবজ্ঞা ও বিদ্রূপ ফুটে ওঠে। সমাজকে খুঁচিয়ে তারা নিজের জীবনকে দুঃখপূর্ণ করে তোলে। উপযুক্ত পরিবেশ পেলে এই ধরনের খোঁচাওয়ালা লোকেরাই মসৃণ ও স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করতে পারে। আদর্শের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায় বলে সেখানে তাদের আর দুঃখময় আত্মসচেতন জীবন যাপন করতে হয় না।

তাই যে সকল তরুণ পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছে না বলে সুখ পাচ্ছে না, তাদের উচিত এমন কোন পেশা খুঁজে নেওয়া যেখানে মনের মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া মোটেই কঠিন হবে না। সে পেশাটি যদি অপেক্ষাকৃত কম আয়েরও হয়-তো তাতেই তাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত; কেননা তাতে তারা মনের তৃপ্তি পাবে—আর মনের তৃপ্তির মতো বড় জিনিস আর দ্বিতীয়টি নেই। কিন্তু অভিজ্ঞতার স্বল্পতার দরুন এমন পরিবেশটি যে সম্ভব, তা তারা কল্পনাও করতে পারে না। বরং তাদের ধারণা: সংকীর্ণ সংস্কারের আওতা

পৃথিবীময়। এ ব্যাপারে প্রবীণ লোকের পরামর্শ তাদের যথেষ্ট সহায়তা করতে পারে। কেননা তাদের অভিজ্ঞতা প্রচুর এবং কোথায় কোন্ ধরনের মানুষের বাস সে সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল থাকা তাদের পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়।

এটা মনোসমীক্ষার যুগ। তাই পরিবেশের সঙ্গে মানসিক দ্বন্দ্বকে মনস্তাত্ত্বিক বিশৃঙ্খলার পর্যায়ভুক্ত করে দেখা এ যুগের একটা ধরন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা কিন্তু ভুল। এই দ্বন্দ্ব বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্যের লক্ষণ, অস্বাস্থ্যের নয়। ক্রমবিকাশবাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কোন তরুণ যদি দেখতে পায় তার গুরুজনরা তার প্রিয় মতটিকে বিদ্রূপই করছে, শ্রদ্ধা নয়—তো সে তাদের প্রতি আর তেমন শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে সে প্রকৃতিস্থতারই পরিচয় দেয়, বিকৃতির নয়। পরিবেষ্টনের সঙ্গে প্রেমের যোগ না থাকলে জীবন দুঃখময় হয়ে ওঠে—এ কথা সত্য। কিন্তু যে কোন মূল্যে পরিবেষ্টনের প্রেম কিনতে হবে এমন কোন কথা হতে পারে না পরিবেষ্টনটি যেখানে নির্বোধ, নিষ্ঠুর ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সেখানে তার সঙ্গে সহানু-ভূতিশীল না হওয়াই ভালো। কেননা তাতেই মনের জোরের পরিচয় দেওয়া হয়—আর মনের জোর ছাড়া সত্যকার সার্থকতা লাভ করা যায় না। গ্যালিলিও ও কেপ্‌লারকে তাদের যুগে 'মারাত্মক ভাবের ভাবুক' মনে করা হতো, একালের বুদ্ধিমান তরুণদেরও তাই মনে করা হয়। তাই বলে তারা সত্য সত্য মন্দ একথা কেউ বলবে না। সমাজের সমস্ত কিছুই নির্বিচারে মেনে নিতে হবে, সামাজি-কতাবোধ যেন এতো বেশী না হয়। সমাজকে একান্তভাবে মানা অথবা অকারণ অবজ্ঞা করা, উভয়ই অন্যায়। কেননা, তাদের একটা ভীরুতার আর একটা বোকামির পরিচায়ক। সামাজিক শত্রুতার মাত্রা যাতে বেড়ে না যায়, সে দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। আবার সাবধানতা যাতে ভীরুতার নামান্তর না হয় সেদিকেও নজর রাখা প্রয়োজনীয়।

আধুনিককালে এ সমস্যার উদ্রেক হয় যৌবনে। যে লোকটি ঠিক পরিবেশে ঠিক কাজটি পেয়েছে, সে প্রায়ই সামাজিক নির্যাতন এড়িয়ে যেতে পারে। যে পায়নি তার নির্যাতনের অন্ত থাকে না। মুশকিল এই যে, যে ব্যাপারে সাধারণের রায় দেবার কোন অধিকারই নেই, সে ব্যাপারেও তারা রায় দিতে এগিয়ে আসে এবং তরুণদের বিকাশোন্মুখ জীবনে সজীবতা ও নতুনত্বের আভাস দেখলে তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিতে চায়। বয়সের দাবীতে তারা তরুণদের ওপর কর্তৃত্ব চালায়। ফলে, জীবন হয়ে উঠে দুর্বিষহ, সমাজ হয়ে পরে গতিহীন—নিশ্চল। যারা শেষ পর্যন্ত সামাজিক নির্যাতনকে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়, অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বনের ফলে তারাও নিবীর্য ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে। তাদের জীবনে সৃজনীশক্তি যায় নষ্ট হয়ে এবং তাদের দ্বারা জগতের কোন উপকার হয় না। একটা সুখ-দায়ী মতবাদ আছে যে, প্রতিভা যে করেই হোক, নিজের পথ করে চলবে, কেউ তাকে দমাতে পারবে না। বাধা দিলে তার শক্তি বাড়বে বৈ কমবে না। এই মতবাদের জোরেই অনেকে মনে করে ঃ নির্যাতন তরুণদের প্রতিভা বিকাশে বাধা দিতে পারে না, বরং তাদের প্রতিভার পরখ হিসেবেই কাজ করে। কিন্তু এই মতবাদে কিছুতেই আস্থা স্থাপন করা যায় না। 'খুন কখনো গোপন থাকতে পারে না'— "পাপের ঢাক আপনি বাজে'—নীতির মতো এ নীতিও অবিশ্বাস্য। সত্য বটে আমাদের জানা মতে যত খুন হয়েছে তার কোনটাই অনা-বিষ্কৃত থাকেনি, কিন্তু কত খুন যে আমাদের জানার বাইরে রয়ে গেছে, তা কে বলবে। তেমনি যে সকল প্রতিভাবানের খবর আমরা রাখি, তাদের প্রত্যেকেই হয়তো সমাজের প্রতিকূলতাকে পরাজিত করে এগিয়ে এসেছে, কিন্তু কত প্রতিভাবান যে বাধার কাছে পরাজয় মেনে অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে গেছে, তা কেউ বলতে পারে না। শিলা-বৃষ্টিকে এড়িয়ে যে সকল মুকুল ফুল, ফুল ফল হলো আমরা তো তাদের দেখলুম ; কিন্তু কত মুকুল কত ফুল যে শিলার আঘাতে ছিন্ন-

ভিন্ন হয়ে গেলো তার খবর রাখে কে ? তা ছাড়া কেবল প্রতিভার কথা ভাবলেই তো চলবে না, গুণীর কথাও ভাবা দরকার। সমাজে তাদের প্রয়োজনও কম নয়। প্রতিভান প্রতিকূলতাকে এড়িয়ে চলতে সক্ষম হলেও গুণীর পক্ষে তো তা সম্ভব হয় না। আর প্রতিকূললতাকে ব্যর্থ করে দিয়ে কোন প্রকারে টিকে থাকলেই সার্থক বাঁচা হয় না- অতিক্ত, অবিরক্ত মেজাজ নিয়ে বেঁচে থাকা চাই। তাই তরুণ বয়সের চলার পথটি যাতে অমসৃণ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

এদিকে দৃষ্টি রেখে একটি কথা বলার আবশ্যকতা বোধ করছি। তরুণদের আশা-আকাঙক্ষার প্রতি বৃদ্ধদের যতটা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হওয়া দরকার, বৃদ্ধদের আশা-আকাঙক্ষার প্রতি তরুণদের ততটা শ্রদ্ধাসম্পন্ন না হলেও চলে। কেকনা বুড়োদের চেয়ে তরুণদের জীবনের মূল্যই অধিক। পৃথিবী তাদেরই জন্য। তার মানে এই নয় যে, তরুণরা বুড়োদের উপর জবরদস্তি চালাতে পারবে—বিধবা অথবা বিপত্নীকরা যদি পুনবার বিয়ে করতে চায় তো তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে, তা নয়। তরুণদের বেলা হোক, বৃদ্ধদের বেলা হোক, অন্যায় অন্যায়ই— জবরদস্তিকে কেউ সমর্থন করতে পারে না। বৃদ্ধ ও তরুণ উভয়েরই নিজের ইচ্ছা মতো কাজ করার ক্ষমতা থাকা দরকার। নইলে সমাজে প্রাণদৈন্যের অবধি থাকবে না—জীবন বিস্বাদ হয়ে উঠবে। প্রাণপ্রদায়ী ব্যাপারে—যেমন বিয়ে বৃত্তিনিরূপণ ও বন্ধু-নির্বাচন প্রভৃতি বিষয়ে তরুণরা যদি বৃদ্ধদের উপদেশ মেনে চলে তো ভুল করবে। যে-জাতির তরুণদের এসব স্বাধীনতা নেই সে জাতি মৃত- তার কাছ থেকে দুনিয়া কিছু আশা করতে পারে না। সে পৃথিবীর বোঝা স্বরূপ। মনে করুন নটের পেশা আপনার মনঃপুত ; সে দিকেই আপনার প্রতিভা সহজ পথ খুঁজে পাবে বলে আপনার বিশ্বাস। কিন্তু আপনার গুরুজনরা তা পছন্দ করেন না। তাঁদের কাছে তা হয় নীতির দিক দিয়ে মন্দ, নয় সামাজিকতার দিক

দিয়ে নিম্নস্তরের। তাই তা থেকে বিরত করবার জন্য যত রকম চাপ সম্ভব তাঁরা আপনাকে দেবেন। হয়, 'আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেলে আমরা তোমার সম্পর্ক ছিন্ন করবো' বলে তাঁরা আপনাকে শাসাবেন, নয়, 'কিছুদিনের মধ্যেই তুমি তোমার একগুঁয়েমির জন্য অনুতপ্ত হবে' বলে আপনাকে ভয় দেখাবেন। নানাভাবেই তাঁরা আপনাকে হতোদ্যম করবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু আপনাকে দমলে চলবে না। হয়তো একথা ঠিক যে, আপনার গলার স্বর খারাপ, অভিনয়ের প্রতিভা আপনার নেই। তাহলেও থিয়েটারে যোগ দিয়ে উপযুক্ত লোকের কাছ থেকেই জানা ভালো, অনুপযুক্ত লোকের কথায় কান পাতা ঠিক নয়। সময়ের অপব্যয়ের কথা বলবেন, জানি। কিন্তু চিন্তার কারণ নেই, এর পরেও বহু সময় হাতে থাকবে। একেবারে নির্ভুল জীবনযাপনের চেষ্টা ভালো নয়। প্রাণশক্তির অভাব ঘটে বলে তাতে জীবনে মর্চে পড়ে। অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের কথায়ই আপনাকে কান পাততে হবে অনভিজ্ঞ মুরব্বিদের কথায় নয়। আপনি আপনার পথটি অনুসরণ করে চললে মুরব্বিরা একদিন-না-একদিন আপনাকে সমর্থন করবেনই—আপনি যত দেরীতে ভাবছেন তার বহু পূর্বেই। সুতরাং মুরব্বিদের নিষেধের কথা ভেবে নিজকে না-হক বিচলিত করবেন না। (আপনি কি জানেন না, সমাজ-মরু সব সময়েই প্রতিভা-তরুর রস নিঃশেষে শুষে নিতে চায়? যখন পারে না, যখন শতনির্যাতন সত্ত্বেও তরুটি ফুল ফোটায়, তখনি সে বলে ওঠে: দেখ, দেখ, কেমন ফুল ফুটিয়েছি। যেন এই ফুল ফুটানোর ব্যাপারে, তরুর নয়, তারি বাহাদুরী।) আপনি যে পথে চলতে চেয়েছিলেন নিশ্চিত মনে সে পথেই চলুন। দেখবেন সার্থক হলে পরিবারের লোকেরা আপনাকে গলার মালা করেই রাখবে। সার্থক না হলে অবশ্য আলাদা কথা।

[সার্থক না হলেই যে আপনার জীবন বরবাদ গেলো তা নয়। বরং আপনার মতো ব্যর্থ লোকেরাই সমাজকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

যে সমাজ যত ব্যর্থ লোকের বাস, সে সমাজ তত ধনী। কেননা ব্যর্থতার কথাই সাধনার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। ব্যর্থ লোকের সংখ্যা কম হলেই সমাজ ব্যর্থ হয়—বেশী হলে নয়। বাংলার মুসলমান সমাজের দিকে তাকালেই কথাটার তাৎপর্য উপলব্ধ হবে। এ সমাজে যে ব্যর্থ লোকের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য, সেকথা কেউই অস্বীকার করবে না। আপনি কি বলবেন জানিনে, আমি দু'চারটির বেশী দেখতে পাইনে। আপনি হয়তা বলবেন : কি বললেন? বাংলার মুসলমান সমাজে ব্যর্থ লোক নেই? থাকলেও দু'চারটি? হায় আল্লা! আপনি অন্ধ, একেবারেই অন্ধ। আর আপনার অন্ধতার গোড়ায় রয়েছে আপনার রোমান্‌টিসিজিম্। রোমান্‌সিজিমের হিপ্‌নো-টিজমে মুগ্ধ হয়ে আছেন বলেই আপনি বাস্তবকে দেখতে পাচ্ছেন না। নইলে বলেন বাংলার মুসলমান সমাজে ব্যর্থ লোক নেই, থাকলেও দু'চারটি? না, আপনার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। আপনি একেবারে অবাস্তব। নইলে গরীবদের হাহাকারের কথা, আশান্বিত কর্মচারীদের নিরাশ হওয়ার কথা নিশ্চয়ই জানতেন। কতো লেকচারার প্রফেসার, কতো প্রফেসার যে প্রিন্সিপাল, কতো প্রিন্সিপাল যে ডাইরেক্টর বাহাদুর হলেন না, তার খবর রাখেন কি? রাখলে বাংলার মুসলমান সমাজে ব্যর্থ লোক নেই, এমন কথা কখনো মুখে আনতেন না। চারদিকে যেখানে ব্যর্থতা ছড়ানো সেখানে ব্যর্থ লোক দেখতে না পাওয়ার মতো অন্ধতা আর কী হতে পারে?

আমি বলবো : আপনি যে ব্যর্থতার কথা বলছেন সে ব্যর্থতার প্রতি আমার দৃষ্টি নেই। পাকিস্তান হওয়ার পরে যেসব ডেপুটি, ম্যাজিষ্ট্রেট; যেসব ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার এবং কমিশনার গভর্ণর না হতে পেরে চোখের পানিতে বুক ভাসাচ্ছেন, আমি তাঁদের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল। খোদা তাঁদের শান্তি দিন। কিন্তু আমি তাঁদের ব্যর্থতার কথা বলছিনে। আমি বলছি, সাধনার

ব্যর্থতার কথা। Say not the struggle naught availeth. সাধনা বাইরের দিকে ব্যর্থ হলেও ভেতরের দিকে কোনদিন ব্যর্থ হয় না। বামন হয়ে যারা চাঁদের দিকে হাত বাড়ায়—চাঁদের আলো তাদের চিত্তে কিছুটা-না-কিছুটা লেগে থাকেই। যারা একটা বড় জিনিস চেয়ে ব্যর্থ হয়, তাদের অন্তরে সেই বড় জিনিসের ছাপ না থেকে পারে না। ছোট ব্যাপারে সার্থকতার চেয়ে বড় ব্যাপারে ব্যর্থতা অনেক ভালো। তাতে করে মানুষটি বড় হয়—তার ভেতরের কালিমা-কলুষ দূর হয়ে সে উজ্জ্বল ও সুন্দর হয়ে ওঠে। এই ধরনের সুন্দর মানুষের সংস্পর্শে এসেই সমাজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এগিয়ে যায়। তাই বলেছি, যে সমাজে যত ব্যর্থ লোক বাস করে সে সমাজ তত ধনী। (যে বনে যত বেশী ঝরাফুল, সে বনে তত বেশী বসন্ত এসেছে মনে করতে হবে।) ব্যর্থ লোকের সংখ্যা বাড়ার মানে কি? যারা সৌন্দর্যকে কামনা করে তাদের সংখ্যা বাড়া, যারা প্রেমকে কামনা করে তাদের সংখ্যা বাড়া, যারা সত্যকে কামনা করে তাদের সংখ্যা বাড়া। এক কথায় যারা সংস্কৃতিকে কামনা করে তাদের সংখ্যা বাড়া।

সাধনার দ্বারা সোনা হতে চেয়ে যদি আপনি ব্যর্থকাম হন, তো তাতে দুঃখের কিছুই নেই। কেননা, সোনা না হলেও আপনি কষ্টিপাথর হবেনই। আর কষ্টিপাথর হওয়াও কম নয়। কষ্টিপাথর হওয়ার দরুন সোনা কি চিজ্ তা আপনি সহজেই বলতে পারবেন। তাই সভ্যতার ব্যাপারে আপনার মূল্য অনেক—এমন কি প্রতিভাবানের চেয়েও বেশী। বেল সাহেব যখন বলেন: সভ্যতা প্রতিভার সৃষ্টি নয়, সমঝদারির সৃষ্টি, তখন ঠিকই বলেন। যে সমাজে সমঝদার যত বেশী সে সমাজ তত বেশী সভ্য। সমঝদারির মানে মূল্যবোধ। মূল্য সৃষ্টি করলেও সব প্রতিভাবান মূল্যবোধের পরিচয় দেন না। আর্ট সৃষ্টি করলেও অনেক সময় তাঁরা নিজেরা অনাচারই থেকে যান আর্ট হন না। তাঁদের রচনার পশ্চাতে থাকে

একটা অন্ধ প্রেরণা চক্ষুষ্মান প্রচেষ্টা নয়। সমঝদারের বেলা কিন্তু বড় হয়ে ওঠে চক্ষুষ্মান প্রয়াস। প্রতিভাবান এক তরফা, এক ঝোঁকা, সমঝদার বহুভঙ্গিম। বহু প্রতিভাকে হজম করেই সমঝদার সমঝদার। সে স্রষ্টা না হলেও ভোক্তা, ভোজ্য দ্রব্যের মূল্য সম্বন্ধে সচেতন। প্রতিভাবানের অনেক সময়েই সে চেতনা থাকে না। কাজেই প্রতিভার প্রকাশ করতে গিয়ে যদি আপনি ব্যর্থ হন তো তাতে বিশেষ দুঃখ নেই। কেননা পরিণামে আপনি সমঝদার হবেন। আর সমঝদার হলেই সমাজের লাভ।]

ছোট বড় সমস্ত ব্যাপারে অনভিজ্ঞ লোকদের মতামতের ওপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। তা কিন্তু ঠিক নয়। কেননা, তাতে মনের সজীবতা নষ্ট হয়ে যায়। আর মনের সজীবতা নষ্ট হয়ে গেলে জীবন দীন হয়ে পড়ে। যতটুকু না হলে গ্রাসাচ্ছাদন সম্ভব হয় না জনমতকে যেন ততটুকু ভয় করা হয়, তার বেশী নয়। তার বেশী করলে তা আত্মপীড়নেরই শামিল হয়ে পড়বে। খরচের ব্যাপারটা ধরা যাক। প্রশংসার দিকে দৃষ্টি থাকে বলে—বহু লোক খরচ করে পরের রুচির দিকে তাকিয়ে। তাদের রুচি হয়তো ভ্রমণে অথবা একখানা সুন্দর লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার দিকে। কিন্তু প্রশংসার তাগিদে সে দিকে না গিয়ে তাদের রুচি যায় ভোজন-আপ্যায়ন ও মোটর কেনার দিকে। কিন্তু তারা ভুল করে। জনসাধারণের রুচির দিকে না তাকিয়ে তারা যদি নিজের রুচির দিকেই তাকায় তো পরিণামে বেশী বৈ কম তারিফ পায় না। তবে তা একটু সময় সাপেক্ষ, এই যা। জনসাধারণের রুচিকে ইচ্ছে করে অবজ্ঞা করতে বলছিনে। তা-ও খারাপ। কেননা তাতে এক হিসেবে তাদের রুচিকে মেনে নেওয়াই হয়। ইচ্ছা করে বা জোর করে নয় সহজভাবে গণ-রুচির প্রতি উদাসীন হতে পারলে, তাতে শক্তি ও সাহস উভয়ই বাড়ে। যে সমাজের লোকেরা প্রচলিত মতবিশ্বাসের গোলাম নয়, সে সমাজে বৈচিত্র্যের স্বাদ পাওয়া যায়, একাচারী বা একত্ববাদী

সমাজের মতো তা একঘেয়ে ও নিরানন্দ নয়। যেখানে প্রতিটি মানুষ নিজস্ব প্রকৃতি-অনুযায়ী বিকশিত, সেখানে বৈচিত্র্য তথা জীবনের স্বাদ বজায় থাকে বলে নূতনত্বের অভাব ঘটে না। মানুষ সেখানে জীবন্ত, স্বতঃস্ফূর্ত একজন—আরেকজনের প্রতিলিপি মাত্র নয়। আভিজাত্যের সুবিধা এই ছিল যে, সেখানে মর্যাদা জন্মের ওপর নির্ভরশীল বলে লোকেরা যে-কোন প্রকারের জীবন-ভঙ্গি গ্রহণ করতে পারতো। নিত্যনূতন পথে চলে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে তাদের বাধতো না। আধুনিককালের এই মুক্তির স্বাদ থেকে মানুষ দিন দিন বঞ্চিত হচ্ছে। দলবদ্ধতার অভিশাপে মানুষ জীবনের বহুভঙ্গিমতাকে হারিয়ে বসেছে। তাই একঘেয়েমির ভয়ংকরতা সম্বন্ধে যত শীঘ্র সচেতন হওয়া যায় ততই ভালো। নইলে তার অত্যাচারে জগৎ অনাবাসযোগ্য হয়ে উঠবে। মানুষ ইচ্ছে করে উৎকেন্দ্রতার পরিচয় দিক, এমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কেননা, তা-ও হবে প্রচলিত নীতিকে মেনে চলার মত নিরানন্দ ও বিস্বাদ। আমি এই বলতে চাই যে, চ্যালেঞ্জের ভাব না দেখিয়ে মানুষ সহজ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের রুচির অনুসরণ করে চলুক। একান্তভাবে সমাজ-বিরুদ্ধতার পরিচয় না দিলে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। বৈচিত্র্য রক্ষা করে সমাজকে আবাসযোগ্য রাখবার এ-ই উপায়।

পূর্বে যেমন নিকটবর্তী প্রতিবেশীর ইচ্ছার প্রতি না তাকালে চলতো না এখন আর তা নয়। এখন মানুষ 'নিকটকে 'অবজ্ঞা করে 'দূরের' পিয়াসী হতে শিখেছে।

কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই ;
'দূরকে করিলে নিকট বন্ধু,
'পরকে করিলে ভাই।

দ্রুতগামী যান আবিষ্কারের ফলে দূর এখন আর দূর নেই, নিকট—পর, পর নেই, আপন। যাদের মোটরগাড়ী আছে তারা বিশ মাইলের মধ্যে যে-কোন লোককে বন্ধু তথা প্রতিবেশী হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। তাই পূর্বের লোকদের তুলনায় তাদের সঙ্গী নির্বাচনের সুযোগ ও সুবিধা অনেক বেশী। অবস্থার চাপে পড়ে এখন আর যে-কোন লোককে সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করতে হয় না। নির্বাচনের সুযোগ সহজেই পাওয়া যায়। বিশ মাইলের মধ্যে যে-লোকটি সহ-মর্মী খুঁজে পায়না তাকে দুর্ভাগাই বলতে হবে। 'নিকটবর্তী প্রতিবেশীর খোঁজ না নেওয়া অন্যায়'—ছোট শহরে টিকে থাকলেও, বড় শহরে এ নীতির মৃত্যু হয়েছে। এখন লোকেরা সঙ্গী নির্বাচন করে রুচির সমতার দিকে তাকিয়ে, বাসস্থানের নৈকট্যের দিকে তাকিয়ে নয়। সমান রুচি ও সমান মতের মানুষের সঙ্গে মিশলে যে আনন্দ পাওয়া যায়, অপরের সঙ্গে থেকে সে আনন্দ পাওয়া যায় না। রুচি, বুদ্ধি ও অনুভূতির সার্থকতার দিকে তাকাতে হয় বলে একালে বন্ধু নির্বাচন একটা ক্রিয়েটিভ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবস্থার চক্রান্তে যাকে সামনে পেলাম তাকেই বন্ধু বলে গ্রহণ করলাম, এই নীতি হালে অচল। সামাজিকতার আদান-প্রদান এ পথেই চলা উচিত। নইলে সংস্কার মুক্তির ফলে যে সকল মানুষ নিঃসঙ্গতার দুঃখ পাচ্ছে, তাদের সে দুঃখের অবসান হবে না। অবশ্য এর মন্দ দিকও আছে। তাতে সংস্কার-মুক্তদের সুখ বাড়ালেও সংস্কারাচ্ছন্নদের সুখ কমবে। সংস্কার-মুক্তদের দমিয়ে দেওয়ার অধিকার থেকে তারা যে সুখ পেয়ে থাকে, তা হতে তারা বঞ্চিত হবে। কিন্তু তাতে আফসোস করার কিছুই নেই। নির্যাতনজাত এই সুখের যত শীঘ্র অবসান হয়, ততই মঙ্গল।

অন্যান্য ভয়ের মতো জনমতের ভয়ও দুঃখদায়ী এবং বিকাশের পরিপন্থী। এ-ধরণের ভয় যেখানে প্রবলমূর্তিতে দেখা দেয়

সেখানে মহত্ত্বের মুখ দেখা সম্ভব হয় না। ভীতিগ্রস্ত জীবন-যাপনের দরুন মানুষ সেখানে দিন দিন ক্ষুদ্র ও নিবীর্য হতে থাকে। যে আত্মিক স্বাধীনতা সত্যকার সুখের মূল, অতিরিক্ত জনমতের ভয় তার সর্বনাশ সাধন করে। সুখ হচ্ছে গভীর আভ্যন্তর-প্রেরণা সঞ্জাত অভিব্যক্তির ফল। অপরের রুচি ও বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে চল্‌লে তা পাওয়া যায় না। [তাতে নিরাপদ হওয়া যায়, দুঃখও এড়ানো যায়, কিন্তু সুখ মিলে না। সুখী ক্লীব নয়, শক্তিমান,—জড়তা-বিজয়ের নিশান তার হাতে। তাই দুঃখকে এড়িয়ে নয়, অনেক সময় দুঃখ-বিপদের ভেতর দিয়ে গিয়েই সুখকে পেতে হয়। কবির মুখে তাই শুনতে পাই :

আঘাত আছে, জানি আপদ আছে,
তাই জেনে তো বক্ষে পরাণ নাচে।]

আসল কথা হচ্ছে : সৃজনী শক্তির অভিব্যক্তির জন্য যে আত্মিক মুক্তি প্রয়োজনীয় তার উপস্থিতি চাই, নইলে জীবন দীন ও অসার্থক হয়ে পড়ে। নব নব দানে জগতকে ঋণী করার ক্ষমতা তার আর থাকে না।

নিকটবর্তী প্রতিবেশীর চোখরাঙানী থেকে অবশ্য আমরা অনেকটা মুক্ত হয়েছি, কিন্তু আর একটা নতুন ভয় আমাদের মাথার ওপর খাঁড়ার মতো ঝুলছে। সেটা হচ্ছে সংবাদপত্রের মতামতের ভয়। মধ্যযুগের 'ডাইনী শিকারের' চেয়ে এটা কম ভয়ংকর নয়। সংবাদপত্র ইচ্ছে করলে যে-কোন মানুষের ঘাড়ে অপরাধের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তাকে নাজেহাল করতে পারে। সৌভাগ্যবশতঃ প্রধানরাই এর আলোচনার পাত্র হন, অপ্রধানরা দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। কিন্তু এমন দিন হয়তো আসবে যখন প্রচারের উৎকর্ষের ফলে সাধারণ মানুষটিও এর আলোচনার বাইরে

থাকবে না। সেদিন মানুষের দুর্দিন। উৎপীড়নের এই নতুন যন্ত্রটি সেদিন ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলকে আঘাত করতে থাকবে। এ এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ব্যক্তি স্বাধীনতাকামী মানুষ মাত্রেই যার সম্বন্ধে হুঁশিয়ার না হয়ে পারে না। সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকামী 'মহৎ নীতি' সম্বন্ধে যা-ই বলা হোক না কেন, তার সীমারেখা এমনভাবে নির্ধারিত হওয়া উচিত যাতে নিরীহ ব্যক্তিরা তার নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পেতে পারে। নইলে মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠবে। এমন ছোটখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতি মানুষের জীবনে থাকেই, ঈর্ষামূলক প্রচার না হলে সমাজ যায় কোন খবরই রাখে না। সংবাদপত্র যাতে সব সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে ঘাটাঘাটি না করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার।) পরপীনের এই দুষ্ট প্রবৃত্তির দাওয়াই হচ্ছে সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি, আর সহিষ্ণুতা বৃদ্ধির উপায় এমন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি যারা সত্য সত্যই সুখী। সত্যকার সুখের স্বাদ যারা পেয়েছে, পর-পীড়নকে তারা হারাম বলেই জেনেছে। নীতির খাতিরে নয়, সুখের খাতিরেই তারা পরপীড়নের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় খণ্ড : সুখের কারণ

সুখের কথা

[যাঁদের অন্নসংস্থান নেই তাঁরা যেন লেখাটা না পড়েন। আর যে-সব চিন্তাশীলদের মতে বর্তমানে অন্নসংস্থানের চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তা থাকা উচিত নয়, তাদের জন্যও রচনাটা নিষিদ্ধ।]

বন্ধুদের আলাপ ও রচনা থেকে আমার এই প্রতীতি জন্মেছে যে, তাঁরা এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন: বর্তমান দুনিয়ায় সুখ অসম্ভব! কিন্তু তা সত্য নয়। বিদেশ ভ্রমণ মনন এবং আমার উদ্যানরক্ষকের সঙ্গে সংলাপ আমাকে শিখিয়েছে যে, জগতে সুখী হওয়া যায় এবং সুখী হওয়ার কায়দাটি হচ্ছে বাইরের দিকে তাকানো, আর নিজের শক্তির স্বাদ গ্রহণ। পূর্বের একটি পরিচ্ছেদে (দুঃখবাদ) আমি আমার সাহিত্যিক বন্ধুদের দুঃখ নিয়ে আলোচনা করেছি। এখানে আলোচনা করব সুখী মানুষের দুঃখ নিয়ে। জীবনের চলার পথে যে-সব সুখী মানুষের সাক্ষাৎ আমি পেয়েছি, বর্তমান প্রবন্ধে তারাই হবে আমার আলোচনার উপজীব্য।

সুখ দু'প্রকারের: শারীরিক ও মানসিক অথবা সহজ ও মস্তিষ্কজাত। শারীরিক অথবা সহজ-সুখের অংশীদার সকলেই। মানসিক বা মস্তিষ্কজাত সুখের অধিকারী কেবল শিক্ষিত সম্প্রদায়; অশিক্ষিতরা তার স্বাদ থেকে বঞ্চিত! ছেলে বয়সে আমি এমন একটা লোককে জানতুম যে অনবরত খুশীতে ফেটে পড়তে চাইতো। অনবদ্য স্বাস্থ্যের অধিকারী এই লোকটির ব্যবসা ছিল কূপ খনন। শিক্ষা তার ছিল না, পার্লামেন্ট কাকে বলে সে জানতো না। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে যখন সে ভোটের ক্ষমতা লাভ করে, তখনি পার্লামেন্ট কথাটির সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় ঘটে। এই লোকটির

যে সুখ তা সহজ-সুখ, মানসিক সুখ নয়। মস্তিষ্ক চালনার ফলে যে চিন্তা ও বিশ্বাসের জন্ম হয়, এই সুখের গোড়ায় তা নেই। এ হচ্ছে শারীরিক শক্তি-উপলব্ধির উল্লাস। সে দেখতে পেতো বড়ো বড়ো পাথরের বাধা তাকে দমাতে পারে না, বরং পাথরই শেষ পর্যন্ত তার কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়। তখন গর্বে আনন্দে তার মন গেয়ে উঠতো: জয়ী, আমি জয়ী, বাধার পাহাড় সব অপসারিত হল, কী আনন্দ! এই দেখ, মাটির তলা থেকে কেমন জলধারা বেরিয়ে আসছে; ওতো আমারই সৃষ্টি; বন্দিনী বারি-ধারা মুক্তি পেলো আমারি কৃপায়। আমি ধন্য।

'আমার উদ্যানরক্ষকের সুখটিও এ জাতের। শশক তার শত্রু। শত্রুর বিরুদ্ধে সার্থক অভিযান চালিয়ে যেমন আনন্দ পাওয়া যায়, শশকের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েও সে তেমনি সুখ পায়। বহু যুদ্ধজয়ী সেকান্দরের সুখ আর তার সুখে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। স্কটল্যাণ্ড-ইয়ার্ড'রা বলসেভিকদের কথা যে ভঙ্গিতে বলে খুশী হয়ে ওঠে, আমার উদ্যানরক্ষকও শশকদের কথা সে ভঙ্গিতে প্রকাশ করে একটা জয়ের আনন্দ উপভোগ করে। ধূর্ত, পাজী ও ভয়ংকর শশকদের জয় করবার ক্ষমতা তো একমাত্র তারি আছে আর কারো নেই—একথা বলে কী তার উল্লাস! শত্রুর শক্তি বাড়িয়ে সে নিজেরই গৌরব বাড়ায়। বয়স তার সত্তরের উপর; সারাদিন খাটে, রোজ পাহাড়ী পথে কমসে-কম ষোল মাইল সাইকেল চালায়। তা সত্ত্বেও তার ফুর্তির কমতি নেই। আর সে ফূর্তি যোগায় সেই ধূর্ত পাজী শশক শালারা।

আপনি বলবেন: ও-কথা শুনে কী লাভ? ও ধরনের সুখ তো আপনাদের মতো উচ্চশ্রেণীর লোকদের জন্য নয়। শশকের মতো ক্ষুদ্র প্রাণীর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে আমরা আর কী সুখ পেতে পারি? কিন্তু এ উক্তির তেমন কোনো মূল্য আছে বলে মনে হয় না। পীতজ্বরের জীবাণু নিশ্চয়ই শশকের চেয়েও ক্ষুদ্র;

তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে কিন্তু ডাক্তাররা বেশ সুখ পায়। প্রশ্নটি আসলে ক্ষুদ্রবৃহতের নয়, শত্রুমিত্রের। শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে তো সকলেই সুখ পায়—সে শত্রু ছোটই হোক আর বড়োই হোক। আমি এই বলতে চাই যে, আমার মালীর সুখের মতো সুখ উচ্চশ্রেণীর লোকেরাও কামনা করতে পারে! শিক্ষাভিমানী হয়ে ও সুখকে পর করতে গেলে ভুল করা হবে। এখানে শিক্ষিত আর অশিক্ষিতের মধ্যে পার্থক্যটা হবে উপরের ব্যাপারে, লক্ষ্যের ব্যাপারে নয়। অন্যভাবে বলতে গেলে, উভয়ের মধ্যে আবেগের সমতা থাকলেও বুদ্ধির সমতা থাকবে না। আমার মালীর উদ্দেশ্য শত্রু তাড়ানো, তার শত্রু শশক। ডাক্তার সাহেবদের উদ্দেশ্য দুষমন খেদানো, তাদের দুষমন জীবাণু। শশক তাড়ানোর মতো জীবাণু তাড়ানোটা অত সহজ ব্যাপার নয়। বেহেড লোকদের পক্ষে সেখানে দাঁত ফোটানো কঠিন। শশক তাড়ানোর জন্যও বুদ্ধির প্রয়োজন, কিন্তু জীবাণু ধ্বংসের বুদ্ধি তার চেয়ে অনেক জটিল বলে অধিক আনন্দকরও।

গোড়াতেই যদি কাজটি সোজা মনে হয় তো তাতে আর জয়ের আনন্দ পাওয়া যায় না। লাফিয়েরা যখন অবলীলাক্রমে নীচের ধাপগুলি পেরিয়ে যায় তখন তারা কি দর্শকরা কেউই আনন্দ পায় না। বাধার তুঙ্গতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের মাত্রাও বাড়তে থাকে। এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার। আনন্দলাভের গুহ্য রহস্যটি হচ্ছে নিজের সম্বন্ধে খুব উঁচু ধারণা পোষণ না করা। করলে চোখের জলে নাকের জলে এক হতে হবে। হয়নি হয়নি, আমার মনের মতো কিছুই হয়নি: আমি কি এই চেয়েছিলাম? হায়রে আমার কপাল, এ তো আমার স্বপ্ন নয়, স্বপ্নের কংকাল—একথা বলে কান্না জুড়ে দেওয়া হবে আমাদের ভাগ্য। নিজের সম্বন্ধে যারা খুব উঁচু ধারণা পোষণ করে না, সুখের বর পায় তারাই। প্রতি সৃষ্টি তাদের জন্য নিয়ে আসে সার্থক উল্লাস।

বিস্মিত হয় উভয়েই। তবে বিস্ময়ে বিস্ময়ে পার্থক্য থাকে। একজন বিস্মিত হয় নিজের অসার্থকতা দেখে, আরেকজন সার্থকতার উপলব্ধিতে।

আপনি বলবেন: প্রতি কাজেই সফলতা বোধ করে যদি খুশী হয়ে যাই তো উন্নতি হবে কী করে? উন্নতির জন্য তো অতৃপ্তি দরকার।—কথাটা ফেলনা নয়। উন্নতির খাতিরে ভেতরে একটু অতৃপ্তি রাখা ভালো, কিন্তু মাত্রাধিক্য ঘটলেই বিপদ। তাহলে সুখ নষ্ট হয়ে যায়, আর সুখ নষ্ট হলে কর্মশক্তিও হ্রাস পেতে থাকে। তখন সার্থকতা কি উন্নতি কোনোটাই পাওয়া যায় না। তাই বলে যে, নিজেকে খুব নীচ ভাববেন তাও নয়। মাঝামাঝি অবস্থায় থাকাই ভালো। কেননা সেটাই স্বাভাবিক। হীনমন্যতা কি মহৎমন্যতা দুটাই বিকৃতি।

[একটি লোককে জানি, তরুণ বয়সে তিনি কবিতা লিখতেন। কিন্তু উঁচু নাকের লোক ছিলেন বলে কবিতা লিখে খুশী হতে পারতেন না; ভাবতেন: না, কবিতাগুলো তো আমার উপযুক্ত হয়নি; আমার কবিতা আরো ভালো আরো উচ্চাঙ্গের হওয়া উচিত।—কিন্তু নাক উঁচু হলে যে, কবিতাও উঁচু হবে এমন কোনো কথা তো নেই। তাই অতৃপ্তিতে ভুগে ভুগে তিনি শেষ পর্যন্ত কবিতা লেখাটাই ছেড়ে দিলেন। তাতে তাঁর ক্ষতিই হল। কবিতা লেখা ছেড়ে দেওয়ায় একটা সুখের উপায় থেকে তিনি বঞ্চিত হলেন। নাক উচানোর এই শাস্তি। নিজের কাছ থেকে একটা অসম্ভব কিছু প্রত্যাশা না করে যদি তিনি অনবরত কবিতা লিখে যেতেন তো আর কিছু না হোক কবিতা রচনার সুখ পেতেন। আর এই দুঃখের সংসারে সুখ পাওয়াটাই একটা মস্ত লাভ। বড় কিছু লিখব, এই প্রতিজ্ঞা করে বসলে শেষ পর্যন্ত হয়তো কিছুই লেখা হয় না। বড় লেখকরাও যে লেখার জগতে খেলার মন নিয়ে আসেন, বড় কিছু সৃষ্টির প্রতিজ্ঞা নিয়ে নয়,

তার প্রমাণ তাঁদের অসংখ্য বাজে রচনা। সাধারণ মানুষকে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন আল্লার প্রাচুর্যের নিদর্শন; রবীন্দ্রনাথের বেলাও তাঁর বাজে রচনাগুলি তাই। তিনি যদি বড়ো কিছু সৃষ্টি করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে যাত্রা করতেন তো এতো প্রচুর লেখা রেখে যেতে পারতেন কি-না সন্দেহ। খেলার তাগিদে এসেছিলেন বলেই তা সম্ভব হয়েছে। তাই তাঁকে বলতে শুনি:

মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ
জানিস নে কি, ভাই।
তাই কাজকে কভু আমরা না ডরাই॥

'সাহিত্যে মানবাত্মা খেলা করে এবং সে খেলার আনন্দ উপভোগ করে'—প্রমথ চৌধুরীর এই উক্তিটা যদি আমাদের ভূতপূর্ব কবিটি মনে রাখতেন তো ভালো হত। তা হলে বড়ো কিছু সৃষ্টি করতে পারলেন না বলে তিনি আর কবিতা লেখাটা ছেড়ে দিতেন না। ফলে সৃষ্টির আনন্দ তিনি লাভ করতেন। বড়ো কিছু সৃষ্টির বাসনাটা আসলে বড়ো কিছু নয়, মোহ। লিখতে হবে আনন্দের তাগিদে, বড়ো কিছু সৃষ্টির আকাঙক্ষায় নয়। তা হলে ভেতরে বড়ো কিছু থাকলে আপনা-আপনিই বেরিয়ে আসবে। নইলে আর কিছু না হোক রচনায় একটা স্বচ্ছন্দ লীলার স্বাদ পাওয়া যাবেই।]

অধুনা শিক্ষিত লোকদের মধ্যে বিজ্ঞানীরাই সবচেয়ে বেশী সুখী। সরল প্রকৃতির লোক বলে নিজের কাজ থেকে তারা এমন একটা সহজ আনন্দ পায় যে, খাওয়া-দাওয়া ও বিয়ের মতো মামুলি ব্যাপারও তাদের কাছে সুখকর হয়ে ওঠে। একথা বলার একটা বিশেষ হেতু আছে। আজকাল শিল্পী-সাহিত্যিকরা আর ও-সব ব্যাপারে তেমন সুখ পায় না। না পাওয়াটাই ফ্যাশন। ও সব ব্যাপারে সুখ পায় তো অমার্জিত ছোট লোকেরা। সংস্কৃতি-

বানরা তা পেতে চাইবে কেন? তারা তো পান করবে 'দুঃখের আকাশ'; এমনি তাদের মনোভাব হয়ে দাঁড়ায়। বৈজ্ঞানিকরা কিন্তু অত খুঁতখুতেমির পরিচয় দেয় না। প্রাচীন পদ্ধতির গার্হস্থ্য সুখও তারা উপভোগ করে। কেননা, তাদের বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ অংশ তারা গবেষণাতেই প্রয়োগ করে মন নিয়ে নাড়াচাড়া করার কাজে নয়।

'মন-দেয়া-নেয়া করেছি অনেক
মরেছি হাজার মরণে,
নূপুরের মতো বেজেছি চরণে-চরণে।—

এ আফসোস কবি শিল্পীর, বৈজ্ঞানিকের নয়। বাড়ীতে ফেরে সে জটিলতামুক্ত শাদাশিদে মানুষ হিসেবেই। তাই শাদাশিদে মানুষরা যা ভোগ করে, তারাও তা ভোগ করে, সহজ ভোগ দেখে ঘৃণায় নাক কুঁচকায় না।

শুধু সহজ গার্হস্থ্য সুখই নয়, কৃতকার্যতার সুখও তারা পায়। প্রগতির বাহন বলে সকলেই তাকে সমীহ করে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা যত সহজে স্বীকৃতি পায়, শিল্প-সাহিত্য তত সহজে নয়। সে সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কেউ বলে ভালো, কেউবা মন্দ। বৈজ্ঞানিকদের কিন্তু এমন মানসিক দুঃখে ভুগতে হয় না। সে জন্য সে জটিলতামুক্ত। আবর্তের মতো জটিলতাও বাধার সৃষ্টি। বৈজ্ঞানিকের আবেগের পথে বাধা নেই বলে জটিলতাও নেই। চিন্তার জাল বুনে সেখানে মাকড়সার মতো বাস করা তার স্বভাব নয়। তার কাজ মন নিয়ে নয় বস্তু নিয়ে। তাই মনের বালাই থেকে সে মুক্ত।

সুখের সমস্ত শর্তগুলিই বিজ্ঞানীর জীবনে পাওয়া যায়। তার কাজ বুদ্ধির চূড়ান্ত প্রয়োগক্ষেত্র, আর তার অবদানে শুধু সে নিজেই নয়, সকলেই বিশ্বাসী। বুঝতে না পারলেও সকলেই

তার কাজের প্রশংসা করে। এদিক দিয়ে বিজ্ঞানী শিল্পীর চেয়ে অনেক ভাগ্যবান। কবিতা কি ছবি বুঝতে না পারলে লোকেরা ঠোঁট বাঁকাতে দ্বিধা করে না, ও ব্যাপারে রায় দেওয়ার অধিকার আছে কি নেই তা একবারও ভেবে দেখে না। বিজ্ঞানের বেলা কিন্তু এমনটি হয় না। আপেক্ষিক তত্ত্বটি বুঝতে না পারলে বিজ্ঞানী-দের দোষ না ধরে আমরা নিজেদের জ্ঞানহীনতার জন্যই আফ-সোস করি। তাই বৈজ্ঞানিকেরা হয় সম্মানিত আর শ্রেষ্ঠ শিল্পী সাহিত্যিকদেরও যাপন করতে হয় অবজ্ঞাত জীবন। কতিপয়ের শ্রদ্ধাই তারা পায়, বেশীর ভাগ লোকই করে অবজ্ঞা। এই অবজ্ঞাকে যারা অবজ্ঞা করে চলতে পারে সুখ জোটে সে সব বীরদেরই কপালে। কিন্তু ও ধরনের শক্তিমান শিল্পীর সংখ্যা আর কত—লাখে মিলে না এক। তাই দরকার হয় একটা ক্ষুদ্র গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত হয়ে বিশ্বকে এড়িয়ে চলার। কিন্তু সেটাও মারাত্মক। বিশ্বকে এড়িয়ে চলা আর নিজেকে বৃহৎ প্রাণের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত রাখা এক কথা। সকলেই শ্রদ্ধার নজরে দেখে বলে বিজ্ঞানীকে এমন সংকীর্ণ আবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হয় না। সেটাও তার দ্বন্দ্বহীনতার তথা দুঃখহীনতার একটা কারণ।

শিল্পীর জীবন কিন্তু এমন মসৃণ নয়। উভয় সংকটের মধ্যে তাকে বাস করতে হয়। জনসাধারণের রুচির দিকে তাকালে তাকে স্বীকার করতে হয় হীনতা, আর নিজের রুচির দিকে তাকালে অবজ্ঞা। শিল্পীদের মধ্যে যারা প্রাণবান তাঁরা অবজ্ঞাই বেছে নেয়, হীনতা নয়। হীনতাকে তারা মনে-প্রাণে ঘৃণা করে। ফলে, বিদ্রূপের বাণে হয় তারা ক্ষতবিক্ষত। তথাপি না দমে এই 'ক্ষতচিহ্ন অলংকারকে'ই জীবনের শ্রেষ্ঠ ভূষণ বলে বরণ করে নেয়।

তবে এর ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। তরুণ বয়সে উপযুক্ত সমাদর পেয়েছে, এমন শিল্পীও দেখতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় জুলিয়াস মাইকেল এন্‌জেলোর প্রতি মন্দ ব্যবহার করলেও তার

প্রতিভার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। আধুনিক ধনকুবেরেরা কিন্তু এমন সমঝদারির পরিচয় দিতে অক্ষম। উদীয়মান তরুণ শিল্পীদের কদর তাদের কাছে নেই, ফুরিয়ে যাওয়া বয়স্ক-শিল্পীদের ওপর ধনবর্ষণ করেই তারা নিজেদের সম্মানিত করতে চায়। ছবি কেনে তারা বড় লোক হলে ছবি কিনতে হয়, এই ধারণার বশবর্তী হয়েই, সত্যিকার তৃষ্ণার তাগিদে নয়। শিল্পীর কাজের চেয়ে যে তাদের নিজের কাজটাই বড়ো, এ সম্বন্ধে তারা দ্বিধাহীন। শিল্প তো একটা খেয়ালের ব্যাপার, ওর আর তেমন মূল্য কি। তবে হ্যাঁ, শিল্পীদের টাকা দিয়ে সম্মান কেনাটা রেওয়াজ হয়ে গেছে; তাই তা করতে হয়। স্রেফ অপব্যয় কিন্তু তারা কি, অর্থ তো আর সিন্দুকে আবদ্ধ করে রাখবার জন্য নয়—সম্মান কেনার জন্যই, আর এভাবেই সম্মান কেনা যায়। বড় লোকেরা যেমন হাতি পোষে হরিণ পোষে তেমনি শিল্পীও পোষে। ওটা একটা শখ। বড়লোক হলে শখেরও অনুশীলন করতে হয়—নইলে টাকাওয়ালা হওয়া যায়, বড়লোক হওয়া যায় না। এ থেকেই বুঝতে পারা যায়, শিল্প ও শিল্পীর প্রতি আধুনিক ধনকুবেরদের যে দৃষ্টিভঙ্গি তা মোটেই শ্রদ্ধার নয়, কৃপার। তাই শিল্পীরা দুঃখী; তারা যে অর্থ চায় না তা নয়, তবে সবচেয়ে বেশী চায় শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা ছাড়া তারা বাঁচতে পারে না। শিল্পীরা যে স্তুতিমিষ্টান্ন প্রিয়'—তা রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্বেই বলেছেন। আধুনিক ধনকুবেররা অর্থ দিতে জানে, কিন্তু স্তুতি দিতে জানে না। কেননা সেটা শক্ত। শিল্পবোধের অধিকারী না হলে যথাস্থানে 'বাঃ' দেওয়া সম্ভব হয় না।

[ধনিকদের সম্বন্ধে যীশুখৃষ্টের যে উক্তি: 'সূচের মুখ দিয়েও হয়তো হাতি গলানো সম্ভব, কিন্তু বড়লোক কোনদিন স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে না,' সত্যই অর্থপূর্ণ। অতিরিক্ত অর্থগৃধ্নুতার দরুন যে সংকীর্ণ বুদ্ধির আবির্ভাব হয়, তাতে সৌন্দর্যবোধের বিনাশ ঘটে, আর সৌন্দর্যবোধ হারিয়ে সৌন্দর্যনিকেতন স্বর্গে যাওয়া

না যাওয়া সমান। ধনির কপালে তাই স্বর্গসুখ নেই। ওরা ফিলিস্টাইন। ভোগের ক্ষমতা থাকলেও উপভোগের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত।]

আমার মনে হয় পাশ্চাত্যের তরুণদের দুঃখ অন্নের নয়, কর্মের। মনের মতো কাজ পায় না বলেই তারা দুঃখী। প্রাচ্যের বেলা কিন্তু একথা খাটে না। জগতের তরুণদের মধ্যে খুব সম্ভব রাশিয়ার তরুণরাই সবচেয়ে বেশী সুখী। একটা নতুন জগৎ গড়ার ভার পড়েছে বলে সৃষ্টির আনন্দে মেতে থাকার সুযোগ তারা পেয়েছে। তাই জীবনটা তাদের কাছে আর ফাঁকা মনে হয় না। বৃদ্ধ যারা ছিল আগাছার মতো তাদের উপরে ফেলা হয়েছে, অথবা নতুন বিশ্বাসে দীক্ষিত করে নবীন করে নেওয়া হয়েছে। তাই জরার রাজত্বের অবসানে তরুণশক্তি আজ সেখানে অব্যাহত গতি।

পশ্চিমে কিন্তু এমনটি হবার যো নেই। বৃদ্ধের শাসনে জড়োসড়ো হয়ে থাকতে হচ্ছে বলে সেখানকার তরুণদের মনে সরসতার অভাব। কেমন উৎসাহহীন তাদের জীবন।* হয় নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে গিয়ে অন্যায় করা, নয় কিছুই না করা, এ'দুয়ের মধ্যে বেছে নিতে হচ্ছে বলে তাদের আর স্বতঃস্ফূর্ততার আনন্দ নেই। সম্প্রসারহীন এসব তরুণ বিদ্যাবুদ্ধির অধিকারী হলেও জীবন থেকে বঞ্চিত, আর জীবন থেকে বঞ্চিত বলে বিকৃতও। নাক কুঁচকে নাখোশ মেজাজের পরিচয় দেওয়া তাদের স্বভাব—খাওয়া-দাওয়া ফূর্তি-ফার্তি, তারা করে, কিন্তু কোনো কিছুতেই তেমন সুখ পায় না। কর্মশক্তির স্বতঃস্ফূর্ততা নষ্ট হওয়ার দরুন স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা তারা হারিয়ে বসেছে। জারিপড়া জিবে সব কিছুই তারা গ্রহণ

---

* বলা বাহুল্য, তারা যে দর্শনের অনুসরণ করছে তার স্বপক্ষে কি বিপক্ষে বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। নতুন বিশ্বাস থেকে তারা যে নব-প্রাণ লাভ করেছে আমার দৃষ্টি কেবল সে দিকেই।

করে, কিন্তু কোনো কিছুরই স্বাদ পায় না। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় হচ্ছে অলস ভোগের দাসত্বকে অস্বীকার করে অজানার সন্ধানে বেরিয়ে পড়া। কিন্তু তা তারা করতে যাবে কেন? কোনো কৃষ্ণ তো তাদের জন্য বাঁশি বাজায় নি। অতএব ভ্রূক্ষেপহীন হয়ে পথের কাঁটা দলে চলার আনন্দ তাদের জন্য নয়।

চীন জাপান ও পাক ভারতের তরুণদের দুঃখ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণের ফল। অন্তর্দ্বন্দ্বজাত দুঃখ সে সব দেশে কম। তরুণদের করবার মতো কাজ সেখানে বিস্তর। আর সে সব কাজে আত্মনিয়োগ করে তারা সুখও পায়। জাতীয় জীবন গঠনে তাদের প্রতিভা নিযুক্ত হয়। আর ভবিষ্যতের স্বপ্ন তাদের মানসশক্তিতে ঘুণ ধরতে দেয় না। তাই প্রাচ্যের সিনিসিজমের অবসর নেই। ওটা বড়-লোকী রোগ। শক্তির অভাব আর অর্থ প্রাচুর্য, এ'দুয়ের অশুভ মিলনেই সিনিসিজমের জন্ম। পশ্চিমে ও'দুটিজ একত্র হয়েছে বলেই সে-খানে সিনিসিজমের রাজত্ব। শক্তিহীনতার উপলব্ধি বাতলায় কিছুই করবার নেই, আর আরাম-আয়েশের সুখকরতা সে অনুভূতিকে করে তোলে সহনীয়। জনমতের ওপর প্রভাব পাশ্চাত্যের ছাত্রদের নেই, প্রাচ্যের ছাত্রদের আছে। সেখানে জাতীয় ও গণ-আন্দোলনে তারাই অগ্রণী। তাদের ওপরই জাতির ভাগ্য গঠনের ভার। আর্থিক সংগতি তাদের কম, নেই বললেই চলে। তাই আরাম-আয়েশের সুবিধা, কি শক্তি উপলব্ধির অন্তরায়, কোনোটাই না থাকায় সিনিক না হয়ে হয় তারা বিপ্লবী অথবা সংস্কারক। আশাবাদের উজ্জ্বলতা তাদের চেহারায় দেদীপ্যমান। 'গড়তে হবে, গড়তে হবে, দেশকে সুন্দর করে তুলতে হবে, সার্থকতাকে চাপিয়ে দিতে হবে সকলের জীবনে'—এই কথাটা তাদের জপমন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়।

একবার এক তরুণ চীনা আমার স্কুল পরিদর্শন করতে আসে আদর্শবাদের অংকুশতাড়িত হয়ে। যাবার বেলা সে বলে যায়: চীনের এক প্রতিক্রিয়াশীল অঞ্চলে সে অনুরূপ একটা বিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠা করবে। কাজটা যে তার পক্ষে খুব সহজ হবে তা নয়। প্রতিক্রিয়াশীল লোকেরা হয়তো সেজন্য তার গর্দান নিতে চাইবে। কিন্তু কুছ পরোয়া নেই, তা হলেও সে পিছপাও হবে না। জাতির উন্নতির জন্য সে সমস্ত নির্যাতন সহ্য করবে। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন। এ দু'য়ের মাঝামাঝি থেকে লাভ নেই। ওটা কৃপণের বাঁচা, ধনীর নয়। তার কথার ভঙ্গিতে যে আনন্দ ঠিকরে পড়ছিল তাতে আমি বিদ্বেষ অনুভব না করে পারি নি। এই বেপরোয়া ভাব সে পেলে কোত্থেকে। নিশ্চয়ই শক্তির স্বাদ পাওয়ার সম্ভাবনা থেকে। নিজের শক্তির স্বাদ যে পেয়েছে, অথবা পাওয়ার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে, সিনিসিজম কোন দিন তাকে আক্রমণ করতে পারবে না। বিশ্বাসের ঔজ্জ্বল্যে সে ঝলমল করবেই।

শুধু বৈজ্ঞানিক আর স্বদেশকর্মীরাই সুখ পায়, একথা বললে মানুষকে খুব একটা আশার বাণী শোনান হয় না। বৈজ্ঞানিক ও স্বদেশকর্মী আর ক'টি লোক? সাধারণ মানুষই তো বেশী। তাদের সুখের ব্যবস্থাটা কী হবে সেটাই ভেবে দেখবার বিষয়। প্রশংসার দিকে নজর না রেখে নিপুণতার সার্থক প্রয়োগ করলে সকলেই সুখ পেতে পারে। যৌবনে দুটি পা-ই হারিয়েছে, এমন একটি লোককে দেখেছি অন্তরে স্ফূর্তি বজায় রেখে চলতে। গোলাপ-ব্যাধির গবেষণা তার সুখের যোগান দিয়েছে। এ-ব্যাপারে গভীর মনোনিবেশের ফলস্বরূপ তিনি পাঁচ ভল্যুম মূল্যবান পুস্তক রেখে গেছেন। এ-বিষয়ে তাঁর রচনাগুলিই শ্রেষ্ঠ। একজন মুদ্রাকরকে জানি, মুদ্রণকার্যে তাঁর নিপুণতা ও উৎসাহের অন্ত ছিল না। অর্থ বা নামের জন্য নয়, কাজের আনন্দের জন্যই তিনি কাজ করতেন। নৃত্যশিল্পীরা যেমন নৃত্যের নিপুণতা থেকে অনবদ্য আনন্দ লাভ করে, তিনিও তাঁর কাজ থেকে তেমনি অনাবিল আনন্দ লাভ করতেন। সে আনন্দ অভিব্যক্তির আনন্দ, নিজের শক্তি প্রকাশের আনন্দ। ইচ্ছা করলে সকলেই এ আনন্দ পেতে পারে।

এ প্রায় একটা বুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, যন্ত্রযুগে নৈপুণ্য প্রয়োগের সম্ভাবনা কম। কিন্তু তা সত্য নয়। যন্ত্রযুগেও ব্যক্তি-নৈপুণ্যের দরকার আছে। এমন অনেক সূক্ষ্ম যন্ত্র রয়েছে ব্যক্তি নৈপুণ্য ছাড়া যা সৃষ্টি কি চালনা, কোনোটাই সম্ভব নয়। বুদ্ধি প্রয়োগের সুযোগ থাকার দরুন শফার অথবা এন্‌জিন চালকের কাজ চাষীর কাজের চেয়ে অনেক সুখের। অবশ্য একথা ঠিক যে, যে-লোকটি নিজের জমি চাষ করে, লাঙল চালনা থেকে ধানভানা পর্যন্ত অনেক কাজই তাকে করতে হয় বলে বিচিত্র শক্তির স্বাদ সে পায়। কিন্তু এর মন্দ দিকও আছে। প্রকৃতির মেহের-বাণীর ওপর নির্ভর করার দরুন তাকে অনিশ্চয়তার মধ্যে বাস করতে হয়। 'কতজলে কত পাটের বাড়ন, কত জলে যায় ধসি'-- এই চিন্তা তাকে আকুল করে তোলে। ফ্যাক্টরির লোকদের কিন্তু এমন দুর্ভাবনা ভুগতে হয় না। প্রকৃতির খেয়ালিপনায় তাদের অবিচলিত থাকতেই দেখা যায়। প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ যে তাদের মনিব নয়, গোলাম—এ সম্বন্ধে তারা একরকম স্থিরনিশ্চয়। অবশ্য যন্ত্রশিল্পে এমন এক ধরনের কাজও আছে যা বুদ্ধির ধার কমিয়ে দেয়। কিন্তু এ সব কাজ যন্ত্রের দ্বারাও নিষ্পন্ন হতে পারে। এখন না হলেও ভবিষ্যতে তা হবেই। বৈচিত্র হরণ করতে নয়, বর্ধন করতেই যন্ত্রের আগমন হয়েছে। যন্ত্রশিল্পের লক্ষ্য হচ্ছে নিরানন্দ একঘেয়ে কাজগুলি কলের দ্বারা করিয়ে সূক্ষ্মগুলি মানুষের দ্বারা করানো। সেদিন এখনো আসে নি, একদিন আসবেই। তখন মানুষকে আর কাজের বোঝা বইতে হবে না। কাজ আর আনন্দ তখন এক হয়ে যাবে।

কৃষিযুগে অবতীর্ণ হয়ে মানুষ টের পেল যে বুভুক্ষা থেকে রক্ষা পেতে হলে তাকে বিরক্তি সহ্য করতেই হবে; এ ছাড়া গত্যন্তর নেই। শিকারযুগে কিন্তু কাজে আর আনন্দে এমন আদা-কাঁচকলা সম্বন্ধ ছিল না। প্রত্যক্ষ আবেগের ফল বলে শিকার

থেকে যথেষ্ট আনন্দ পাওয়া যেত। তাই ফুর্তির জন্য ধনীসন্তানেরা আজো তাদের পৈতৃক ব্যবসার কাছে ধর্ণা নেয়। ধরতে গেলে এখনো তারা একরকম শিকার যুগেই বাস করছে। বনে-বনে'ই তো তারা ঘুরে বেড়ায়, শহরে থাকে আর কয়দিন? কিন্তু কৃষি-যুগে কাজ আর আবেগে মিতালি না থাকার দরুন কাজ আর আনন্দের উৎস হয়ে উঠতে পারে না, প্রাণের প্রসার ব্যাহত হওয়ায় এ যুগ একঘেয়ে আর অবসাদকর। দুর্দশাময় এ-যুগের মাথা ঠিক নেই। সবেমাত্র মানুষ এর পীড়ন থেকে মুক্তি পেতে চলেছে। যন্ত্রযুগের সার্থক প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত এ দুঃখ থেকে সম্পূর্ণ নিস্তার নেই। যন্ত্রযুগ মানুষকে মুক্তি দিতেই এসেছে, বন্দী করতে নয়। তবে তার সার্থক বিন্যাস এখনো দূরে। ভাবপ্রবণ ব্যক্তিরা মাটির স্পর্শ আর হার্ডির ভাবুক চাষীদের কথা যতই বলুক না কেন, লোকেরা আসলে চায় সঙ্গসুখ। আর তা শহরে আর কারখানায় যতটা পাওয়া যায়, গ্রামে ততটা নয়। গ্রাম বড্ড নিরিবিলি। তাই গ্রাম ছেড়ে দলে দলে লোকেরা শহরে আর কারখানায় আসে, শুধু অন্নের তাগিদে নয়, বৈচিত্রের তাগিদেও। গ্রামের নির্জন শীতের সন্ধ্যা কী ভয়ংকর! বিরক্তি আর অবসাদে জীবন ঝিমিয়ে পড়ে, নিজেকে মনে হয় ভূতে পাওয়ার মতো থমথমে। শুধু শীতের সন্ধ্যায়ই নয়—সবসময়ই সেখানে একটা মনমরা ভাব। শহরে আর ফ্যাক্টরিতে তা নয়। সেখানে সব কিছুই প্রাণচঞ্চল।

[গ্রামের কথা বলতে গিয়ে অনেকে 'প্রকৃতি-প্রকৃতি' করে। কিন্তু গ্রামের লোকেরাই বোধ হয় প্রকৃতিকে উপলব্ধি করে সব চেয়ে কম! মায়ের গর্ভ থেকে নিস্ক্রান্ত না হলে যেমন মাকে চেনা যায় না, গ্রাম থেকে বেরিয়ে না এলেও তেমনি প্রকৃতির জন্য দরদ জাগে না। রোমান্টিক কাব্য এর সাক্ষী। শিল্পযুগের প্রারম্ভেই রোমান্টিক কবিতার উদ্ভব। প্রকৃতির থেকে আলাদা হতে গিয়ে মানুষ প্রকৃতির পানে চেয়ে বললে: সুন্দর! সমগ্র রোমান্টিক

কাব্যের তাৎপর্য এই ক্ষুদ্র উক্তিটির মধ্যে নিহিত। প্রকৃতিকে সত্যি-সত্যি কাছে পেতে হলে তার থেকে দূরে আসা দরকার। নইলে রস জাগে না—বাস্তব কল্পনামণ্ডিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পায় না। 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না', এই উক্তির মধ্যে যে আকুলতা বেজে ওঠে, চিরদিন দেখা পেলে সে আকুলতা বেজে উঠতো না। কল্পনা প্রয়োগের অবসর থাকতো না বলে দেখাটা একটা কবিত্বহীন মামুলি ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত।]

একটা উদ্দেশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করেও সুখ পাওয়া যায়। বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী ভাবই যে একমাত্র সুখদায়ী আদর্শ তা নয়; ছোট-খাটো আদর্শ থেকেও সুখ পাওযা যেতে পারে। বিশ্বাসটি অকৃত্রিম হলে জীবন আর ফাঁকা মনে হয় না, আর বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করে অবসর ভরিয়ে তোলা সম্ভব হয়। বলা বাহুল্য, অসম্ভব কাল্পনিক বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করেও সুখ পাওয়া যায়। কিন্তু আমি সে বিশ্বাসের কথা বলছিনে, বলছি বুদ্ধিসঞ্জাত বাস্তব বিশ্বাসের কথা। এমন বিশ্বাসের কমতি নেই। মানুষ ইচ্ছে করলেই খুঁজে নিতে পারে।

সাধারণ ছোট-খাটো বিশ্বাসের কাছাকাছি রয়েছে 'হবি' বা শখ। শখের কাজ করেও সুখ পাওয়া যায়। একজন বিখ্যাত অংকবিশারদ সময়কে দু'ভাগে ভাগ করে একভাগ রাখতেন অংকের জন্য, আরেক ভাগ লাগাতেন টিকিট সংগ্রহের কাজে। অংকের ক্ষেত্রে ভদ্রলোক যখন আর এগুতে পারতেন না, মাথাটা ঘোলাটে মনে হত, তখনই তিনি টিকিট সংগ্রহের কাজে লেগে যেতেন। এতে করে মনে যে সুখ আসতো, তাতেই মাথাটা পরিষ্কার হয়ে যেত। ফলে ভদ্রলোক পুনরায় অংকে মনোনিবেশে সক্ষম হতেন। হবির অন্ত নেই। প্রাচীন চীন, রোমক মুদ্রা, অজন্তার গুহা, পিরামিড, শিলালিপি এ সব তো প্রতীক্ষা করে আছে, একটু

আদর পেলেই আমাদের মন সুখে ভরিয়ে দেবে বলে। কিন্তু এরা সুখ দিতে চাইলেও নেওয়ার লোকের অভাব; সরল সুখ মনে করে শ্রেষ্ঠমনারা এদের ঘৃণা করে। কিন্তু তা' ঠিক নয়; যা কিছু সুখের উপায় তাই গ্রহণযোগ্য। দেখতে হবে, শুধু উপায়টি নিজের বা অপরের পক্ষে কোন দিক দিয়ে ক্ষতিকর কিনা।

নদীতে সাঁতরানো আমার হবি। ভল্‌গা আর ইয়াংসি নদীতে সাঁতার কেটে আমার আনন্দ। ওরিনোকো আর আমাজানে সাঁতার কাট্‌তে পারলুম না বলে আমার দুঃখের অন্ত নেই। সাঁতার কাটার মতো সরল সুখে আমার আসক্তি থাকার দরুন আমি কোন দিন লজ্জা বোধ করিনি। একবার ফুটবল প্রেমিকের নেশার কথা ভাবুন। কী তার উল্লাস! উদগ্র আগ্রহ নিয়ে সে পত্রিকার দিকে তাকায়, আর বেতারযন্ত্র নিয়ে আসে তার জন্য তীব্র রোমাঞ্চ। কী ভাগ্যবান সে! তার সুখ দেখলে ঈর্ষা অনুভব না করে থাকা যায় না।

আমেরিকার এক শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের লেখা পড়ে আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মেছিল যে, লোকটা নিশ্চয়ই বিষন্ন প্রকৃতির হবেন; নইলে তাঁর চরিত্রগুলি এমন হতভাগ্যতার প্রতীক হতে যাবে কেন। তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের পরে আমার এই ভ্রম দূর হয়। তখন 'বেসবল' খেলার মরসুম। তিনি রেডিওতে কান পেতে বসে আছেন, আর খেলার সংবাদ শুনে মাঝে মাঝে উৎফুল্ল হয়ে উঠছেন। যখন শেষ ঘোষণাতে শুনতে পেলেন তাঁর প্রিয় দলটি জয়ী হয়েছেন, তখন উল্লাসের আর অন্ত রইল না। কোথায় রইল সাহিত্য-শিল্প আর কোথায় রইল জীবনের দুঃখ সম্বন্ধে চেতনা। সব ভুলে গিয়ে—এমন কি আমি যে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে এসেছি সে কথাও ভুলে গিয়ে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। এর পর থেকে আমি তাঁর বইগুলি সহজেই পড়তে পেরেছি, চরিত্রগুলির দুর্ভাগ্য অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায় নি।

কিন্তু খেয়াল বা শখ থেকে যে সুখ পাওয়া যায় তা প্রাণবান সুখ নয়, তা দিয়ে জীবনের ভিত্তি তৈরী হতে পারে না। জীবন থেকে পলায়নের উপায় মাত্র, সত্যকার জীবন লাভের উপায় নয়। জীবন প্রদায়ী সুখ পাওয়া যায় কোনো কিছুকে একান্তভাবে ভালোবাসতে পারলে। ভালোবাসাই সুখ। জীবনশিল্পীদের কাছে তাই তার এতো মূল্য। পৃথিবীতে যে তাদের কাছে 'বারে বারে নতুন, ফিরে ফিরে নতুন' হয়ে দেখা দেয়, সে তো এই ভালোবাসার জন্যই। ভালো-বাসার মূল্য দেয় বলে প্রশংসার চেয়ে বন্ধুতার মূল্যই তাদের কাছে বেশী।

প্রশংসা, সে মৃতের আহার, চাইনে আমি তাহা,
হজম করি শক্তি আমার নেইকো তেমন, আহা!
অন্ধকারের বন্ধ ঘরে নিঝুম হয়ে যারা
সংগিবিহীন নেইকো কেহ তুলতে প্রাণে সাড়া,
তাদের তরে বরাদ্দ থাক প্রশংসা সে দামী,
পরাণ খুলে বলছি, শোনো, চাইনে তাহা আমি।
বন্ধুতা, সে মধুর জিনিস, নাচিয়ে তোলে প্রাণ
যা-ই বলনা, গাইব আমি বন্ধুতারই গান।
মরণ কোলে জীবন-প্রদীপ যায় গো যদি নিবি',
বন্ধু মোরে স্মৃতির সুধায় রাখবে চিরজীবী।
নয়নজলে মহত্ত্ব মোর স্মরবে চিরদিনই।
মন্দরে মোর ভুলের মাঝে গোর দিবে সে, জানি।

[যে অনুরাগ স্বার্থের দিকে নজর রাখে এবং অধিকার খাটাতে চায় সে অনুরাগ নয়, নিঃস্বার্থ সৃজনধর্মী অনুরাগই সুখের হেতু। অহেতুক উদ্দেশ্যহীন এই অনুরাগ যারা অন্তরে ধারণ করে, নীচতা হীনতা-মুক্ত হয়ে তারা এক অনির্বচনীয় সুখের অধিকারী হয়। অপরের মধ্যে নিমগ্নতার এই যে সুখ, এ যেন আর ফুরাতে চায় না, বারে বারে নতুন হয়ে দেখা দেয়।

সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়
সেই পীরিতি অনু— রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয় ॥

প্রেম বা বন্ধুতা নিজের ভেতরের নবীন-উপলব্ধির উপায়। অতিরিক্ত স্বার্থ কামনা এই নবীন উপলব্ধির অন্তরায় বলে প্রেমতত্ত্বজ্ঞরা তাকে দস্তুরমতো ভয় করে চলেন। অথবা আরো সত্য বলতে গেলে স্বার্থের বিরুদ্ধে তাঁরা যান না, যান বড়ো স্বার্থটি রক্ষা করার জন্য ছোট স্বার্থের বিরুদ্ধে। আর সেই বড়ো স্বার্থটি হচ্ছে নবীনতা-বোধ। নবীনতা-বোধবর্জিত জীবন তো মৃতের জীবন। সে জীবন কোনো দিন জীবন-বোধসম্পন্ন মানুষের কাম্য হতে পারে না।

প্রেমের ব্যাপারে পাওয়ার আকাঙক্ষার চেয়ে দেওয়ার আকাঙক্ষাকে যারা বড়ো করে দেখে সুখের বর পায় তারাই। অধিকার বৃত্তি অপরকে নিজের রুচি অনুযায়ী চালাবার আকাঙক্ষা এই সুখের উৎসটি নষ্ট করে দেয়। অপরের স্বাধীন বিকাশের দিকে তাকিয়ে যে নৈর্ব্যক্তিক আনন্দ তা-ই ভালোবাসার শ্রেষ্ঠ উপহার। সত্যকার সুখপ্রিয়রা তাই অপরের ইচ্ছার ওপর জবরদস্তী চালাতে নারাজ। নাট্যশিল্পীর মতো তারা নিজের ব্যক্তিত্বকে লুকিয়ে রাখে অপরের ব্যক্তিত্বের স্বাদ পাওয়ার জন্য। এ এক কঠিন সাধনা। কিন্তু সুখকে ভালোবাসলে এই কঠিন সাধনাও ধীরে ধীরে সহজ হয়ে আসে।]

কিন্তু এই ভালবাসা স্বতঃস্ফূর্ত হওয়া চাই। কর্তব্যের খাতিরে বা আত্মত্যাগের আদর্শের তাগিদে হলে চলবে না। কর্তব্যবোধ কাজের বেলা ভালো, আত্মীয়তার বেলা নয়। রসহীন কর্তব্য আত্মীয়তাকে বিষিয়ে দেয়। আত্মীয়রা আপনার কাছে ভালোবাসার উত্তাপই চায়, কর্তব্যের শীতল স্পর্শ নয়।

মানুষ বা প্রাণীর মতো বস্তুকেও বন্ধুর নজরে দেখা যায় কিনা, এ নিয়ে তর্ক চলতে পারে। কিন্তু ঠিক বন্ধুতা বলা না গেলেও

তারি মতো একটা সম্বন্ধ সেখানেও স্থাপন করা সম্ভব। ভূতাত্ত্বিক পর্বতের দিকে আর প্রত্নতাত্ত্বিক প্রাচীন কীর্তিসমূহের ধ্বংসস্তূপের প্রতি যে দৃষ্টিতে তাকায় তা থেকেও এক প্রকার বন্ধুতার স্বাদ পাওয়া যায়। সমাজের প্রতিও এরূপ 'হৃদ্যতাপূর্ণ' দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব। হৃদ্যতাপূর্ণ কথাটার উপর জোর দেওয়া হল বিশেষ একটা কারণে। দৃষ্টি বা মনোনিবেশটা হৃদ্যতাপূর্ণ না হয়ে তার বিপরীতও হতে পারে। তখন তা থেকে আর সুখ পাওয়া যায় না। পিঁপড়ে বা মাকড়সার জাল থেকে মুক্ত থাকার জন্য যদি আপনি পিঁপড়ে বা মাকড়সাতত্ত্ব জানতে চান তো তা থেকে আর তেমন অনাবিল সুখ পাবেন না যেমনটি পাওয়া যাবে বন্ধুভাবে তাকালে। সমস্ত অন্তর বন্ধুতায় ছেয়ে ফেলুন, তা হলেই সুখে জীবন ভরে উঠবে। তখন যেদিকেই তাকাবেন সুখের সাড়া পাবেন; সুখ সমস্ত ভুবন জুড়ে লুকোচুরি খেলছে, এমনি মনে হবে।

সুখ যে গো, হায় রঙীন মায়াবী, লুকোচুরি খেলে নিতি,
ফুল হয়ে সে যে রাঙা হাসি হাসে, নদী হয়ে গায় গীতি।
তারা হয়ে থাকে আকাশের গায়ে, ধারা হয়ে নামে মাঠে,
জোনাকি হইয়া সারা নিশি জ্বলে, গাঁয়ের বিজন বাটে।
মাধুরী হইয়া চাতুরী করে গো বধুর বেশর দোলে,
পুলক হইয়া পলকে মিশিছে শিশুর আধেক বোলে।
বাঁশরির সুরে মিশে থাকে সে যে স্বপন হইয়া ফিরে,
বেলাভূমি হয়ে খেলা করে সদা সুনীল সিন্ধু তীরে।[২]

তাই বলে যে হৃদয়তান্ত্রিক রোমান্টিক সুখই একমাত্র সুখ, তা নয়। বুদ্ধিগত বস্তুপরিচয়েও সুখ পাওয়া যায়। প্রাচীন মিশর বা চীনে মানস-পর্যটন করে আপনি যে সুখ পাবেন জীর্ণতামুক্ত করে তা আপনাকে নবীন করে তুলবে। তখন সংসারের ক্ষুদ্র চিন্তা আপনাকে আর কাবু করতে পারবে না। আপনি ভারসাম্যতা বজায় রেখে চলতে পারবেন।

[সুখের তত্ত্বটা আসলে সোজা। ভালোবাসাই সুখ। বাংলা লাভকে যথাসম্ভব বর্জন করে ইংরেজী 'লাভে'র অনুশীলন করলেই সুখ পাওয়া যায় তা-ই বা বলি কী করে? ইংরেজী 'লাভ'টাও কি একটা লাভ নয়? তবে সেটা বাস্তব নয়, আত্মিক লাভ, এই যা। তাই বলতে হয়; বাস্তব লাভের চেয়ে মানসিক লাভকে বড়ো করে দেখাটাই হচ্ছে সুখতত্ত্বের গোড়ার কথা। সত্যিকার সুখশিল্পীরা তাই বস্তুর কাছে দাসখৎ দিতে নারাজ। কবি যে—'লাল সে গালের কালো তিলটির বদলে গো'—সমরকন্দ ও বোখারা বিলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তা এই মূল্যবোধেরই তাগিদে। বস্তুর চেয়ে সৌন্দর্যই তাঁর কাছে বড়ো হয়ে উঠেছিল।

সুখের তত্ত্বটা সোজা হলেও, সাধনাটা কঠিন। কেননা, অপরাপর সাধনার মতো এটাও ত্যাগের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সব কিছু পেতে চাইলে সুখ পাওয়া যায় না। বেছে বেছে চাইতে হয়। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ'—এই শাস্ত্রবাক্য সুখের দিকে তাকিয়েই উচ্চারিত হয়েছে। A happy man is he who knows what he wants—লিনইউটাং-এর এই উক্তিটিও সুখশিল্পের ইশারাদ্যোতক। প্রচুর পর্যবেক্ষণশীলতা রয়েছে এর পেছনে। নির্বাচনের ধার ধেরে চলতেন বলে প্রাচীনরা সুখ পেতেন, আমরা চলিনে বলে পাইনে। কোমর বেঁধে জীবনের ভোজে অবতীর্ণ হলে আর সুখ পাওয়া যায় না। আধুনিকরা তাই সুখবঞ্চিত। তাদের মুখে সেই এক কথা: বিজ্ঞান যখন সম্পদ সৃষ্টি করছে তখন আমরা ভোগ করবো না কেন? আলবৎ করবো, তবে কুকুরের মতো কামড়াকামড়ি করে নয়, কাকের মতো সকলে মিলে। তাই সমাজতন্ত্রের চেয়ে কোনো সুন্দর বাণী এযুগ উচ্চারণ করতে সক্ষম হয় নি। এ যুগের চেহারাটা অশ্লীল। জিব থেকে তার লালা ঝরছে! শুধু সেক্সের কথাই আওড়ায়—প্রেমের কথা নয়। উভয়ের মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে, সেটা সে উপলব্ধি করতে পারে না।]

পরিশিষ্ট

জানি, মুরুব্বিয়ানা করে কেউ কেউ বলবেন। 'বড়ো বড়ো কথা তো বলা হল, কিন্তু আসল কথাটা—ভাত-কাপড়ের কথাটা তো বলা হল না। সেটার কী করলেন? সেটা ছাড়া তো সব পণ্ড। তাঁদের বলি: ওটা 'কাজের কথা, চিন্তার কথা নয়। তাই ওটা আলোচনার বিষয়ীভূত হয় নি।

এমনি আপত্তি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল বলেই আমি এক শ্রেণীর পাঠকদের জন্য রচনাটা নিষিদ্ধ করে দিয়েছি। কেননা, রচনাটা পড়ে তাঁরা আশাভঙ্গের দুঃখ পেতে পারেন, আর সুখের আলোচনা করতে গিয়ে কাউকে দুঃখ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য হতে পারে না। আমি sadist নই।

১। তৃতীয় বন্ধনীর উক্তিগুলি প্রবন্ধকারের নিজস্ব।

২। 'শুধু মোর কটি গান' —মোতাহের হোসেন চৌধুরী

উপভোগ-ক্ষমতা

সবচেয়ে বড় ক্ষমতা জীবনের স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা। মানুষ মাত্রই এই ক্ষমতার অধিকারী, অথবা এই ক্ষমতার অধিকারী যারা তারাই সুখী। এই ক্ষমতার অধিকারীদের কাছে কোন সময়ই জগৎ বিস্বাদ নয়। এমনকি বিস্বাদও একটা স্বাদ—তাকেও তারা উপভোগ করে। তাই সামান্য ক্ষতিতে তো নয়ই, অসামান্য ক্ষতিতেও তারা গোমড়ামুখো হয়ে বসে থাকে না। বাঁচা জিনিসটা তাদেব কাছে একটা খুশীর ব্যাপার। জীবনটা সার্থক হল কিনা একথা ভেবে তারা নিজেদের বিব্রত করে না। সার্থকতা তো বাইরে নেই, ভেতরে আনন্দ গ্রহণের মধ্যে ; আর আনন্দ গ্রহণের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, বাইরের আয়োজন নয়, ভেতরের উন্মুখতা। উন্মুখতাকে পর করে যারা জীবনের আয়োজন করে তারা যেন নুন ছাড়া ব্যঞ্জন রান্না করে। তারা খুশী হওয়া কি খুশী করার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত। তাদের কথায়, চোখে-মুখে প্রাণ ঝলকে ওঠে না। আপনি নিজে খুশী না হলে অপরকে খুশী করবেন কী করে? The art of pleasing consists in being pleased. খুশী হওয়া triply blessed. আপনি খুশী হলে আপনার খুশীর ছোঁয়ায় অপরেও খুশী হবে এবং তার খুশীর ছোঁয়ায় আপনার খুশীর মাত্রা বেড়ে যাবে অনেক।

এখন এমন যে ঐন্দ্রজালিক খুশী, তার নিদান হচ্ছে 'জেস্ট'—বাংলা করে বলতে স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা বা উপভোগ-ক্ষমতা

(বাংলায় ব্যঞ্জনাটি পুরাপুরি ব্যক্ত হয় না বলে আমরা মাঝে-মাঝে জেস্ট কথাটি ব্যবহার করব।) ব্যাপারটি কী ? মানুষ যখন খেতে বসে তখন কে কিভাবে খাওয়াটা গ্রহণ করে তা জানতে পারলেই জেস্টের মর্ম গ্রহণ সহজ হবে। এক ধরনের লোক আছে যাদের কাছে খাওয়া মাত্রই বিরক্তিকর। হাজার ভালো খাদ্য দিলেও তাদের খেতে ভালো লাগে না। তাঁদের কখনো অনাহারে জীবন-যাপন করতে হয় নি, সব সময় ভালো খাবার পেয়েছেন, তাই ভালো খাওয়াটা তাঁদের কাছে মামুলি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যান্য ব্যাপারের মতো খাওয়াটাও অবশ্য শাস্তিকর। কিন্তু যখন এর চেয়ে কম শাস্তিকর ব্যাপার আর কিছুই হতে পারে না, তখন এ নিয়ে হৈ চৈ করে লাভ কি ? তারপর আসে রোগীদের কথা ; তারা খায় খাওয়াটা কর্তব্য বলেই। ডাক্তার সাব বলে দিয়েছেন, খাবেন নইলে শরীরে শক্তি পাবেন না— সেজন্য ডাক্তারের অনুরোধ রক্ষার্থে তাঁরা খান। তারপর আছে ভোজনবিলাসীর দল। তারা আশাপ্রদভাবেই শুরু করে কিন্তু শেষ করে ঠোঁট বেঁকিয়ে : না রান্নাটা তেমন ভালো হয় নি বলে। আরেকটি দল আছে। তাকে বলা যায় অতিভোগীর দল। তারা অত্যাগ্রহে খাওয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে খেতে শুরু করে এবং পেটের চামড়া ফাটো ফাটো না হওয়া পর্যন্ত খেয়ে চলে এবং অতিরিক্ত খাওয়ার ফলে এতটা মুটিয়ে যায় যে, রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থা আশাপ্রদভাবেই তারা শুরু করে, কিন্তু শেষ করে ঠোঁট বেঁকিয়ে, বলে : না, রান্নাটা তেমন ভালো হয়নি। আজকালকার বাবুর্চিরা কি আর রাঁধতে জানে ? যত সব হতচ্ছাড়ার দল ! এমনি করে কি বিরিয়ানী পাকায় ? আর কালিয়াটির কী ছিরি করেছে, দেখ না। আরেকটি দল আছে, তাদের বলা যায় পেটুক বা অতিভোগীর দল। (ইংরেজী 'গরমেনডাইজার' কথাটা মনে রাখলেই তার মধ্যে যে একটি ঘৃণার ভাব রয়েছে তা উপলব্ধি

করা সহজ হবে।) তারা খাওয়ার জন্যই বাঁচে। দুনিয়াতে একটা জিনিস আছে, সেটি হচ্ছে খাওয়া, এমনি তাদের মনোভাব হয়ে দাঁড়ায়। 'হাফেজ যেমন প্রিয়ার গালের তিলের জন্য সমরকন্দ ও বোখারা ছেড়ে দিতে রাজি ছিলেন, তারাও তেমনি খাওয়ার জন্য জীবনের অন্যান্য দিক ছেড়ে দিতে প্রস্তুত। তারা খাওয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রাক্ষসের মতো গিলতে শুরু করে এবং পেটের চামড়া ফাটো ফাটো না, হওয়া পর্যন্ত খেয়ে চলে। অতিরিক্ত খাওয়ার দরুন তাদের অবস্থা হয় একটা দেখবার মতো জিনিস। চলতে গেলে চলতে পারে না। ঘুমোলে নাক ডাকায়।' সকলের শেষে বলছি স্বাভাবিক ক্ষুধাসম্পন্ন লোকদের কথা। তারা পেট ভরে খায় এবং খেয়ে খুশীও হয়। খাওয়ার আগে নাক সিট-কানো অথবা খাওয়ার পরে ঠোঁট বাঁকানো—কোনোটাই তাদের স্বভাব নয়। তারা সহজ স্বাভাবিক মানুষ, জীবনছন্দে তাদের কখনো তাল কাটে নি।

জীবনের ভোগের ক্ষেত্রেও এমনি পাঁচ রকমের মানুষ দেখতে পাওয়া যায়।

১। আমাদের সুখী মানুষটির সাদৃশ্য রয়েছে উপরের তালিকার শেষের মানুষটির সঙ্গে। খাদ্যের ব্যাপারে ক্ষুধা যা জীবনের ব্যাপারে জেস্টও তাই। ক্ষুধা খাদ্যের স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা, আর জেস্ট জীবনের। ২। যে লোকটি খাদ্য দেখলেই বিরক্তিবোধ করে তাকে 'বাইরনিক 'দুঃখভোগীর সঙ্গে তুলনা করা যায়। জীবনের প্রাচুর্য সে এতো বেশী পেয়েছে যে, ভোগ করে করে হয়রান হয়ে পড়েছে, তাই ভোগের প্রতি তার আগ্রহ একেবারেই নেই। ৩। যে ব্যক্তিটি কর্তব্যের খাতিরে খায়, তার তুলনা দেওয়া যায় সন্ন্যাসী বা সংসার-বিরাগীর সঙ্গে; আর ৪। পেটুক অতিভোগীর তুলনীয় হচ্ছে কামুক। ৫। বাকি রইল শুধু ভোজনরসিক। তার তুলনীয় কে? ঐ যে দুস্তোষণীয় খুঁতখুঁতে মানুষটি যে সব কিছুই

গ্রহণ করে, অথচ যার কাছে জীবনের বেশীর ভাগ ব্যাপারই অশ্লীল, তার সঙ্গেই তার সাদৃশ্য।

আশ্চর্য এই যে, পেটুক ব্যতীত আর সকলেই স্বাভাবিক ক্ষুধা-সম্পন্ন মানুষকে ঘৃণা করে, আর নিজেদের তার চেয়ে উচ্চশ্রেণীর জীব বলে ধরে নেয়। খাদ্যকে প্রিয় আর জীবনকে উপভোগনীয় মনে করার মধ্যে তারা একটা অশ্লীলতার গন্ধ পায়। তাই তারা মুখ বাঁকায়, নাক কুঁচকায়, সর্বদাই একটা ছুঁৎমার্গী মনের পরিচয় দিয়ে খুঁতখুঁত করে। অহঙ্কারের উঁচু চূড়া থেকে তারা সরল মানুষের প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকায় আর মনে মনে বলে: হায় হায় কী ছোট লোক, কেবলই জীবনটা ভোগ করতে চায়, আত্মিক উন্নতির চেষ্টা, ঊর্ধাভীপ্সা একেবারেই নেই। আমি কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি সহানুভূতিশীল হতে পারিনে। মোহমাত্রই বর্জনীয় একথা বলতে আমার দুঃখ হয়। সব ব্যাপারে বীতরাগ হওয়া আর জীবনকে বর্জন করা এক কথা। 'মায়াবিহীনতা এক প্রকারের 'রোগ; তাই যখনই দেখা দেয় তখনই তা' উৎসাদিত করা উচিত। তা না করে তাকে উন্নতস্তরের জ্ঞান হিসাবে গ্রহণ করা ভুল। মায়াই জীবন। 'ওগো মায়া বড়ো মনোহরা।' যার জীবন থেকে মায়া চলে গেছে সে জীবনহীন, মৃত। সে 'জীবনে জীবন যোগ করতে পারে না বলে তার জীবনের পসরা ব্যর্থ।' অথচ কোন কিছুর প্রতি মায়া নেই বলে সে নিজেকে একটা বড় কিছু মনে করে বসে। কী ভুল! ধরুন, একটি লোক চিনে-বাদাম খেতে ভালোবাসে, আরেকটি লোক বাসে না। এখন প্রথম লোকটির চেয়ে দ্বিতীয় লোকটি কোন্ দিক দিয়ে বড়, বলুন তো। চিনেবাদামের ভালোত্ব কি মন্দত্ব প্রমাণ করতে পারে এমন কোন নৈর্ব্যক্তিক প্রমাণ তো পাওয়া যায়নি। যে লোকটি ভালোবাসে তার কাছে তা ভালো, যে-লোকটি বাসে না তার কাছে মন্দ। কিন্তু যে-লোকটি ভালোবাসে তারি তো জিত।

কেননা, তার একটি সুখের উপাদান বেড়ে গেল, অন্যদিকে অপর লোকটির সুখের উপাদানে ঘাটতি পড়ল। এই ক্ষুদ্র দৃষ্টান্তে যে-সত্যটি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে জীবনের অন্যান্য ব্যাপারেও তা প্রযোজ্য। অন্যান্য ব্যাপার সমান ধরে নিয়ে, ফুটবল বিরাগীর চেয়ে ফুটবল-অনুরাগীর বাঁচার সুখ বেশী। বই না পড়ুয়ার চেয়ে বই-পড়ুয়ার জীবন আরো অধিক সুখের। কেননা, ফুটবল খেলা দেখার সুবিধার চেয়ে বই পড়ার সুবিধা অনেক বেশী। বই সবসময়ই পড়া যায়, ফুটবল খেলা সবসময় দেখা যায় না। অনুরাগই সুখ। যে যত বেশী ব্যাপারে অনুরাগী সে তত বেশী সুখী এবং তত কম ভাগ্যের ক্রীড়নক। কেননা, একটি জিনিস না পেলে আরেকটি জিনিসের উপর সে নির্ভর করতে পারে এবং প্রিয় জিনিসের অভাবে তার জীবন মরুভূমি হয়ে যায় না। জীবন এতো স্বল্পপরিসর যে, সব জিনিসে অনুরাগ সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। Life is short, art is long. তাই যত বেশী ব্যাপারের অনুরাগে জীবনের দিনগুলি ভরে তোলা যায় ততই ভালো। তা হলে একটি জিনিস ফস্‌কাতে আরেকটি জিনিস ধরা সম্ভব হবে এবং জগৎ একেবারে ফাঁকি মনে হবে না। ভেতরমুখো হওয়ার প্রবণতা সকলের মধ্যেই রয়েছে, আর অনুরাগের অভাবের দরুনই মানুষ ভেতরমুখো হয়। পৃথিবীর বৈচিত্র্য সামনে ছড়ানো থাকা সত্ত্বেও, ভেতরমুখোরা তাদের দৃষ্টি বাইরে না পাঠিয়ে কেবল ভেতরের শূন্যতায় নিবদ্ধ করে। এভাবে সহজ সুখ বর্জন করে তারা দুঃখের পূজারী হয়ে ওঠে। কিন্তু এই দুঃখের মধ্যে একটা বড় কিছু আছে, এমন না ভাবাই ভালো।

একটা নজির দিয়ে কথাটা খোলাসা করবার চেষ্টা করছি। এক সময়ে দুটো কাবাব তৈরীর কল ছিল। তারা এমন সুন্দরভাবে তৈরী হয়েছিল যে, তাদের মধ্যে মাংস ফেলে দিলেই তা সুস্বাদু কাবাবে পরিণত হত। এদের একটি কাবাব তৈরীর আনন্দ হারিয়ে

বসে নি এবং যখনই তাতে মাংস দেওয়া হত তখনই সে চমৎকার কাবাব তৈরী করে বাইরে পাঠিয়ে দিত। সরল সোজা মানুষটি সে, নিজের কাজ নিয়ে খুশীবাসি থাকতেই ভালো বাসতো। অপর যন্ত্রটি কিন্তু খুব চালাক। সে ভাবলে কি জানেন? আমার মাংস দিয়ে কী কাজ? এই যে দিনের পর দিন কাবাব তৈরী করে চলেছি 'এটা বাহ্য।' ভেতরে যে আশ্চর্য শক্তি রয়েছে তাই তো আমার ঐশ্বর্য। অতএব তা নিয়ে পড়ে থাকাই উচিত। যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। আর সে মাংস গ্রহণ করতে রাজি হয় না, দিলেই ফিরিয়ে দেয়; বলে মাংস দিয়ে আমার কি হবে? আমার কাজ তো আমাকে জানা। অতএব নিজেকে জানার কাজে সে লেগে যায়। কিছুদিন ভেতরটা নেড়েচেড়ে দেখলে, তারপর নিরাশ হয়ে বললে: না ভেতরটাও বাজে, এখানেও বিস্মিত হওয়ার মতো কিছুই নেই। যে সূক্ষ্মযন্ত্রপাতি দিয়ে উপাদেয় কাবাব তৈরী হত নিষ্ক্রিয়তার ফলে তা স্তব্ধ হয়ে যাওয়ায় বাইরের মতো ভেতরটাও তার কাছে ফাঁকা ফাঁকা মনে হতে লাগল। ফাঁকা, ফাঁকা বাইর-ভেতর সব কিছুই ফাঁকা। বেঁচে থাকাটাই একটা বিড়ম্বনা। কাবাবের এই দ্বিতীয় কলটির তুলনা চলে আমাদের সেই স্বাদ-গ্রহণের ক্ষমতাবর্জিত আনন্দবিহীন মানুষটির সঙ্গে। আর প্রথম কলটির সাদৃশ্য হচ্ছে সহজ সরল মানুষটি, উপভোগ-ক্ষমতা থাকার দরুণ জীবন যার কাছে বিরস নয়—আনন্দের উৎস।

মন একটি অদ্ভুত কল। তার সামনে তুলে ধরা খণ্ডবিচ্ছিন্ন ব্যাপারকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে সে চমৎকার সৃজনীপ্রতিভার পরিচয় দিতে পারে। মনের এই অদ্ভুত ক্ষমতা আছে বলেই তার এতো মূল্য। কিন্তু বাইরের বস্তু ছাড়া সে বেকার শক্তিহীন হয়ে পড়ে। যদিও সাদৃশ্যযুক্ত, তথাপি নির্বাচন ব্যাপারে সে কাবাবের কলের মতো পরনির্ভর নয়। নিজের জিনিস সে নিজেই বেছে নেয়। এই যে বেছে নেওয়ার তাগিদ এরই নাম অনুরাগ, আর

এই অনুরাগের স্পর্শ লেগেই ঘটনা অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত হয়। যে জিনিসে আপনার অনুরাগ নেই, সে জিনিসে আপনার অভিজ্ঞতা থাকতে পারে না। ইংরেজীতে একটা কথা আছে : Experience is knowledge—অভিজ্ঞতাই জ্ঞান ; আর অভিজ্ঞতার গোড়ায় থাকে interest বা অনুরাগ। অনুরাগের তাগিদে বুদ্ধি, অনুভূতি আর কল্পনার স্পর্শ না লাগলে ঘটনা তাৎপর্যহীন ঘটনাই থেকে যায়, তাৎপর্যময় অভিজ্ঞতায় পরিণত হয় না। তা হলে মুখ্যভাবে না হলেও, গৌণভাবে—অভিজ্ঞতার মারফতে—জ্ঞানের গোড়ায়ও অনুরাগ। অনুরাগ ছাড়া যে জ্ঞান সে তো information বা সংবাদ মাত্র সত্যকার জ্ঞান নয়। (তাই দেখতে পাওয়া যায়, পরীক্ষায় ভালো করার তাগিদে পড়নেওলাদের চেয়ে ভালো লাগার তাগিদে পড়নেওলাদের পড়াটা অনেক সার্থক।)

ভেতরমুখো লোকটি বাইরের ব্যাপারে আনন্দ পায় না বলে অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে পারে না। বিশ্ব ব্যাপারে তার রুচি নেই। এমন যে প্রকৃতি, বৈচিত্র্যের ডালি সাজিয়ে যে তাকে প্রদক্ষিণ করছে, সেও তার প্রাণে সাড়া জাগাতে পারে না। যতই সে ভেতরের দিকে তাকায় ততই যেন ভেতরের শূন্যতা তাকে হাঁ করে গিলে ফেলতে চায়। শূন্য, শূন্য, ভেতরটাও শূন্য। বাইরমুখো মানুষটির অবস্থা কিন্তু এরকম শোচনীয় নয়। সে যখন কোন শুভমুহূর্তে নিজের ভেতরের দিকে তাকায় তখন দেখতে পায় সেখানে এক অপূর্ব সৃষ্টিক্রিয়া চলছে—এক গুণী যেন বসে বসে জগতের খণ্ডবিচ্ছিন্ন ঘটনার সমাবেশে এক অনবদ্য মূর্তি গড়ে তুলছে। সে মূর্তির কী দীপ্তি, কী সুষমা ! এ-যেন তার শক্তি নয় অপরের শক্তি—কোন সুদূর পারের অচেনা অজানা দেবতার খেলা।

এমনি করেই, এই বিস্ময়বোধের তাগিদেই জীবন দেবতার সৃষ্টি। জীবন দেবতা হয়তো একটা myth বা কল্পনা—মানুষেরই সৃষ্ট ব্যাপার। কিন্তু জীবন-সমৃদ্ধির সহায়ক বলে মিথ্যা হলেও তা পরম

সত্য। দার্শনিক তাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারে, কিন্তু ক্রিয়েটিভ মানুষ তার জাগ্রত উপস্থিতি উপলব্ধি না করে পারে না। সে যে তার প্রতিভারই জাগ্রত জীবন্ত রূপ। তাকে সে অগ্রাহ্য করবে কী করে?

এখন এই যে সৃষ্টির খেলা এতো কেবল ভেতরের ব্যাপার নয়; বাইরের ব্যাপারও। বাইর-ভেতর উভয়ের শুভ-মিলনেই এর জন্ম। শিল্পের উপাদান বাদ দিয়ে শিল্পীর মন ব্যর্থ, আবার শিল্পীর মন বাদ দিয়ে শিল্পের উপাদানও অর্থহীন। প্রকৃতি আর পুরুষ নিয়ে জীবনের খেলা। শিল্পের উপাদান প্রকৃতি, আর শিল্পীর মন পুরুষ। একটাকে বাদ দিয়ে আরেকটা অসার্থক।

[এখানে know thyself, আত্মানং বিদ্ধি নিজেকে জানো কথাটা আপনা আপনি এসে পড়ে। বহুকাল প্রচলিত হলেও কথাটা পূর্ণ সত্য নয়- অর্ধ সত্য। বাইর আর ভেতর এই উভয়কে নিয়েই পূর্ণ সত্য। ভেতরকে আমরা জানি বাইরের মারফতেই, ভেতরে যে স্বাদগন্ধ নেওয়ার ক্ষমতা আছে, সেটা উপলব্ধি করার শক্তি আছে—বাইরের সঙ্গে যুক্ত হয়েই তা আমরা টের পাই। আবার ভেতরের স্পর্শ ব্যতীত বাইরটাও তাৎপর্য-সমন্বিত হয় না। মহাকবি গ্যেটে বহুপূর্বেই আমাদের এ সম্বন্ধে সচেতন করেছেন।

এই বিখ্যাত উপদেশ 'নিজেকে জানো' শুনতে এত ভালো হ'লেও চিরদিন আমার মনে জাগিয়েছে সন্দেহ: মনে হয়েছে এ যাজকসমাজের এক ফন্দীবাজী—ওরা মানুষকে চলেছে ঠকিয়ে তাদের কানে অসম্ভব সব মন্ত্র দিয়ে মানুষের মুখ কর্মময় জীবন থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে আত্মার-রহস্য-চিন্তারূপ নিষ্ফল ভাবনার দিকে। মানুষ যতটা জগৎকে জানে ততটাই জানে নিজেকে, এর একটি সম্বন্ধে তার জ্ঞান আসে অন্যটির সাহায্যে। নতুন বস্তু ভালো করে দেখার ফলে আমাদের অন্তরে সৃষ্টি হয় নতুন ইন্দ্রিয়।] ১

বাইর আর ভেতর যখন কোন শুভমুহূর্তে হরিহরাত্মা হয় তখনই জীবন স্বর্গীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তখন স্বতঃই বলতে ইচ্ছে হয়:

আজ প্রভাতের আকাশটি এই শিশির-ছলছল,
নদীর ধারের ঝাউগুলি ঐ রৌদ্রে ঝলমল,
এমনি নিবিড় করে
এরা দাঁড়ায় হৃদয় ভরে
তাইত আমি জানি
বিপুল বিশ্বভুবন খানি
অকূল মানস-সাগরজলে কমল টলমল।

এই অনির্বচনীয় উপলব্ধি কখনো একাকিত্বের নয়, নির্জনতার। একাকিত্ব কখনো জীবনকে ফলপ্রসূ করে না, বন্ধ্যা করে। আর নির্জনতা করে ফলপ্রসূ বিশ্বের সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে দিয়ে।

জেস্ট নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে। শার্লক হোমস যখন পথে-পড়া একটি হ্যাট তুলে নিয়ে তার দিকে তাকায় তখনই বুঝতে পারে, তার মালিকটি সুরাপায়ীর লাড়কা এবং সে বেচারী আর পূর্বের মতো পত্নীর প্রেম পাচ্ছে না। এমন সামান্য একটা বস্তু থেকে যে-ব্যক্তি এতটা আবিষ্কারের আনন্দ পেতে পারে জীবন তার কাছে কখনো বিস্বাদ বোধ হতে পারে না। নানা বস্তু নানা ব্যাপার তার তাঁবেদারির জন্য প্রস্তুত থাকে। একবার মন খুলে গ্রহণ করলেই হল। একটু ইশারা পেলেই তারা খেদমতের জন্য ছুটে আসে—'ও আমাকে চাচ্ছেন, এই যে আমি' বলে। গাঁয়ের পথে চলতে গেলে যে বিচিত্র মানুষ নজরে পড়ে তাদের কথা একবার ভেবে দেখুন। তাদের কেউবা পক্ষীপ্রেমিক, কেউবা ভূতত্ত্বের অনুরাগী, কারো নজর বা গাছগাছড়ার প্রতি, আর কেউবা মেতে আছে চাষবাস নিয়ে। অনুরাগের চোখে দেখলে এদের প্রত্যেকটি থেকেই আপনি যথেষ্ট

আনন্দ চয়ন করতে পারেন। অনুরাগ না থাকলে অবশ্যি ভিন্ন কথা। পূর্বেই বলেছি, অনুরাগই আনন্দ; অনুরাগের অভাবই আনন্দের অভাব। কথাটির উপর জোর দেওয়ার দরকার আছে বলে বারবার বলছি।

কিন্তু এই যে অনুরাগ এ সব মানুষের মধ্যে সমান নয়। ট্রেনে চলবার সময় দেখবেন, কোন লোক তার সহযাত্রীদের দিকে একেবারেই তাকায় না, নিজেকে নিয়েই সে ব্যস্ত; আবার কেউ হয়তো সকলের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই তাদের সম্বন্ধে একটা মোটামুটি রকমের ধারণা করে নেয়। নিজেকে ফাঁকা রাখতে হয় না বলে এ লোকটিরই জিত। সময় তার উপর বোঝার মতো চেপে থাকে না। কোন কোন লোকের কাছে মানুষমাত্রই বিরক্তিকর, কেউ কেউবা প্রত্যেককেই বন্ধুর মতো গ্রহণ করতে প্রস্তুত প্রচুর ভালোবাসা ভেতরে আছে বলে সকলকেই তার ভালো লাগে, সকলের জীবনের রসই সে পান করতে উন্মুখ। এভাবে সর্বব্যক্তিত্বের সংঘাতে সংকীর্ণ ব্যক্তিত্বের বেড়া ভেংগে দিয়ে যে-উদার নব ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি, তা-ই কালচার্ড জীবনের উদ্দেশ্য। 'সবার-পরশে-পবিত্র করা তীর্থনীরে স্নাত না হলে সংস্কৃতিবান হওয়া যায় না।

এবার ভ্রমণের প্রসংগে আসা যাক। কতগুলি লোক সারা দুনিয়াটাই ঘুরে বেড়ায়; কিন্তু কিছুই দেখে না, কিছুই অনুভব করে না। তারা ভালো-ভালো হোটেলে ভালো-ভালো খানা খায়; বাড়ীতে যেমনটি বিদেশেও তেমনটি তাদের আহার। দেশে যে ধরনের লোকের সংগে দহরম-মহরম বিদেশেও তেমন লোকের সঙ্গেই তাদের হৃদ্যতা। আলাপের বিষয়-বস্তুটিও অভিন্ন, সেই থোড়বড়ি খাড়া, খাড়াবড়ি থোড়। এই হতভাগ্যরা ভ্রমণ করে বটে কিন্তু ভ্রমণের আনন্দ পায় না। তাদের পক্ষে বাড়ীতে বসে থাকা যা বিদেশে যাওয়াও তাই। ঘরে ফিরে এসে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে তারা বলে: বাবা, বাঁচা গেল, ঘুরে ঘুরে খামখা হয়রান হচ্ছিলাম;

কী বেফয়দা দিক্‌দারী। ব্যর্থ, ব্যর্থ এদের ভ্রমণ, জীবনও। বাহির ভুবন ঘুরে মিলে অন্তরের ঠাকুর—এ কথাটা তাদের জীবনে সত্য হয় না। আরেক ধরনের ভ্রাম্যমাণ আছে তারা যেখানেই যায় সেখানকার লোকদের সংগে মিশ খেয়ে যায়। তারা যায় দেশকে জানতে, দেশের ধরনধারণ চলাফেরা দেখতে। [সকলের জীবন থেকে মধু আহরণ করে নিজের অন্তরকে মৌচাকের মতো গড়ে তোলাই তাদের উদ্দেশ্য। তাদের ভ্রমণ ও বাঁচা উভয়ই সার্থক। তারা শুধু দেয় না, নেয়ও। রসের তাগিদে তারা সকলের সঙ্গে মেশে, সকলের আত্মার স্পর্শ নেয়। শুধু দেওয়ার মধ্যে যে একটা হামবাড়ামি আছে তা তাদের পীড়িত করে। দেখ গো আমরা শুধু দিতে এসেছি, নিতে আসি নি, আমাদের নেওয়ার মতো এখানে কিছুই নেই,—একথা বলে তারা অহমিকা তথা বর্বরতার পরিচয় দেয় না। তারা জানে, সভ্যতা মানে নেওয়ার জন্য হাত পাতা। যে ব্যক্তি বা জাতি যত বেশী সৌন্দর্যের জন্য, প্রেমের জন্য, সত্যের জন্য মানুষের দুয়ারে হাত পাতে সে তত বেশী সভ্য ; কেননা সে তত বেশী মূল্যবোধের পরিচয় দেয়। আর যারা 'আমরা এই দিয়েছি' বলে সিনা ফোলায় আর মাথা উঁচু করে তারা তত বেশী অসংস্কৃত। সভ্যতা গর্বের ব্যাপার নয় আনন্দের ব্যাপার। আর আমরা এই দিয়েছি কথাটার মধ্যে গর্বই বড় হয়ে ওঠে, আনন্দ নয়।] যেখানেই যায় সেখানকার বিশেষত্বটুকু তারা পুরাপুরিই আদায় করে নেয়। 'ভিখারী তোর ফিরবে যখন ফিরবে রাজার মতো'—এই প্রতিজ্ঞা নিয়েই যেন তারা বেরিয়ে পড়ে ; তাই ফিরবার সময় ফেরে শীতের সন্ধ্যা ভরিয়ে তোলবার মতো সমৃদ্ধি নিয়ে।

[ইংরেজীতে একটা মরা প্রবাদ আছে যার বাংলা হচ্ছে : রোমে থাকলে রোমকদের মতোই ব্যবহার করবে। পরম জীবনবোধের প্রকাশক হলেও, কথাটির প্রভাব ইংরেজের জীবনে নেই। তাই প্রবাদের আগে মরা বিশেষণটা প্রয়োগ করা হল। ইংরেজরা

এদেশে কতদিন বাস করে গেল, কিন্তু না শিখলে দেশের ভাষা, না জানলে দেশবাসীকে। তাই কি জ্ঞানের দিক দিয়ে কি রসের দিক দিয়ে তাদের বঞ্চিত থাকতে হল। এক হিসেবে দেখতে গেলে তো ইংরেজের ভারত আগমনটা একেবারে ব্যর্থ। দেশ থেকে তারা সোনাদানা নিয়েছে বিস্তর কিন্তু মানস-সমৃদ্ধি নেয়নি তেমন কিছু। এদেশে তারা বাস করলে শুদ্ধ রাষ্ট্রের প্রতীক হিসাবে, মানুষ হিসাবে নয়। মানুষ হিসাবে বাস করলে এমন শ্রেষ্ঠমন্যতার ঘেরাটোপের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারত না—দেশের সাধারণ মানুষকে জানার জন্য একটা আকুলতা বোধ করত। নদীর গতির মতো মহত্বের গতিও নীচের দিকে। ইংরাজ রাজপুরুষরা যে সাধারণের স্পর্শকে দূরে ঠেকিয়ে রেখে কেবল দীনপ্রাণ রায়বাহাদুর-খাঁ বাহাদুরদের দ্বারা পরিবৃত থাকতে চাইতো, এতেই বুঝতে পারা যায়, মহত্বের ক্ষুধা তাঁদের ছিল না, মাঝারির সতর্কতা নিয়ে জীবন যাপন করতেই তারা ভালোবাসতো।

উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে,
তিনিই মধ্যম যিনি থাকেন তফাতে।

ইংরেজ কর্মচারীরা মাঝারিত্বেরই পরিচয় দিয়ে গেছে, মহত্বের নয়। এরূপ নিষ্প্রাণ ভাবে চলে তারা রাষ্ট্রের উপকার করলে বটে, কিন্তু নিজেদের ক্ষতিও করলে বিস্তর। নিজেকে; নিজের আত্মাকে তারা মেরে ফেললে। সবচেয়ে বড় গুণ যে নমনীয়তা তা, থেকে তারা বঞ্চিত হল। ইংরেজ কর্মচারীদের সম্বন্ধে তো একথা বললুম, এখন ইংরেজের অনুসারী দেশী বড় সাহেবদের বেলা কী বলা যায় তা-ও গাওর করকে দেক্‌খো। তারাও তো 'ড্যামড্‌স' বলে দেশবাসীকে সরিয়ে রাখতে চায়।]

জীবন উপভোগের দিকে তাকালে যে-মানুষটির স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা নেই তার চেয়ে যার রয়েছে সে অনেক ভাগ্যবান। সে

শ্রাবণের আকাশের মতো মুখ ভারী করে রাখে না, ফাগুনের আকাশের মতো হাসে ও হাসায়। উপভোগের বস্তু সে সর্বত্র ছড়ানো দেখতে পায়। সকলেই যেন তার দৃষ্টির সোহাগ পেতে ব্যগ্র। 'অভিজ্ঞতা মাত্রেরই যে একটা রস আছে, সেই রসে সে জীবন সিঞ্চিত করে নেয়। যাকে বলা হয় বিশ্রী অভিজ্ঞতা তারও একটা স্বাদ আছে। বাস্তবে তা মন্দস্মৃতির ব্যাপার হলেও তা-ই 'সুখদায়ী হয়ে ওঠে। সিসিলি দেশের গ্রাম আর চীনা জনতার গন্ধ যখন প্রথম পেয়েছিলাম তখন তা' আমার কাছে তেমন ভালো লাগেনি, কিন্তু এখন তাদের স্মৃতিতে মন খুশী হয়ে ওঠে। মন খুলে সবকিছু দেখলে সমগ্র মনটা একটা ছবির বই হয়ে যায়। অবসর সময়ে সেই বইয়ের পাতা উল্টাতে বেশ লাগে। দুঃসাহসিক লোকেরা ভয়ঙ্করতার ভেতর দিয়ে গিয়েও একটা আনন্দ পায়। সংকটময় মুহূর্তের স্মৃতিটুকু কী চমৎকার! মরতে-মরতে বেঁচে যাওয়ার কালে হৃদপিণ্ডের যে ধুকধুকানি তার স্মৃতির চেয়ে আনন্দকর কী আছে। সে মরল না অথচ মৃত্যুর সাথে একরকম করকম্পন করে এলো। ভাগ্যবান সে। অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার তার পূর্ণ হল। তাই জাহাজডুবি, অগ্নিকাণ্ড, ভূমিকম্প এসব অপ্রিয় ব্যাপারের স্মৃতিও তার কাছে মনোরম। এসব ব্যাপার যে কী, সে সম্বন্ধে পূর্বে তার কোন ধারণা ছিল না, এখন চোখের সামনে ঘটে যাওয়ায় বুক ফুলিয়ে বলতে পারে: ও জাহাজডুবি? সে তো এরকম—এবং বলে একটা গর্ব ও তৃপ্তি বোধ করতে পারে। গল্প বলার ঝোঁক সকলের ভেতরেই আছে। নিজের অভিজ্ঞতার সুতো দিয়ে গল্প তৈরী করতে পারলে যে আনন্দ পাওয়া যায় তার তুলনা হয় না। তাই বলছি, প্রিয় হোক, অপ্রিয় হোক অভিজ্ঞতা মাত্রই আনন্দ। জেস্ট বা স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা বজায় থাকলে সব ব্যাপার থেকে রস আদায় করা যায়। দীর্ঘকাল অত্যাচার সহ্য করেও আমৃত্যু জেস্ট বজায় রেখেছে, এমন লোকও চোখে পড়ছে।

জেস্ট দু'প্রকারের: সাধারণভাবে পাওয়া আর বিশেষভাবে আহৃত। Borrow-র রচিত 'Romany Rye' গ্রন্থে একটি বিশিষ্ট চরিত্র আছে, যার ভেতর এই অর্জিত উপভোগ-ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। পত্নীবিয়োগের পর ভদ্রলোকটি জীবনের প্রতি একেবারে বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েন। কিছুই তাঁর ভালো লাগত না; খাওয়া দাওয়া, ঘোরাফেরা সমস্ত কিছুই বিস্বাদ মনে হত। চা'র পেয়ালার উপর লেখা চীনা ভাষার উক্তিগুলি উদ্ধার করতে গিয়েই তিনি আবার হারানো ভালো লাগাকে ফিরে পান। ফরাসী ভাষা লিখে French Chinese Grammar-এর (ফ্রেঞ্চ চাইনিজ গ্রামার) সহায়তায় তিনি যখন সে উক্তিগুলি পড়তে সক্ষম হলেন তখন তাঁর কী উল্লাস! সার্থকতার তৃপ্তিতে তার মন ভরে উঠল। এই হচ্ছে আহৃত জেস্টের নমুনা। আমি এমন লোকও দেখেছি, যিনি সারা জীবন Gnostic heressy-র (নস্‌টিক হেরেসির) তথ্যানুসন্ধানে কাটিয়ে দিয়েছেন। আরেকটি লোককে জানি, যার জীবনের মূল আকর্ষণ ছিল হবসের রচনার পাণ্ডুলিপি পরীক্ষণ। কে কোন্ ব্যাপারে অনুরক্ত হবে আগে থাকতে বলা কঠিন; তবে কোন-না কোন ব্যাপারে মানুষ অনুরক্ত হবেই, একথা এক রকম হলপ করেই বলা যায় এবং একবার অনুরাগের স্পর্শ পেলে ক্লান্তিবোধ আর তাকে কাবু করতে পারবে না। সাধারণ অনুরক্তির চেয়ে বিশেষ অনুরক্তি কর্মপ্রীতিদায়ী, তাই সাধারণ অনুরক্তির প্রতি নজর রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। 'শুধু অকারণ পুলকে যাতে ক্ষণিকের গান ক্ষণিক দিনের আলোকে গেয়ে যাওয়া যায়' সে চেষ্টা করাই ভালো। বিশেষ অনুরক্তি মানুষের সমগ্র জীবনকে ভরে তুলতে পারে না এবং অল্প সময়েই জানা হয়ে যায় বলে অনুরাগের বিষয়টিও সহজে ফুরিয়ে যায়।

হয়তো আপনার মনে আছে, আমাদের ভোজের তালিকায় এমন একদল লোকের কথা বলেছিলাম যারা অতিভোগ বা ঔদরিক-

তাকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে ধরে নেয়। এই অতি-ভোগী আর জীবনের সহজ প্রীতিসম্পন্ন তথা জেস্টসম্পন্ন মানুষকে হয়তো আপনারা এক-পর্যায়ভুক্ত করতে চাইবেন। কিন্তু তা' করলে অন্যায় করা হবে। ও দুটি মানুষ আসলে এক পর্যায়ের নয়। কেন নয়, তা-ই বলছি।

প্রত্যেকেই জানেন, প্রাচীনরা পরিমিতিবোধ বা মিতাচারকে জীবনের শ্রেষ্ঠ গুণ বলে মনে করতেন। মিতাচারের মারফতে তাঁরা আত্মকর্তৃত্বের স্বাদ পেতেন। না, প্রবৃত্তি আমার চালক নয়, আমিই প্রবৃত্তির চালক, প্রবৃত্তির গোলামি করতে আমার জন্ম নয়—এমনি একটা মনোভাব তাঁদের মূল প্রেরণা হয়ে দাঁড়াত। রোমানটিজম আর ফরাসী-বিপ্লবের সময় থেকে এই মনোভাবটি পরিত্যক্ত হতে থাকে এবং তার স্থান জুড়ে বসে অভিভূতিকর প্রবৃত্তিসমূহের জবরদস্তি। তখন থেকেই সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার বাই মানুষকে পেয়ে বসে এবং মানুষ জীবনের ভারসাম্য ভুলে গিয়ে একরোখামির পরিচয় দিতে শুধু করে। বাইরনের নায়ক-নায়িকার মধ্যে যে প্রবৃত্তির প্রাবল্য দেখতে পাওয়া যায়, অসামাজিক আর ধ্বংসকর হওয়া সত্ত্বেও তা মানুষের মন ভোলায়। কিন্তু প্রাচীনরাই ঠিক, এ-পথ ভুল। এ-পথে জীবনের উপর কর্তৃত্ব থাকে না, বলগাহীন পাগলা ঘোড়ার মতো জীবন মানুষটিকে নিয়ে যদৃচ্ছা ছুটে চলে। শান্ত-সংযত-জীবনের সৌন্দর্য তখন মানুষটির জীবনে আর পাওয়া যায় না। সে অনবরত ধ্বংসের দিকে ধাবিত হতে থাকে। এই ধ্বংসের চিত্র একজাতের রোমান্টিকভাবাপন্ন মানুষকে পাগলপারা করে তোলে। মৃত্যুর মাঝে তারা জীবন দেখতে পায়। কিন্তু একরোখামি নয়, ভারসাম্যই জীবন। ওখানেই মানুষের নৈপুণ্য ও কর্তৃত্বের প্রকাশ। জীবনের পরিপূর্ণ স্বাদ ভারসাম্যেরই হাতে। একটা ঘোড়া আপনাকে নিয়ে ছুটে চলেছে, আর পাঁচটা ঘোড়াকে আপনি ছোটাচ্ছেন। কোন্‌টা গ্র্যাণ্ড?

ভারসাম্য মানে জীবনের উপর প্রভুত্ব। জীবনের বিচিত্র দিক আছে, আর প্রত্যেকটি দিকের স্বাদ পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, প্রবৃত্তির প্রবলতায় মানুষটি একদিকে ভেসে চলে। সুস্থ ও সুন্দর জীবনে প্রত্যেকটি দিকেরই স্থান আছে। নানা দিকের সমন্বয়ে জীবনকে একটা ফুলের তোড়ার মতো সাজিয়ে তোলা জীবন-শিল্পীর কাজ। একঘেয়েমি বিরক্তিকর এক রঙা ফুলে বাগানের জৌলুস বাড়ে না। উদ্যানের যে ময়ূরকণ্ঠী রূপ তাতেই উদ্যানের মনোহারিতা। যে-লোকটি পেটুক, কেবল রাক্ষসের মতো গিলতে ভালোবাসে, সে জীবনের অন্যান্য স্বাদ থেকে বঞ্চিত। স্বাদের পরিপূর্ণতায় তার ঘাটতি পড়ে। পেটুকতা সম্বন্ধে যা বলা হল অপরাপর প্রবৃত্তি সম্বন্ধে তা সত্য।

প্রবৃত্তির প্রাবল্য যে কেবল নিজের বেলা ক্ষতিকর, তা নয়, অপরের জীবনকেও তা দুঃখময় করে তোলে। সম্রাজ্ঞী যোসে-ফাইনের বস্ত্রবিলাসের দরুন ফরাসীদের জেনোয়া হারাতে হয়েছিল, এমনি একটা গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটা হয়তো আপনাদের জানা, তবু বলছি। পরিচ্ছদ-বিলাসিনী যোসেফাইন প্রতি মাসে বিস্তর কাপড় খরিদ করতেন। সেজন্য নেপোলিয়নের ক্ষোভের অন্ত ছিল না। প্রতিবারই তিনি যোসেফাইনকে সাবধান করে দিতেন অত টাকার কাপড় না কিনতে। তথাপি যোসেফাইন কাপড় কেনার বাই ছাড়তে পারেননি। শেষে নেপোলিয়ন বলতে বাধ্য হলেন, কাপড় কেনার ব্যাপারে বিবেচনার পরিচয় না দিলে তিনি আর বে-আন্দজী টাকা দিতে পারবেন না। কিন্তু স্বভাব যায় না মলে। বস্ত্র-বিলাসিনী যোসেফাইন বস্ত্র কেনার ব্যাপারে আর মিতাচারের পরিচয় দিতে পারলেন না। তাই পরের মাসে দর্জি সাহেব যখন বিল নিয়ে হাজির তখন তিনি মুশকিলে পড়লেন। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় বুদ্ধির শেষ প্রান্তে এসে ঠেকা, তাঁরও সে অবস্থা হল। কি করেন? হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে

গেল। আচ্ছা, সমরমন্ত্রীকে বিলের টাকাটা চুকিয়ে দিতে বললে হয় না? বেটা না দিয়ে যাবে কোথায়? যেমন ভাবা, তেমন কাজ, তেমনি ফল লাভ। চাকরি যাওয়ার ভয়ে সমরমন্ত্রী সত্যি সত্যি টাকাটা দিয়ে ফেললেন। ফলে অর্থের অভাবে জেনোয়া ফরাসীদের হাতছাড়া হয়ে গেল। কোন কোন বইতে এরূপ লেখে বটে, কিন্তু ব্যাপারটা কতদুর সত্য তা বলা কঠিন। সত্য না হলেই বা কি? সম্ভাব্যতা যখন রয়েছে তখন তা সত্য না হলেও সত্য। এমন হয়তো ঘটেনি, কিন্তু ঘটা অসম্ভব ছিল না।

কাম আর সুরাসক্তদের বেলায়ও সেই এক কথা। তারাও সমগ্র জীবনকে বঞ্চনা করে জীবনের একটা দিকেই ঝোঁকে। তাই জীবনের পরিপূর্ণ স্বাদ পায় না। সুন্দর জীবনের নীতিটা হচ্ছে এই: সবকটা প্রবৃত্তিকে জীবনের সাধারণ কাঠামোর মধ্যে সুসঙ্গতভাবে ঠাঁই দেওয়া চাই। প্রকৃত সুখের স্বাদ পেতে হলে প্রত্যেকটা দিক্‌কে স্বাস্থ্যের সঙ্গে, গার্হস্থ্যের সঙ্গে পরিপার্শ্বিকের সঙ্গে যথাসম্ভব বনিবনাও করে চলতে হবে। নইলে সুখ পাওয়া যাবে না, জীবনে বিকৃতি দেখা দেবে। প্রবল প্রবৃত্তিবেগ জীবনের দুঃখ ও অশান্তি ডেকে আনে; তাই তা ক্ষতিকর। প্রবৃত্তির প্রবলতা কমানোর উপায় হচ্ছে জীবনের সবকটা দিকের প্রতি নজর রাখা। তা হলেই তাদের আর বাইরের শাসন দ্বারা দমাতে হয় না একটার খাতিরে আরেকটা আপনা-আপনি সংযত থাকে। আপনার টেবিলে যদি মাত্র একটা খাবার থাকে তো আপনি তার সবটুকুই গ্রহণ করবেন, এ স্বাভাবিক। যদি অনেকগুলি পদ থাকে তো আপনার মর্জি-মাফিক সব কটি থেকে অথবা কয়েকটি থেকে কিছু কিছু গ্রহণ করবেন এবং কোনটা থেকেই বেশী নেবেন না। তাতে করে শরীর ও মন উভয়েরই লাভ; মন পায় বিচিত্র স্বাদ আর শরীর পায় বিচিত্র উপাদান। যে-জীবন বিচিত্র স্বাদের প্রতি লক্ষ্য রেখে চলে সে-জীবনই সুস্থ জীবন, যে-জীবনে রুচি সীমাবদ্ধ সে জীবন রুগ্ন, বিকৃত।

উপরে যে স্বাস্থ্য, পরিবার আর সমাজের নিরাপত্তার কথা বলা হল, সেই সীমারেখা মেনে নিয়েই কোন কোন প্রবৃত্তির যদৃচ্ছা প্রয়োগ সম্ভব। ধরুন, কোন লোক দাবা খেলতে ভালোবাসে। এখন এ লোকটি যদি প্রচুর অর্থের অধিকারী আর অবিবাহিত হয় তো বাতিকটি না কমালেও তার ক্ষতি হয় না। কিন্তু দরিদ্র ও বিবাহিত হলে তার দাবার নেশাকে না দমালে সে অন্যায় করবে। সুরাসক্তি ও পেটুকতা যে কেবল সমাজের দিক দিয়েই ক্ষতিকর তা নয়, ব্যক্তির নিজের তরফ থেকে বিচার করতে গেলেও তা মন্দ। ক্ষণস্থায়ী আনন্দের পরিবর্তে তা নিয়ে আসে বহুকালস্থায়ী দুঃখ। সুরাসক্তি আর পেটুকতার জন্য যে স্বাস্থ্যহীনতার দুঃখ ভোগ করতে হয়, সে তো জানা কথা। প্রথম ব্যাপারটা অর্থাৎ দাবাখেলার প্রবৃত্তিটা কেবল সমাজ আর পরিবারের দিকে তাকালেই মন্দ, ব্যক্তির দিকে তাকালে নয়; কিন্তু দ্বিতীয় ব্যাপারটা কী পরিবার কী ব্যক্তি সব দিক দিয়েই মন্দ।

কতগুলি জিনিস নিয়ে জীবনের কাঠামো তৈরী হয়। সেই কাঠামোর মধ্যে খাপ খেতে না চাইলে প্রবৃত্তি দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কাঠামো গঠনকারী সে-সব জিনিস হচ্ছে স্বাস্থ্য, অর্থস্বাচ্ছন্দ্য, শারীরিক ও মানসিক শক্তি, আর পারিবারিক দায়িত্ব। দাবার নেশার তাগিদে যারা এ সবের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না তারা সুরাসক্তদের মতোই মন্দ। তবে এই ধরনের লোকদের যে ততটা খারাপ নজরে দেখা হয় না তার কারণ আমাদের পাপবোধ বুদ্ধিজাত নয়, সংস্কারজাত; আর এই ধরনের লোকেরা সাধারণতঃ বিরল-প্রতিভার অধিকারী বলে তাদের মন্দ বলতে লোকেরা ভয় পায়। গ্রীক মিতাচারের প্রয়োজন এখানেই। যে-দাবা রসিকটি তার প্রিয় খেলাটির জন্য সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে থাকে এবং কাজের ফাঁকে ফাঁকে তার পদধ্বনি শুনতে পায়, তার মতো সুখী আর কে? আছে, আছে, তার মন ভরাবার মতো

একটা নেশা আছে, অথচ তা তার পরিবার কি পেশার সঙ্গে বিবাদ করে না। কিন্তু যে-লোকটি দাবাখেলার জন্য কাজে গাফেলতি করে সে হতভাগ্য—গ্রীক পরিমিতিবোধ তার আয়ত্ত হয়নি বলতে হবে।

এখানে টলস্টয়ের কথা মনে পড়ল। রণক্ষেত্রে বীরত্ব প্রকাশের দরুন একবার সম্মানিত করা হবে বলে সাব্যস্ত হল। সম্মানের দিন তিনি দাবাখেলায় এমন মেতে উঠলেন যে, সভায় না-যাওয়াই স্থির করলেন। টলস্টয় জানতেন, যে সম্মান তিনি পেতে চলেছেন তা পেলেই কি আর না-পেলেই কি। তার জন্য আরো বহু বড় সম্মান প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু টলস্টয়ের মতো অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মানুষকে যে অবজ্ঞা মানায় আমাদের মতো চুনোপুঁটিদের তা মানায় না, এ কথাটা মনে না-রাখলে ভুল করা হবে।

প্রবৃত্তি সম্বন্ধে যা বলা হলো, ভাব সম্বন্ধেও তা সত্য। ভাবের একঘেয়েমিও মন্দ। একটি ভাব বড় হয়ে উঠে যদি বোয়াল মাছের মতো অপরাপর সূক্ষ্ম ভাবকে খেয়ে ফেলতে চায় তো জীবনের স্বাদ নষ্ট হয়। জীবনবীণার কয়েকটি তার মোটা কয়েকটি সূক্ষ্ম। এই সরু- মাটা নিয়েই জীবন। সূক্ষ্মগুলি মোটাগুলির চেয়ে কম সত্য মনে করে যদি তাদের বর্জন করা হয় হয়তো অন্যায় করা হবে। (এক হিসাবে দেখতে গেলে তো সূক্ষ্মগুলি বেশি সত্য, কেননা সেগুলিই মানবিক ; মোটাগুলি কম সত্য, কেননা সেগুলি জৈব।) সরু মোটা সব কয়টি তার যদি সুন্দরভাবে বেজে ওঠে তা' হলেই জীবনবীণায় স্বর্গীয় সুখ ঝরে পড়ে, নইলে তার আওয়াজ যে একতারার মতো একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর। এখানে প্রাচীন রজ্জবজীর একটা আধুনিক উক্তি মনে পড়ল : 'জীবনের সবদিককে সব ভাবকে পূর্ণ করিয়া সাধনা পূর্ণ কর। বাঘ-বিড়াল প্রভৃতি জন্তু কয়েকটি বাচ্চা প্রসব করে, তাই দুই একটাকে প্রবল করিতে অন্যগুলিকে মারিয়া খাওয়ায় তেমনি সাধনায় যদি একটি দুইটি

ভাব পূর্ণ করিতে জীবনের ভাবগুলিকে বধ করা হয় তবে বাঘ বিড়ালের সাধনাই হয়। দয়াপুষ্ট করিতে গিয়া কেহ যদি পৌরুষ নষ্ট করিয়া ক্লীব হইয়া যায় তবে সে সাধনার বলিহারী। বীরদের উপরেই সংসারের সব নতুন সৃষ্টির ভার। কাপুরুষেরা জগতে কি সৃষ্টি করিতে পারে?* রজ্জবজী যে-কথাটা স্নেহমমতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন সেটা অন্য ব্যাপারেও প্রয়োগ করা চলে। সর্বাঙ্গীন সাধনার উপর জোর দেওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

মতবাদের নেশা অনেক সময়ে মানুষকে একঘেয়েমির দিকে টেনে নিয়ে যায়। তখন অপরাপর নেশার মতো তাও বৈচিত্র্য-ধ্বংসী তথা জীবনধ্বংসী হয়ে উঠে। প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় এই ধরনের নেশাগ্রস্ত লোকেরা বিশেষ একটা কথা ছাড়া অন্য কথা বলতে পারে না বা বলে না। এদের মিশনারি প্রকৃতিতে আপনি বিরক্তিবোধ না করে পারেন না। একটি কথাই যদি বারবার আপনার কানের কাছে বলা হয় তো আপনি আর কত সহ্য করবেন? মিশনারির মতো তারাও প্রচারধর্মী। পার্থক্য কেবল মিশনারির দৃষ্টি পরকালের দিকে, এদের দৃষ্টি পরবর্তী কালের দিকে। ইহকাল বা বর্তমান কালের দিকে কারোরই সুনজর নেই। হবে, হবে, পরকালে হবে, ইহকাল আর ক'দিনের, সে তো চন্দরোজ। পরকালে কী করে সুখের জীবন পেতে পারেন সে ব্যবস্থা করুন। হবে, হবে, পরবর্তীকালে হবে, এখন কি একটা বাঁচার সময় না-কি? যে-সুদিন আসছে তার দিকে চেয়ে থাকুন, তার জন্য প্রাণপাত করুন; বর্তমানের কথা ভেবে নাহক নিজেকে ক্ষুব্ধ করবেন না।—ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানকে তারা বিকিয়ে দিতে প্রস্তুত। বর্তমানে আপনার জীবনকে কী করে সফল করে তোলা যায়, কী করে বর্তমান পরিস্থিতেই আপনি বাঁচার স্বাদ পেতে

* ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা—ক্ষিতিমোহন সেন।

পারেন—আনন্দে-পুণ্যে জীবনকে ভরে তুলতে পারেন—সে-সম্বন্ধে তারা কিছুই বলে না। ভাবের ওই একঘেয়েমির জন্য তাদের জীবন হয়ে পড়ে বিরস এবং তারা অন্তরঙ্গ সংগদাতা না হয়ে, হয়ে ওঠে উপদেশদাতা। আপনি যদি ভাবের লোক হন তো আপনার ভাবের মধ্যে কোথায় কোন্ অবৈজ্ঞানিকতা লুকিয়ে রয়েছে, তা তারা খুঁটে খুঁটে বের করবে এবং আপনি মত বা ভাব বর্জন করে যাতে একটা প্রচলিত মতবাদে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন সে দিকে ইঙ্গিত জানাবে। এরা রসিক নয় তার্কিক, একটা মতবাদের ফরমুলার দিকে তাকিয়ে তর্ক করে। সেই মতবাদের পান থেকে চুন খসলে তারা সহ্য করে না। আপনি করেন কি-না জানিনে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এদের সহ্য করতেন না। এদেব সম্বন্ধে তাঁর ধারণাটা শোনবেন?

'যে পাড়ায় ক্রোশ তিনেকের মধ্যে তার্কিক লোকের গন্ধ আছে, সেখানে বোধ করি কোন ভাবুক লোক তিষ্টিতে পারেন না। বোধ করি, তার্কিক লোকের মুখ দেখিলেই ভাবের বিকাশ বন্ধ হইয়া যায়। অতএব যাঁহারা ভাবের চর্চা করিতে চান, তাঁহারা কাছাকাছি এমন বন্ধু রাখিবেন, যাঁহাদের সঙ্গে মতের মিল আছে। অনুরাগের আবহাওয়ার মধ্যে মনের গূঢ় ক্ষমতাগুলি যেমন সতেজে মাটি ফুটিয়া উঠে, এমন আর কোথাও নয়।' রবীন্দ্রনাথের মতে তার্কিক অনুরাগের আবহাওয়া সৃষ্টি করে না, বিরাগের আবহাওয়া সৃষ্টি করে। রসই মানুষকে মেলায়, তর্ক নয়। তর্কের ঝোঁক ব্যবধান সৃষ্টির দিকে। অন্তরের ভাবরস যদি সম্ভোগ করতে চান তো তার্কিক থেকে দুরে থাকাই ভালো। তাই ভাবের ভাবুক রসের রসিক হাফেজ বলেন:

'শত্রুদের সাথে মিত্রতা কর, বন্ধুদের নিয়ে উৎসব
ব্রাহ্মণের সাথে রাম, রাম' বল, মুসলমানের সাথে 'রব'।

একথা বলে জীবনবোধের চূড়ান্ত পরিচয় দিলেন হাফেজ। নমনীয়তাই

জীবন, অনমনীয়তা জীবন নয়, মৃত্যু—একথাই বলতে চেয়েছেন তিনি।

আরেকটা কথা বলেই এই অংশটুকু শেষ করছি। সাধারণ তার্কিকের চেয়ে মতবাদীর তর্ক আরো খারাপ। অনমনীয় বলে সেখানে গোঁড়ামির সম্ভাবনা বেশী। মতবাদী কে? যার কোন মত নেই সেই তো মতবাদী। নিজস্ব মতকে কেউ মতবাদ বলে না, মতই বলে। পরস্ব মতই মতবাদ। যা ভেতরে থেকে ফুলের মত ফুটে উঠে আবার পড়ে যায় তাই ত মত আর যা বাইরে থেকে এসে জুড়ে বসে আর যাওয়ার নামটি করেনা তাই মত-বাদ। তা ফুলের মত নমনীয় নয় কাঠামোর মত শক্ত। শক্ত কলার-পরা লোকের গলার দিকে তাকালেই মতবাদীর মনের ছবিটি পাবেন। মতওয়ালা মানুষটি বলে: আমি যা বুঝি তা বলুম, এখন গ্রহণ করা না করা আপনার অভিরুচি। ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ। মতবাদী বলে: আমি যেটা বলছি সেটা আমার বানান কথা নয়, কবিত্ব নয়, একেবারে খাঁটি বৈজ্ঞানিক সত্য; একে না মানা আর সত্যের বিরুদ্ধে যাওয়া এক কথা। মতয়ালা মানুষটি সহিষ্ণু, let us agree to differ এই নীতির ভক্ত, কিন্তু মতবাদী মানুষটি অসহিষ্ণু। সে সকলকেই তার মতের, মানে তার দলের মতের অধীনে দেখতে চায়। একটা নেশায় মেতে থাকে বলে তাদের জীবনও এক প্রকার সুখে কাটে, কিন্তু অপরের জন্য তারা নিয়ে আসে বিরসতা আর বিরক্তি। অপরের বাণীটি সে আওড়ে চলে কিন্তু নিজের বাণীটি খুঁজে পায় না। তাই মার্কস বা নীটশের বাণী পাওয়া গেলেও মার্কসিসট বা নীটশীয়-দের জীবন বাণীবিহীন। অপরের ক্ষেতে তারা ফসল কাটে, নিজের ক্ষেতে ফসল ফলায় না। তারা চাষী নয় দিনমজুর। জীবনসমৃদ্ধির ধারণা তাদের নয়। A truth-কে দি truth বলে ধরে নিলে জীবনে যে সাফল্য দেখা দেয় তা জীবন-সমৃদ্ধি হয় না, দান

হয়, একথা তারা জানে না। বহুর দিকে নজর রাখলেই নিজের বাণীটি খুঁজে পাওয়া যায়। তাদের দিকে নজর রাখলেই নিজের বাণীটি খুঁজে পাওয়া যায়। তাদের দিকে নজর রাখলেই নয়। এদের প্রভাবে জীবনের বহুভঙ্গিমতা নষ্ট হয়। আর বহুভঙ্গিমতাই জীবন।

কতগুলি ব্যাপারে আতিশয্যের পরিচয় দিলে বাহবা পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলিও মন্দ। তাই তাদের সম্বন্ধে সাবধানী হওয়া উচিত। পরিবারকে দরিদ্র রেখে যে ব্যক্তি দেশরক্ষার্থে প্রাণ দেয় তার তারিফে আমাদের মুখে খই ফোটে। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তন্ময় হয়ে যে ব্যক্তিটি সংসারে দারিদ্র্য নিয়ে আসে এবং হঠাৎ কিছু আবিষ্কার করে বসে তাকে আমরা বাহবা দেই, কিন্তু যে ব্যক্তিটির গবেষণা ব্যর্থ হয় তাকে ছায়া দিতে কসুর করিনি এবং সে ব্যাচারাকে পাগল অপদার্থ ইত্যাদি বলে একটা বিকৃত সুখ পেয়ে থাকি। কিন্তু এই মনোভংগীকে কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। গবেষণা সার্থক হবে কি হবে না আগে থাকতে যখন জানার উপায় নেই তখন উভয়কেই এক নজরে দেখা দরকার। একজনের প্রশংসা করে আরেকজনকে দুয়ো দেওয়া অন্যায়। প্রথম খ্রীস্টাব্দের স্বর্ণযুগে যে লোকটি পরিবার ত্যাগ করে সাধুর জীবন গ্রহণ করেছিলেন তাঁর তারিফে আমরা পঞ্চমুখ; কিন্তু হালে কেউ এমন কাজটি করতে চাইলে আমরা তাতে সায় না দিয়ে বলব সাধুর জীবন-যাপন করতে চান ভালো, কিন্তু তার আগে পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থাটি করে যান। নইলে সাধুর জীবনযাপনের বিলাস ত্যাগ করাই সংগত। মোদ্দা কথা, অন্যান্য আতিশয্যের মতো এসব আতিশয্যও মন্দ। উৎকেন্দ্রতা কখনো সমর্থনযোগ্য নয়। স্বাস্থ্য পারিবারিক দায়িত্ব সমাজ তথা বৃহত্তর পরিবারের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা এসবের প্রতি দৃষ্টি রেখে না চললে জীবন সুডৌল-সুঠাম হয় না।

স্বাভাবিক ক্ষুধা-সম্পন্ন মানুষ আর ঔদরিকের মধ্যে একটা গভীর মনস্তাত্ত্বিক প্রভেদ রয়েছে। আতিশয্যপ্রিয় লোকদের মনোবিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সেখানে একটা গভীর বেদনা লুকিয়ে আছে। সেই বেদনা ভুলবার জন্যই তারা নিজেকে আতিশয্যের হাতে সঁপে দেয়। পানাসক্তদের বেলা তো এটা একেবারে খাঁটি সত্য। তারা পান করে নিজেকে ভুলে থাকবার জন্য। একটা স্মৃতির ভূত তাদের তাড়া না করলে তারা পানোন্মত্ততার চেয়ে মিতাচার আর প্রশান্তিই কল্পনা করত। সেই যে গল্পের চীনা লোকটি বলেছিলেন: আমি মদ খাওয়ার জন্য মদ খাইনে মাতাল হওয়ার জন্য, তথা আত্মবিস্মৃতির জন্য মদ খাই, তাতে যথেষ্ট সত্য রয়েছে। সুরাসক্ত হয়ে বিস্মৃত কামনা, আর কোন ভালো কাজের নেশায় মেতে বিস্মৃতিকামনা উভয়ের অনেক প্রভেদ। Borrow-র চরিত্রটি যিনি পত্নীবিয়োগের দুঃখ ভোলার জন্য চীনা ভাষা শিখেছিলেন, তাঁরও উদ্দেশ্য বিস্মৃতি। কিন্তু তাঁর উপায়টি ক্ষতিকর নয়, বরং তাতে তাঁর বুদ্ধি ও জ্ঞান উভয়েরই প্রচুর উন্নতি হয়েছিল। পানাসক্তি, কামুকতা প্রভৃতি নেশা কিন্তু সত্যই অনিষ্টকর।

ঈষৎ আমোদ বা মজা উপভোগ করার নেশা প্রত্যেক সুস্থ মানুষের মধ্যেই আছে। দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার ফলে কেউ কেউ তা হারিয়ে বসে বটে কিন্তু বাঁচার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকলে পুনরায় তা ফিরে পায়! বাঁচার শর্তই হচ্ছে এই মজা উপভোগ। জগতে থাকবো. কিন্তু জগতের মজা উপভোগ করবো না এ কখনো হতে পারে না। শিশুর দিকে একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখুন। নতুন চোখ নিয়ে সে প্রত্যেক জিনিসের দিকে তাকাচ্ছে, প্রত্যেক জিনিসকেই জানতে চাচ্ছে, বুঝতে চাচ্ছে, উপলব্ধি করতে চাচ্ছে; এক কথায় উপভোগ করতে চাচ্ছে। যে পরিবেশে সে বাস করছে, সে পরিবেশ তাকে হাজার বাঁধনে বাঁধছে, হাজার

টানে টানছে। বিশেষের প্রতি তার টান নেই, সকলের প্রতি সমান আকর্ষণ। সে যা কিছু দেখছে তা-ই হতে চাচ্ছে। পরিণত বয়সে-ও এই হাজার বাঁধন, হাজার টান অনুভব করে সে-ইতো তাজা মানুষ। আর এই তাজা মানুষের যে তাজা ভাবটি তারই নাম জেস্ট। এই লোকটির কাছে শুদ্ধ বেঁচে থাকাটাই একটা আনন্দের ব্যাপার। কেন বাঁচবো, কি নিয়ে বাঁচবো, এই চিন্তায় সে নিজেকে আকুল করে তোলে না। পশুরা বেশী বয়সেও জেস্ট বা প্রাণময়তার পরিচয় দিয়ে থাকে। জীবনের কোন মূল ব্যাপারে বাধাপ্রাপ্ত না হলে মানুষের পক্ষেও আমরণ প্রাণময়তার পরিচয় দেওয়া সম্ভব। এদিকে অন্তরায় হচ্ছে স্বাধীনতার সঙ্কোচন। মানুষের স্বাধীনতাকে যতই সীমাবদ্ধ করা যায় ততই তার প্রাণ কুঁকড়ে থাকে—ততই সে জীবনের (স্বাদ) গ্রহণের ক্ষমতা হারিয়ে বসে। সভ্যতায় স্বাধীনতার সংকোচনের দরকার হয়ে পড়ে। তাই সভ্য মানুষের জীবনে জেস্টের অভাব। তার চেহারায় একটা অবদমনজাত দুঃখের ছাপ সুস্পষ্ট। আদিম মানুষটি ক্ষুধার উত্তেজনায় শিকার করতে যায় বলে সে একটা আবেগ প্রকাশের আনন্দও পায়। তার আবেগ আর কাজে কোন বিরোধ থাকে না। সভ্য মানুষটিও আপিসে যায় ক্ষুন্নি-বৃত্তির তাগিদে। কিন্তু তার সে তাগিদটুকু প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ। তাই তার কাজে আবেগের সে আনন্দটুকু ফুটে ওঠে না। আবেগ জিনিসটা অনিয়ন্ত্রিত আকস্মিক, আর অভ্যাস জিনিসটা নিয়মিত সুনির্ধারিত। সভ্যতার অভ্যাস প্রাধান্য লাভ করেছে বলে তাতে আবেগের প্রাণময়তা অনুপস্থিত। সভ্য মানুষ সব কাজ করে ভেবে-চিন্তে—রুটিন মাফিক। কিন্তু অসভ্যদের জীবনে রুটিনের বালাই নেই। রুটিনপীড়িত সভ্য মানুষের কবিকে তাই অনেক সময় আবেগময় আদিম জীবনের গুণকীর্তন করতে দেখা যায়। 'বিস্ময়ঘাতক' সভ্যতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথকে বলতে শুনি :

'আমি ছেড়েই দিতে রাজি আছি
সুসভ্যতার আলোক,
আমি চাই না হতে নব বঙ্গে
নবযুগের চালক।
আমি নাইবা গেলাম বিলাত,
নাইবা পেলাম রাজার খিলাৎ,
যদি পরজন্মে পাইরে হতে
ব্রজের রাখার বালক।
তবে নিবিয়ে দেব নিজের ঘরে
সুসভ্যতার আলোক।'

যৌথ কাজের বেলায়-ও অসভ্যরা আবেগ ও স্বতঃস্ফূর্ততার পরিচয় দিয়ে থাকে। কিন্তু আধুনিক সভ্যতায় তা সম্ভব নয়। স্টেশন থেকে যখন গাড়ী ছাড়ে তখন ড্রাইভার গার্ড ও কুলিকে বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণ মেনে চলতেই দেখা যায়, আবেগ উচ্ছ্বসিত হতে নয়। কারণ, তাদের কাজের তাগিদটা প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ। অন্যকথায় তারা কাজে আনন্দ পাচ্ছে বলে যে কাজ করছে. তা নয়—মাসের শেষে তন্‌খাটা গুণে নেবে বলেই কাজ করছে। তাই তা আবেগের উৎস হতে পারে না। আবেগ আর বিবেচনায় আদা-কাঁচকলা সম্বন্ধ। স্রেফ কর্তব্য বোধ থেকে যে কাজ করা হয় তাতে তেমন আনন্দ পাওয়া যায় না। সামাজিক জীবনের প্রায় প্রত্যেক ব্যাপারই এই ক্রটিযুক্ত। আবেগ সেখানে গৌণস্থান লাভ করে। পারস্পরিক কথাবার্তায় ফলে একটা লাভ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বলেই লোকেরা আলাপ করে, কথা বলার মধ্যেই যে একটা রস আছে তার তাগিদে নয়। রসকে তাড়িয়ে দিয়ে উদ্দেশ্যই সভ্য মানুষের জীবনে বড় হয়ে উঠেছে। বিনা উদ্দেশ্যে স্নেহ-রসের তাগিদে কথা বললে লোকেরা আপনার পানে তাকিয়ে হাসবে। জীবনের প্রতি মুহূর্তেই সভ্য মানুষটি নিষেধের বেড়ায়

সংকুচিত, আবেগ প্রকাশের স্বাধীনতা তার নেই। আনন্দ বোধ করলেই যে আপনি সদর রাস্তার উপর নাচতে আর গান গাইতে সুরু করে দেবেন, অথবা দুঃখ পেলেই ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে কান্না জুড়ে দেবেন, তা হতে পারে না। না, আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ সভ্য সমাজ সমর্থন করে না, সভ্য মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত জীবন। তরুণ বয়সে বিদ্যালয়ের আইনের দ্বারা, আর পরিণত বয়সে কর্মক্ষেত্রের বিধির দ্বারা সংকুচিত হতে হতে মানুষ শেষে এমন এক অবস্থায় এসে দাঁড়ায় যে, উপভোগ ক্ষমতা তার আর থাকে না, ক্লান্তি আর বিরক্তিবোধে সে মুষড়ে পড়ে। জীবনেরর কোন মানে নেই, জগতটা একটা পাগলা গারদ, এমনি নৈরশ্যব্যঞ্জক উক্তি তখন তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে।

কিন্তু কী করা যায়? সভ্য জীবন জটিল জীবন, আর জটিল জীবন আবেগচালিত নয়, বুদ্ধিচালিত। তাই সভ্যতাকে রক্ষা করে—তথা নিয়ন্ত্রণকে মেনে নিয়ে—কী করে জীবন উপভোগের ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখা যায়, সে প্রশ্ন বড় হয়ে ওঠে। বড় কঠিন প্রশ্ন। তবুও উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি। স্বাস্থ্য ও শক্তি প্রাচুর্যই সমস্ত বাধাকে হটিয়ে দিয়ে উপভোগ-ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখতে পারে। মানুষটি সুস্থ ও শক্তিসম্পন্ন হলে কোন বাধাই তাকে বিমর্ষ করতে পারে না, সমস্ত বাধার চক্রান্তকে ডিঙ্গিয়ে সে জীবনকে ভালোবাসে। [জিষ্ণু সে, দুঃখের কাছে, বাধার কাছে পরাজয় স্বীকার করতে অপ্রস্তুত। জীবন কৃষ্ণ বাঁশী বাজাচ্ছেন আত্ম রাধা তাঁর কাছে যাবেনই—কোন জটিলা-কুটিলার বাধা শুনবেন না বরং যতই বাধা আসবে ততই তার আগ্রহ বাড়বে। বাধা আসেই তো আগ্রহ বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য—নিস্তরঙ্গ বুকে তরঙ্গ সৃষ্টি করবার জন্য। এই তরংগের স্বাদ নিতে যে ভয় করে সে তো জীবনমৃত—জীবনকে পেয়েও সে পায়নি। জটিলা-কুটিলা থাকাতেই তো রাধার প্রেমের প্রকাশ এতো সুন্দর, এতো মধুর

এতো ছন্দোময়। এদের অভাবে তাঁর প্রেম হয়ে পড়তো জলো, বৈচিত্রহীন। রাধার হৃদয়যমুনায় ঢেউ তুলেছিল তারা।]

বিভিন্ন দেশের বিবরণ থেকে জানতে পারা যায় সভ্য দেশ মাত্রই স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে। কিন্তু এনার্জি বা শক্তি সম্বন্ধে তা জোর গলায় বলা যায় না। এনার্জি পরিমাপ স্বাস্থ্যের পরিমাপের মতো সহজ নয়। পূর্বে স্বাস্থ্য বৃদ্ধি আর এনার্জি বৃদ্ধি একসঙ্গে যেতো এখন আর তেমনটি হচ্ছে বলে মনে হয় না। তাই বর্তমানে স্বাস্থ্যদৈন্যের চেয়ে এনার্জিদৈন্য অধিক। সভ্য জীবনে নানা দ্বন্দ্বে এনার্জি ক্ষয়ে যায়। অতীতের স্বর্ণাভ দিনে কিন্তু সেটি হতো না। সেকালে দুঃখ ছিল ভাত-কাপড়ের, আত্মপ্রকাশের নয়। একালে ভাত-কাপড়ের দুঃখ যতই কমছে আত্মপ্রকাশের দুঃখ ততই বাড়ছে। সভ্য জীবনের বাধা সত্ত্বেও যাঁরা তাঁদের উপভোগ-ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখতে পারছেন—তাঁদের দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। তারাই জগতের প্রাণ। জনতাকে তাঁরা পরিবহন করেন না, আনন্দিত করেন—হাস্যে গানে আনন্দ উচ্ছ্বাসে নবীন করে তোলেন. শক্তি ক্ষয়কর অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি না পেলে এই প্রাণময়তা তো বজায় থাকে না। প্রয়োজনীয় কাজের জন্য যে এনার্জিটুকু দরকার, জেস্টের জন্য তার চেয়ে অধিক এনার্জির প্রয়োজন। জেস্ট সারপ্লাস এনার্জির ফল। আর নির্ভর করে মানস-যন্ত্রের মসৃণতা বা স্বচ্ছন্দতার উপর। যে-মন দ্বন্দ্বময় সেখানে সারপ্লাস-এনার্জি থাকতে পারে না, দ্বন্দ্বের দরুন অনেক এনার্জি ক্ষয়ে যায়।

পূর্বের তুলনায় বেশী হলেও, জেস্টের মাত্রা মেয়েদের মধ্যে এখনো অনেক কম। মেয়েদের জগৎ বড় সংকীর্ণ, বড় রুদ্ধ। বিপুল বিশ্ব-ব্যাপারে তাদের কোন রুচি নেই। বেশী সজীবতা বা প্রাণবন্ততার পরিচয় দেওয়া যেন তাদের মানায় না, এমনি একটা ভাব নারী-পুরুষ উভয়কেই পেয়ে বসেছে। তাই সংকুচিত ও আড়ষ্ট জীবন তাদের ভাগ্য হয়ে দাঁড়ায়। রাজনীতি, খেলা

বা জীবনের চলমান ঘটনায় তাদের কোন অনুরাগ নেই। আত্যন্তিক আত্মচিন্তার ফলে তাদের মনের অন্ধকার গুহায় বিদ্বেষের বিষ জমতে থাকে। স্বজাতীয়ার ছিদ্রান্বেষণই তাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে। নিষেধের দ্বারা অবদমিত হতে হতে তাদের আত্মা এমন বিগড়ে যায় যে, যা কিছু উদার ও সুন্দর তারা তারই বৈরী হয়ে ওঠে। সামাজিক জীবনে তারা আনন্দঘাতিনী, রাজনীতিতে দমননীতির সমর্থক। নিজেরা সুখ পাচ্ছে না বলে অপরের জীবনও দুঃখপূর্ণ করার একটা বিষাক্ত প্রবৃত্তি তাদেরকে সাপের মতো ছোবল মারতে থাকে। সৌভাগ্যবশতঃ এ ধরনের মেয়েদের সংখ্যা দিন দিন কমছে। শিক্ষা স্বাধীনতা আর আত্ম-প্রকাশের অধিকার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপভোগ-ক্ষমতা বাড়ছে, আর উপভোগ-ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্বেষও কমছে। এখনি যে অন্ধকার টুটে আলোয় আলোময় হয়ে গেছে, তা নয়। দমননীতি পুরাপুরি অপসৃত হলেই মেয়েদের জীবনে আর বিদ্বেষের নিদর্শন মিলবে না। মেয়ে-পুরুষ উভয়ের সুখের জন্য জেস্ট দরকার। আর জেস্ট স্বাধীন ও মুক্ত জীবনের দান। আত্মপ্রকাশে যত কম বাধা থাকবে ততই মানুষের অকারণ খুশী হওয়ার ক্ষমতাটি বজায় থাকবে। অকারণ খুশী হওয়ার এই যে ক্ষমতা, এরই নাম জেস্ট।

জেস্টের শত্রু ব্যাধি, অতিরিক্ত আদর্শবাদ, উচ্চাকাঙক্ষা, মতবাদ-প্রীতি, আর বিজ্ঞতা। মতবাদপ্রীতি সম্বন্ধে যা বলবার তা পূর্বেই বলা হয়েছে। এখন বাকি চারিটি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পেশ করছি। কোন কোন ব্যাধি স্বাদ-গ্রহণের ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়, কোন কোনটা আবার করে না। বিজ্ঞান বিশেষ করে ভেষজ বিদ্যা যখন আরো অনেকদূর এগিয়ে যাবে তখন একটা-দুটো পিল খেয়ে ফেললেই হয়তো আবার হারানো ভালোলাগা ফিরে পাওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু সে যুগ এখনো দূরে। যতদিন সে যুগ না আসে ততদিন কাণ্ডজ্ঞানের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই।

অতিরিক্ত আদর্শবাদ আর উচ্চাকাঙক্ষার আবির্ভাব হয় যৌবনে। তাই দেখতে পাওয়া যায় যৌবনটা প্রায় মানুষের দুঃখময় হয়ে থাকে। যৌবনে মানুষ একটা অসম্ভব আদর্শ আর উচ্চাকাঙক্ষার তাগিদ অনুভব করে বলে তাকে অনবরত অপ্রাপ্তির বেদনায় ছটফট করতে হয়। না, না, আদর্শের কাছে পৌঁছা হলো না, যা হতে চেয়েছিলাম তা আর হতে পারলাম কৈ, জীবনটা একেবারে বরবাদ গেলো, এমনি ব্যর্থতাবোধ তাকে পেয়ে বসে। তাই সে আর সহজতার আনন্দ পায় না। উদ্বেগ সহজতার আনন্দ কেড়ে নেয়। মধ্যবয়সী লোকদের জীবনে প্রাপ্তির আশা কম থাকার দরুন তারা অনেকটা উদ্বেগমুক্ত। তীব্র ব্যর্থতাবোধের হাত থেকে রেহাই পেয়ে তারা সহজে পৃথিবীকে ভালোবাসতে শেখে। বাসনা-মুক্ত হয়ে তারা চারদিকে তাকায় আর চারদিক সৌন্দর্যের ডালি হাতে করে তাদের সামনে এসে দাঁড়ায়—

কত ফুল নিয়ে আসে বসন্ত
আগে পড়িত না নয়নে—
তখন কেবল ব্যস্ত ছিলাম
চয়নে।
মধুকর সম ছিনু সঞ্চয় প্রয়াসী ;
কুসুমকান্তি দেখি নাই, মধুপিয়াসী—
বকুল কেবল দলিত করেছি আলসে
ছিলাম যখন নিলীন বকুল
শয়নে।

সত্যি চয়নের কাজে ব্যস্ত থাকলে নয়নের কাজটি আর তেমন হয় না। নয়ন শুধু চয়ন নিয়েই ব্যাপৃত থাকে, সৌন্দর্য দেখতে পায় না। প্রাপ্তির দিকে, ভোগের দিকে ঝোঁক থাকলে সৌন্দর্য আর চোখে ধরা পড়ে না। হাল ছেড়ে দিলেই জগতের সৌন্দর্যের হাতছানি পাওয়া যায়। ক্ষণিকা কাব্যে যে সহজ আনন্দের ভাব

বড় হয়ে উঠেছে তার হেতুও এখানে ; ক্ষণিকা কাব্যে কবি হাল ছেড়ে দিয়ে বসেছেন। এ-কাব্য জেস্টের কাব্য, আর তার রচনাকাল কবির মধ্যবয়স। এখন কবির ঠোঁটে যেন একখানি স্মিতহাসি লেগে রয়েছে। 'ভোগবতী পেরিয়ে তিনি আনন্দলোকের ডাঙ্গা দেখতে পেয়েছেন।' ধম্যবয়সে রচিত না হলে এ-কাব্য থেকে এমন সহজ আনন্দের সুর বেরিয়ে আসতো কিনা সন্দেহ। এখন তিনি নিজের কানে কানে বলেন:

মনেরে আজ কহ যে
ভালো মন্দ যাহা আসে
সত্যেরে লও সহজে।

ভালো-মন্দের বিবেচনাকে অগ্রাহ্য করে সত্যকে অর্থাৎ যা ঘটছে তাকে সহজে স্বীকার করে নেওয়ার এই প্রবৃত্তি, এ-যৌবনের ধর্ম নয়, মধ্যবয়সের প্রকৃতি। যৌবন মানুষকে নিয়ে বড় বেশী টানা-হেঁচড়া করে।

এখানে প্রশ্ন হবে, তাহলে কি জেস্টের জন্য মধ্যবয়সের দিকে তাকিয়ে থাক্‌তে হবে, যৌবনে তা পাওয়ার কোন উপায় নেই ? না, এমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি বলতে চাচ্ছি, মধ্যবয়সে যে-গুণের দরুন মানুষ জেস্টের অধিকারী হয়, তার দিকে লক্ষ্য রাখলে যৌবনেও জেস্ট লাভ করা সম্ভব। সেটা কী ? না, একটা অসম্ভব আদর্শের পিছু না ছোটা, আর উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে জীবনে বড় স্থান না দেওয়া। কিন্তু না-মূলক কথা বলে কী লাভ ? তার চেয়ে আদর্শের স্থানে কী আসবে আর উচ্চাকাঙ্ক্ষার স্থান-টুকুই বা কে দখল করবে তা ভেবে দেখাই ভালো। আদর্শের স্থানে আসবে সহজ জীবনপ্রীতি, আর উচ্চাকাঙ্ক্ষার স্থানে সুন্দর-আকাঙ্ক্ষা। এবার দু'টি জিনিসকে একসঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যায়। বাঁচব, খুশী হব, খুশী করব, বন্ধুতায় ভালোবাসায় জীবনের পাত্র ভরে নেব—এই বোধটুকু অন্তরে ধারণ করতে পারলেই জেস্ট

আর পর হয়ে যাবে না—আমরণ জীবনের সঙ্গী হয়ে থাকবে। মানুষ বাঁচে বড় হতে নয়, খুশী হতে—এ-ক্ষেত্রে এ-কথাটাও মনে রাখা দরকার। বড় হওয়ার আত্যন্তিক প্রয়াস জীবনের স্বাদগ্রহণের ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়।

বিজ্ঞতা মানে, আমি সব জানি, সব বুঝি, আমার কাছে নতুন কিছুই নয়, এই মনোভাব। বলা বাহুল্য, এ-ধরনের মানুষের সুখের উৎস ফুরিয়ে গেছে। যার জানবার নেই, বোঝবার নেই, খোঁজবার নেই, তার মতো অসুখী আর কে? বিজ্ঞতার চেয়ে আদেখলামি অনেক ভালো। তা জীবনপ্রসারী, ঐশ্বর্যসঞ্চারী। অথচ বিজ্ঞতাকে আমরা পছন্দ করি, আদেখলামিকে ছায়া দেই। বিজ্ঞলোকেরা যে ঠকে সে-সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসু একটা গল্প বলেছেন তাঁর 'আমি চঞ্চল হে' বইতে। এক ছেলে এলো কলকাতা গাঁ থেকে। কলকাতার ছেলেদের কাছে সে হটবার পাত্র নয়। যা কিছু সে দেখে সে বলে: দেখেছি, এমন আর নতুন কি? এতো আমাদের গঞ্জেও আছে। তাই কলকাতা এসেও তার কলকাতা দেখা হল না। বিজ্ঞতা নিয়েই সে বাড়ী ফিরল, অভিজ্ঞতা নিয়ে নয়। গল্পটা বলার পরে বুদ্ধদেব বাবু যা বলেছেন তা আমার খুব ভালো লেগেছে। তাই কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করছি। হয়ত কারো কাজে লাগবে।

বিস্ময় সংহারক জ্ঞান নয়, জ্ঞানের দম্ভ। আর জ্ঞানের দম্ভেরই অপর নাম রিক্ততা। রিক্ততা দেখবার ক্ষুধা, বুঝবার ক্ষুধাকে নষ্ট করে দেয়। তাই তা বর্জনীয়। বিজ্ঞ লোক একটা বড় সুখ থেকে বঞ্চিত থাকে, সেটা হচ্ছে প্রশংসা করার সুখ। আর ও-সুখ থেকে যে বঞ্চিত তার জীবনই ব্যর্থ। নিন্দুকের জীবনে প্রশান্তি নেই, তাই আনন্দও নেই।

১। কবিগুরু গ্যেটে—২য় খণ্ড—কাজী আবদুল ওদুদ।

স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসা

সুখের গোড়ায় ভালোবাসা। ভালোবাসার স্পর্শ ব্যতীত সুখের স্বাদ পাওয়া কঠিন। আপনি যদি মনে করেন আপনাকে কেউ ভালোবাসে না, তো আপনি চোখে অন্ধকার দেখবেন, নিজেকে নিতান্ত অসহায় মনে করবেন এবং কিছুই আপনার ভালো লাগবে না। আর যদি মনে করেন আপনার প্রিয়জনের ভালো-বাসা আপনি পাচ্ছেন তো আপনার মনে খুশীর ঢেউ খেলে যাবে এবং একা থাকলেও মনে হবে প্রিয়জনের অনুরাগ আপনাকে ঘিরে আছে, আপনার ভয়ের কারণ নেই। ভালোবাসা আপনাকে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত করবে, আপনার আত্মবিশ্বাসকে অটুট রাখবে, আর সব রকমের বাধার সঙ্গে লড়াই করে জয়যুক্ত হওয়ার প্রেরণা যোগাবে। আপনি তখন আর ভেতরমুখো হয়ে বসে থাকতে পারবেন না, বাইরের আহ্বানে সাড়া দেবেন। ভালোবাসা আপনার ভেতরের শক্তিকে খেলিয়ে তুলবে।

নানা কারণে মানুষ ভালোবাসার অভাব বোধ করে থাকে। শৈশবের স্নেহমমতার অভাব তন্মধ্যে প্রধান। দুর্ভাগ্যের দরুন যে-আত্ম-অবিশ্বাসের জন্ম হয়ে থাকে, নিজেকে ভালোবাসাবঞ্চিত ভাবার মূলে সেই আত্ম-অবিশ্বাস। ছেলে বয়সে যারা অপর ছেলে-মেয়েদের তুলনায় কম স্নেহমমতা পায়, নিজেদের ভালোবাসার অনুপযুক্ত ভাবা তাদের স্বভাব হয়ে দাঁড়ায়। তারা নিজেদের ভয় করে, ভাবে: না, অপরের ভালোবাসা পাওয়ার উপযুক্ততা আমাদের নেই, আমরা হতভাগ্য। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্যি

ভালোবাসার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে, অনেকে অজস্র অর্থ ব্যয় করতেও দ্বিধাবোধ করে না। কিন্তু তাতেও বিশেষ লাভ হয় না, ভালোবাসা তাদের আয়ত্তের বাইরেই থেকে যায়। কেননা, অর্থের দ্বারা আর যা-ই কেনা যাক, ভালোবাসা কেনা যায় না। ভালোবাসা স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার, আর মানব-স্বভাব এমনি রহস্যময় যে, যে চেষ্টা করে সে ভালোবাসা পায় না, যে চেষ্টা করে না তার দিকেই তার ঝোঁক। টাকার বিনিময়ে যারা ভালোবাসা পেতে চায়, শেষ পর্যন্ত প্রতারিত হয়ে তারা সমস্ত মানবগোষ্ঠীকেই বেঈমান ভাবতে শুরু করে। তারা উপলব্ধি করতে পারে না যে, ভালোবাসা অমূল্য ধন, যে জিনিসের বিনিময়ে তা চাওয়া হয় তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। এদের অনেকেই জগতের উপর প্রতিশোধ নিতে চায় সুইফ্‌টের মতো তিক্ততায় কলম ডুবিয়ে, অথবা প্রলয়ংকর যুদ্ধবিপ্লব বাধিয়ে। এ হচ্ছে দুর্ভাগ্যের বীরত্ব-ব্যঞ্জক প্রতিক্রিয়া এবং এর জন্য এমন চারিত্রিক শক্তি দরকার যা না হলে একজনের পক্ষে দশজনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো সম্ভব হয় না। খুব কম লোকই এমন শক্তির পরিচয় দিতে পারে। ভালোবাসা-বঞ্চিত বেশীর ভাগ মানুষই নৈরাশ্যের অন্ধকারে বাস করে; বিদ্বেষের বিদ্যুৎ চমকালেই যেন সেখানে কিছুটা প্রাণের আলো তারা দেখতে পায়। নইলে অন্ধকার, শুধুই অন্ধকার। এ ধরনের লোকেরা সাধারণতঃ আত্মকেন্দ্রিক। অনুরাগের অভাবের দরুন বাইরে নিরাপদ বোধ করে না বলে ভেতরমুখো হয়ে পড়া তাদের স্বভাব হয়ে দাঁড়ায়। নিজের চারদিকে তারা কেবলই শত্রু দেখতে পায় এবং অভ্যাসের ধরাবাঁধা পথে চলে কল্পিত বিপদের হাত থেকে মুক্তি কামনা করে। ভালোবাসাসঞ্জীবিত লোকদের কিন্তু ভিন্ন ধারা। ভয়ের বিকার থাকে না বলে ধরাবাঁধা পথে তাদের আনন্দ নেই। নিত্য-নূতন অভিজ্ঞতার অভিসারে তাদের যাত্রা। 'নবরে নব, নিতুই নব' তাদের মর্মবাণী।

নিরাপত্তার উপলব্ধিবর্জিত জীবনের চেয়ে নিরাপত্তার উপলব্ধি-সমন্বিত জীবনই সুখের। সর্বত্র না হলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তারা নির্ভয় ও নিশ্চিত থাকতে পারে। নিরাপত্তাবোধের অভাব ঘটলে মানুষ বিপদের মুখে সাহসহারা হয়ে পড়ে; তখন তার আর বাঁচোয়া থাকে না। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে মনের জোর। মনের জার থাকে না বলেই নিরাপত্তাবোধহীন মানুষ বিপদের সময় আর নিজেকে সামলাতে পারে না—একেবারে বিপদের গহ্বরে গিয়ে পড়ে। কথায় যে বলে 'বনের বাঘে খায় না, মনের বাঘে খায়' তা সত্য। সরু তক্তার উপর দিয়ে একটা গর্ত পেরুতে গিয়ে যদি আপনি ভয়ে ঠক্ ঠক্ করেন তো আপনার পতন অনিবার্য। নির্ভয় হলে পতনের তেমন ভয় থাকে না। তাই বলে নির্ভীক লোকটি যে কখনও বিপদে পড়ে না তা নয়। কিন্তু বিপদ তার মনের উদ্যমকে কাবু করতে পারে না। মনের জোর থাকার দরুন সে সহজেই বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারে এবং মেঘমুক্ত রবির মতো আরো উজ্জ্বল, আরো শক্তিমান হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু ভীতিবিহ্বল লোকটির পক্ষে তা সম্ভব হয় না। এই যে আত্মপ্রত্যয়, এর গোড়ায় রস যোগায় ভালোবাসা। তাই তার এত মূল্য। আছে, আছে, আমাকে ভালোবাসার লোক আছে, এই বোধটা সঞ্জীবনীর মতো কাজ করে। এমন প্রাণদায়িনী শক্তি আর দ্বিতীয়টি নেই। যার কপালে ভালোবাসা জুটলো না তার মতো হতভাগ্য আর কে। সে বেঁচেও মরার মতো—প্রাণের স্পন্দন থেকে বঞ্চিত। আকাশ-আলো তাকে অভিনন্দন জানায় না। ফুলের হাসি চাঁদের মায়া তার কাছে অর্থহীন।

নিরাপত্তাবোধ ভালোবাসা পাওয়ার উপরে যতটা নির্ভরশীল, দেওয়ার উপরে ততটা নয়। অবশ্য দেওয়া-নেওয়া দুটো হলেই সোনায় সোহাগা। শুধু ভালোবাসার নয়, প্রশংসারও এ-গুণ রয়েছে। অভিনেতা প্রচারক, বক্তা, এদের জীবনে প্রশংসার প্রয়োজন

অত্যন্ত বেশী। হাততালি এদের জীবনের টনিক। যখন পায় তখন স্ফূর্তির অন্ত থাকে না, না পেলে জীবন মুষড়ে পড়ে। কতিপয়ের ঘনীভূত ভালোবাসা থেকে অপরেরা যে সাহস ও বল পায়, হাজার-হাজার লোকের বিক্ষিপ্ত প্রশংসা থেকে তারাও সে শক্তি-সাহস পেয়ে থাকে। গভীরতার অভাব ঘোচায় ব্যাপ্তির প্রাচুর্য। পিতা-মাতার স্নেহমমতাকে আলোহাওয়ার মতো সহজে পায় বলে শিশুরা তার দাম দিতে চায় না, তাদের মন পড়ে থাকে বাইরের আশ্চর্য ঘটনাসমূহে। কিন্তু বাইরের দিকে গতি হলেও তাদের নিরাপত্তাবোধের গোড়ায় রয়েছে মা-বাবার যত্নের উপর অচেতন বিশ্বাস। যে-বালকটি মা-বাবার যত্ন থেকে বঞ্চিত সে সাধারণতঃ ভীরু। ভয়ে তার বুক কাঁপে, কোনো সাহসের কাজেই তার মন সাড়া দেয় না সানন্দচিত্তে অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় না। সে বিষন্ন ও ভেতরমুখো হয়ে পড়ে এবং অতি অল্প বয়সেই জীবনমৃত্যু আর মানবভাগ্য সম্বন্ধে ভাবতে শুরু করে। একটা অবাস্তব দার্শনিক চিন্তাধারার কাছে আত্মসমর্পণ করে সে নিশ্চিন্ত হতে চায়। জগৎ তার কাছে একটা বিশৃঙ্খল স্থান। তাই পৃথিবীকে পর করে সে ঘরের কোণে একটা আইডিয়ার জগৎ রচনা করে সেখানে বাস করতে চায়। সেই আইডিয়ার ছাঁচের বাইরে এলে সে আর শান্তি পায় না। জলের বাইরে মাছের যে অবস্থা হয়, আইডিয়ার ছাঁচের বাইরে সেও সে অবস্থা বোধ করে। পাঠাগারের চার দেয়ালের ভেতরেই তার নিরাপত্তা, বাইরে নয়। স্নেহমমতার রসে সঞ্জীবিত হলে এই লোকটিও বাইরের জগতকে ভালোবাসতে পারতো এবং একটি আদর্শ জগৎ সৃষ্টি করে সেখানে বাস করতে চাইতো না, বাইরের নিমন্ত্রণে সহজেই সাড়া দিতো।

সকল স্নেহমমতাই যে মানুষকে সাহসিক কাজে অনুপ্রাণিত করে তা নয়। স্নেহমমতা দিয়ে ভীরুতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে

এমন দৃষ্টান্তও চোখে পড়ে। স্নেহমমতা যখন নিরাপত্তার দিকে তাকিয়ে শিশুদের জুজুবুড়ি দেখায় তখন তাদের ভীরুতাই বাড়ে, সাহস নয়। যে স্নেহমমতার উদ্দেশ্য মানুষের ভেতরের সদ্গুণগুলির বিকাশ, তা দিয়েই মানুষকে সাহসী করে তোলা যায়। বলা বাহুল্য, স্নেহমমতা তখন আর স্নেহমমতা থাকে না, শ্রদ্ধা হয়ে দাঁড়ায়। যে-জননী বা ধাত্রীটি সর্বদা শিশুটিকে সাবধান করে দেয় বিপদ এড়িয়ে চলতে, তার দ্বারা শিশুটির কল্যাণ হয় না, ক্ষতিই হয়। বড় হয়ে সে কেবল বিপদের হাতছানি পায় বলে ভয়ে তার বুক কাঁপে। 'নৌকা ফি-সন ডুবিছে ভীষণ, রেলে কলিশন হয়'—এ ছেলেবেলায় জুজুবুড়ির ভয়ে আড়ষ্ট মানুষেরই মনের কথা। বাছারে ওখানে যাসনে, ওখানে গেলে কুকুরে কামড়াবে, গরুতে ঢুঁ মারবে—ইত্যাদি বলে যে-মা শিশুটিকে আঁচল-ধরা করে রাখতে চায়, তার মতো শিশুর শত্রু আর কে? সত্যকার কল্যাণকামী মা'রা কখনো শিশুদের আঁচল-ধরে রাখতে চায় না। তারা ছেলেদের বিশ্বের করে তুলতে চায়। স্নেহের কারাগারে বন্দী হয়ে থাকলে যে ছেলেমেয়েরা শক্তিহীন ও অপদার্থ হয়ে পড়ে সে সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ সচেতন। তারা জানে:

নিজের সে, বিশ্বের সে, বিশ্বদেবতার,
সন্তান নহে গো কভু সম্পত্তি তাহার।

[এই যে নিঃস্বার্থ প্রেম, এর চমৎকার অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায় ব্রাউনিংয়ের একটি কবিতায়। কবিতার কাহিনীটা এইরূপ:—এক আরব বণিকের ছিল একটি ঘোড়া। তাকে সে সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালোবাসতো। সেই ঘোড়াটির উপর লোভ পড়লো তার এক প্রতিবেশীর পুত্রের। সে তার বাবার কাছে আব্দার করে বসলো: বাবা ও-ঘোড়াটি এনে না দিলে আমি আর অন্তরে সুখ পাচ্ছিনে। তুমি আমাকে ওটি এনে দাও।

—পুত্রের আব্দারে পিতা ঘোড়ার মালিকের কাছে গিয়ে ঘোড়াটি চেয়ে বসলো। বললে: আপনার দানখয়রাতের অন্ত নেই, দাতা বলে আপনার প্রসিদ্ধি রয়েছে। দয়া করে যদি আপনি আপনার ঘোড়াটি দেন তো আমার পুত্র মনখারাপি থেকে মুক্তি পেতে পারে। আপনার দয়ার শরীর, আশা করি দেবেন—উত্তরে ঘোড়ার মালিক বললেন: আমি টাকা দিতে পারি, ঘোড়া নয়। ঘোড়া আমার প্রিয় বস্তু, সেটা হাতছাড়া করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মাপ করবেন।

ছেলের পিতা তাই ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে এসে বললেন: না, ঘোড়া পাওয়া গেলো না, ওসব আশা ছেড়ে দাও। দরকার হয় তো একটা ভাল দেখে কিনে নাও। পরের জিনিসের উপর চোখ রাখতে নেই। তাতে শুধু দুঃখই বাড়ে, সুখ নয়। সুখের পথ ভিন্ন। কিন্তু ছেলেটির অবুঝ মন বুঝ মানে না। ঘোড়াটির জন্য সে কাঁদতে শুরু করে। পিতা পুত্রের কাহিল অবস্থা দেখে আবার একদিন ঘোড়ার মালিকের কাছে যায়। এবার সে অর্থের বিনিময়ে ঘোড়াটি পেতে চায়। কিন্তু মালিক অর্থের লোভে তার শখের ঘোড়াটি ছাড়তে রাজী হলো না। বললে: শখের জন্যই তো অর্থের দরকার, নইলে অর্থের কি প্রয়োজন? আপনি অর্থ দিয়ে ভালো দেখে একটি কিনে নিন। এটা আমি ছাড়তে পারবো না। আমি ঘোড়ার ব্যবসা করিনে।

ছেলেটি তথাপি নাছোড়বান্দা। সে একদিন তার বাবাকে বললে: বাবা তুমি আবার গিয়ে মালিককে বুঝিয়ে বলো যে, আমার অবস্থা বড়ই শোচনীয়, ঘোড়াটি না পেলে আমার জীবন-প্রদীপ নিভে যাবে, আর আমার জীবনপ্রদীপ নিভে গেলে তোমার জীবনের তেলও ফুরিয়ে যাবে। পিতা ঘোড়ার মালিকের কাছে গিয়ে তেমনি-তেমনি কথাগুলি বললে। কিন্তু তাতেও লাভ হলো না। ঘোড়ার মালিক বললে: তোমার ছেলেটি যেমন তোমার জীবনের

তেল, আমার ঘোড়াটিও তেমনি আমার জীবনের। অতএব ঘোড়াটি ছাড়া যে আমার পক্ষে সম্ভব নয়, সামান্য কল্পনা খরচ করলেই তা বুঝতে পারবে।

এবার ফিরে এসে পিতা সবচেয়ে বড় বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করবে মনস্থ করলে। একদিন রাত্রে সে চুপি-চুপি আস্তাবলে গিয়ে হাজির। কিন্তু সেখানে পৌঁছেই সে অবাক! ঘোড়াটি তো একা নয়, প্রেমিক যেমন প্রিয়ার গায়ে ভালোবাসার হাতটি রেখে ঘুমোয়, মালিকটিও তেমনি ঘোড়ার উপর হাতটি রেখে ঘুমুচ্ছে। অতিকষ্টে হাতটি সরিয়ে সে ঘোড়া নিয়ে দিল চম্পট। টের পেয়ে ঘোড়ার মালিক দ্বিতীয় ঘোড়াটি নিয়ে তাকে অনুসরণ করলে। কিছু দুর গিয়েই সে দেখে দ্বিতীয় ঘোড়াটি প্রথমটিকে হটিয়ে দেওয়ার উপক্রম করছে। কিন্তু সেটা তার সহ্য হলো না। তাই চিৎকার করে বলে উঠল: এই বেকুব, ঘোড়ার কানে এ-কথাটা বল, আর ঘোড়ার গায়ে এমনি করে আঘাত কর; তা হলেই ঘোড়া চলবে। যেমনি উপদেশ, তেমনি কাজ। ইশারা পেয়ে ঘোড়াটি হাওয়ার বেগে ছুটতে শুরু করলে। দ্বিতীয়টি আর তাকে ধরতে পারল না। ঘোড়ার মালিক তাকে নিয়ে বাড়ী ফিরে এলো।

বন্ধুরা জিজ্ঞেস করলে: কিহে ঘোড়াটি পেয়েছিলে?

সে বললে: হ্যাঁ পেয়েছিলাম। তবে ঘোড়াটি হটে যাচ্ছিল দেখে আমি আরোহীকে ইশারা বাতলে দিলাম, আর ইশারা মতো চালিয়ে সে অচিরেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

বন্ধুরা বললে: বেকুব।

সে বললে: তোমরা তো আর আমার ঘোড়াটিকে ভালোবাসতে না।

*　　*　　*

যে প্রেম অনুরাগের পাত্রটিকে বিকাশের জন্য ছেড়ে দেয়,

সে-প্রেমই যথার্থ প্রেম। যে প্রেম ধরে রাখে, বিকাশের দিকে তাকায় না, সে প্রেম প্রেম নয়, স্বার্থপরতা।]

সাহসই আনন্দ। তাই যা-কিছু সাহসের অনুকূল তা-ই সমর্থন-যোগ্য। ছেলে-বয়সে যে-অভ্যাসের সৃষ্টি হয় বড় হয়ে তা আর যেতে চায় না, সারা জীবন টিকে থাকে। ছেলে বয়সে যারা মায়ের আদরের আশ্রয়ে বাস করে, বড় হয়ে তারা প্রেমে পড়ে আশ্রয়েরই তাগিদে। একটি মেয়েকে নিয়ে জগৎ ভুলে থাকবে, তার তারিফে মশগুল হয়ে আরামসে কাটাবে, এই তাদের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। প্রেম তাদের বিশ্বমুখীন করে না, কুনো করে। মায়ের কাছে যেমনটি পেয়েছিল, পত্নীর কাছেও তেমনি স্নেহই তারা প্রত্যাশা করে বসে। কিন্তু পত্নীরা যদি সেজন্য তাদের 'বয়স্ক শিশুর' নজরে দেখে তো সেটা তাদের সহ্য হয় না, শ্রদ্ধা-হীনা বলে পত্নীদের প্রতি দোষারোপ করে। ভীরু তারা, বাইরে না গিয়ে ঘরে বসে রাজা-উজির মারে। যে-স্নেহমমতার দৃষ্টি কেবলই রক্ষার দিকে বিকাশের দিকে নয়, সে স্নেহমমতার তেমন মূল্যই নেই তা তারা বুঝতে পারে না। সাহস ও আশাসঞ্চারী প্রেমের মূল্য অধিক, কেননা, তা-ই শক্তির উদ্‌বোধক। তাই বলে যে তাতে একটা রক্ষার দিক নেই, তা নয়। আমরা যাকে ভালো-বাসি তাকে যেমন বাড়াতে চাই, তেমনি বাঁচাতেও চাই। বাঁচানোর মধ্যে বাড়ানোর স্পৃহা না থাকলেও বাড়ানোর মধ্যে বাঁচানোর স্পৃহা থাকবেই। লোকটা না বাঁচলে বাড়বে কি করে? অর্থাৎ বাঁচা বাড়ার অনিবার্য শর্ত হলেও, বাড়া বাঁচার অনিবার্য শর্ত নয়। আপনি বাঁচলেই যে বাড়বেন এমন কোন কথা নেই কিন্তু বাড়তে হলে আপনাকে বাঁচতে হবেই। তাই রক্ষার দিকটাকে একেবারে বাতিল করে দেওয়া যায় না; তারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেটাই যাতে প্রধান না হয়ে দাঁড়ায় সেদিক নজর রাখা দরকার। এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে: ভালোবাসার

তাগিদে দুঃস্থ লোকটিকে রক্ষা করতে যাওয়া এক কথা, আর দুর্ভাগ্যের সম্ভাবনা সম্বন্ধে কোন মানুষকে সাবধান করে দেওয়া ভিন্ন কথা। প্রথমটি করলে লোকটির ক্ষতি হয় না, উপকারই হয়, কিন্তু দ্বিতীয়টির দ্বারা উপকারের চাইতে অপকারই হয় বেশী। যে-প্রেম দুর্ভাগ্যের সম্ভাবনার দিকে নজর রেখে মানুষকে ভীতত্রস্ত করে তা মন্দ প্রেম; তা দিয়ে চরিত্রের বিকাশ হয় না, ধ্বংস হয়। আসলে তা প্রেমই নয়, প্রেমের ছদ্মবেশধারী অধিকারবৃত্তি। অপরের জীবনে ভয়কে জাগিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য তাকে নিজের তাঁবে রাখা। 'বাছারে ওখানে যাসনে, ওখানে ভূত, ওদিকে তাকাসনে, ওদিকে জুজুবুড়ি'—এ-ধরনের কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে ছেলের উপরে নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখা। এই কর্তৃত্ব ছেলেদের সর্বনাশ করে—তাদের আত্মকর্তৃত্বের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। অত্যধিক স্নেহের জারক রস যে শিশুর শক্তির অস্থিমজ্জা জীর্ণ করে ফেলে তা জানে না বলেই জননীরা স্নেহের ক্ষুধাকে প্রশমিত করতে পারে না। নইলে তা নিয়ন্ত্রিত করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হতো না। এই প্রভুত্বের তাগিদেই পুরুষরা সাধারণতঃ ভীরু রমণী পছন্দ করে। কেননা, তা হলেই তাকে অধীনে রাখা সম্ভব হয়, সাহসী হলে আর সে-সুবিধা পাওয়া যায় না। কর্তৃত্বের পক্ষপাতিরা তাই ভীরুতার ভক্ত। এক পক্ষ ভীরু না হলে অপর পক্ষের কর্তৃত্ব সম্ভব হয় না।

[এক শ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞরা এমনি ভীতিসঞ্চারী প্রেমের পরিচয় দিয়ে থাকে, জনসাধারণকে তাদের তাঁবে রাখবার উদ্দেশ্যে। 'ঐ যে শত্রু আসছে', বলে তারা মানুষকে ভীতত্রস্ত করে রাখতে চায়। Create enemy and rule—শত্রু সৃষ্টি করে শাসন করো, নীতির উদ্দেশ্যই হচ্ছে প্রগতির সংকল্প ভুলিয়ে দিয়ে মানুষকে অন্ধ করে রাখা। এখন বিকাশের যুগ নয়, আত্মরক্ষার যুগ, দেখতে পাচ্ছেন না শত্রু বাইরে দাঁড়িয়ে—এ উক্তির মধ্যে লুকিয়ে থাকে

প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের অমোঘ হাতিয়ার। তারা কোনোদিন দেশকে আলো দান করে না, অন্ধ করে রাখে। জনসাধারণের বুদ্ধিকে অবিকশিত রাখাই তাদের উদ্দেশ্য, সুতরাং ভীতিসঞ্চারী রাজনীতিকদের সমর্থন না করাই ভালো। তাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আমাদের ভাতকাপড়ের কী করলেন, তো তারা উত্তর দেবে: সর্বনাশ, ওকথা তুলো না, চেয়ে দেখো প্রতিবেশী রাষ্ট্রের লোকেরা তোমাদের আক্রমণ করার আয়োজন করছে। আগে দেশরক্ষা, পরে খাওয়া-পরার কথা। বুঝলে?—আসলে নিজেদের উন্নতির দিকেই তাদের নজর, দেশের উন্নতির দিকে নয়।

স্বদেশপ্রেমের দুটি দিক: সত্যকার প্রেমের দিক আর বিদেশ-বিদ্বেষের দিক। বিদেশ-বিদ্বেষই যাদের কাছে বড় হয়ে ওঠে তাদের দ্বারা দেশের কল্যাণ হয় না। তারা দেশের শত্রু। উগ্রচণ্ড মেজাজ নিয়ে তারা দেশবাসীর বুদ্ধি লোপ পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। তাই তাদের সম্বন্ধে সাধবান হওয়া উচিত। জনসাধারণের আবেগ নিয়ে খেলা করে যারা তাদের প্রভুত্ব বজায় রাখতে চায় তাদের আস্কারা দেওয়া ঠিক নয়। কিন্তু মুশকিল এই যে বিদ্বেষের নামে মানুষ যতটা মেতে ওঠে, প্রেমের নামে ততটা নয়। এখানে বুদ্ধির সহায়তা দরকার। বিদেশ-বিদ্বেষের ধ্বংসকরতা সম্বন্ধে বুদ্ধি জনসাধারণকে হুঁশিয়ার করে দিতে পারে। জনসাধারণ নিজেদের স্বার্থ না বুঝলে উগ্রচণ্ড রাজনীতিজ্ঞদের দফারফা হওয়ার সম্ভাবনা কম। কেননা, তাদের হাত করেই তারা জগতে নানা রকমের দ্বন্দ্ব বাধায়। তারা যদি একবার জোর গলায় নিজেদের দাবী জানিয়ে বসে তো মোড়লরা আর সুবিধা করতে পারে না। জগতে শান্তি স্থাপনের এটি বড় উপায়।]

এযাবৎ আমরা ছেলেমেয়েদের নিরাপত্তা ও জীবনবিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় স্নেহমমতার কথাই আলোচনা করেছি। এবার পূর্ণবয়স্ক নর-নারীর ভালোবাসা সম্বন্ধে কিছু বলবো। ভালোবাসা

বঞ্চিত নর-নারীর মতো এমন দুর্ভাগ্য আর কেউ নয়। একটা বড় রকমের আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকে বলে তারা জীবনের সার্থকতা খুঁজে পায় না। প্রেমের স্বাদ-পাওয়া লোকটি নিজেকে সম্রাটের মতো মহিমময় মনে করে। জীবনের ঐশ্বর্যের জন্য সে প্রিয়াকে অভিনন্দন জানায়:

তুমি মোরে করেছ সম্রাট। তুমি মোরে
পরায়েছ গৌরব-মুকুট। পুষ্পডোরে
সাজায়েছ কণ্ঠ মোর। তব রাজটীকা
দীপিছে ললাট-মাঝে মহিমার শিখা
অহর্নিশি।

*　　*　　*

হৃদি-শয্যাতল
শুভ্র দুগ্ধফেননিভ, কোমল শীতল
তারি মাঝে বসায়েছ। সমস্ত জগৎ
বাহিরে দাঁড়ায়ে আছে নাহি পায় পথ
সে অন্তর অন্তঃপুরে। নিভৃত সভায়
আমারে চৌদিকে ঘিরি' সদা গান গায়
বিশ্বের কবিরা মিলি'।

সৌন্দর্যের যে নন্দনকাননে বিশ্বের প্রেমিক-প্রেমিকার ভিড় সেখানে সে তার নিজের উপস্থিতিও অনুভব করে:

হাত ধরে মোরে তুমি
লয়ে গেছ সৌন্দর্যের সে নন্দনভূমি
অমৃত-আলয়ে। সেথা আমি জ্যোতিষ্মান
অক্ষয় যৌবনময় দেবতা সমান
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা
সেথা মোরে অর্পিয়াছ আপন মহিমা

নিখিল প্রণয়ী, সেথা মোর সভাসদ্
রবীন্দ্র তারা, পরি' নব পরিচ্ছদ
শুনায় আমারে তারা নবনব গান
নব অর্থভরা চিরসুহৃদ সমান
সর্ব-চরাচর।

কিন্তু যে লোকটি প্রেমের প্রসাদ পায়নি তার জীবনে এমন সার্থকতাবোধ নেই, সে নৈরাশ্যের কারাগারে বন্দী। তিক্ততা আর বিরক্তিবোধে তার জীবন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। কোনো কাজেই সে আনন্দ পায় না. দুনিয়াটা মনে হয় একটা তাৎপর্যহীন ছন্নছাড়া ব্যাপার। ভালোবাসা না পাওয়ায় ভালোবাসার বিপরীত যে ঘৃণা আর বিদ্বেষ তা-ই তার ভেতরে জেগে ওঠে এবং নিষ্ঠুর আচরণের দ্বারা জগতের উপর প্রতিশোধ নেওয়া তার স্বভাব হয়ে দাঁড়ায়। শৈশবের দুর্ভাগ্যের ফলে যে চারিত্রিক ত্রুটি তথা আত্মবিশ্বাসহীনতা জন্মে, যৌবনে প্রেমবঞ্চনাবোধের মূলেও সেই আত্মবিশ্বাসের অভাব। আত্মবিশ্বাসহীন লোকটি নিজেকে কারো ভালোবাসা পাওয়ার উপযুক্ত মনে করে না। কিন্তু কথাটা পুরুষদের বেলা যতটা সত্য মেয়েদের বেলা ততটা নয়। কেননা, মেয়েরা পুরুষদের ভালোবাসে চরিত্রের জন্য, কিন্তু নিজেরা পুরুষদের অনুরাগভাগিনী হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। চরিত্রের জন্য নয়, রূপের জন্যই তারা পুরুষদের ভালোবাসা পায়। এখানেই মেয়েদের জিত; কারণ রূপের প্রয়োজন তারা যতটা বোঝে, চরিত্রের তথা ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন পুরুষরা ততটা বোঝে না। তাই চেষ্টার দ্বারা নিজেদের প্রেমের উপযুক্ত করে তোলা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

পাওয়ার দিক সম্বন্ধে যা বলবার বলেছি, এখন দেওয়ার দিক সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পেশ করছি। পাওয়ার মতো দেওয়ারও দুটি দিক আছে: জীবনপ্রীতির দিক আর ভয়ের দিক। জীবনপ্রীতির তাগিদে যে অনুরাগ তার মূল্য অনেক; ভীতিজনিত প্রেমের

তেমন মূল্য নেই। শান্তস্নিগ্ধ দিনে সৌন্দর্যের টানে তরীটিকে তীরের দিকে চালনা করা এক কথা, আর তলা ফেঁসে যাওয়ার দরুন তাকে তীরাভিমুখী করা ভিন্ন কথা। একটির মধ্যে বড় হয়ে উঠেছে সৌন্দর্যের টান, আরেকটির মধ্যে ভীতির আকর্ষণ। উভয়ের মধ্যে আসমান-জমিন ফরাগ। ভীতির টানটি আত্মরক্ষার তাগিদে, আর সৌন্দর্যের টানটি আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনে। বিপন্ন লোকটির ভালোবাসার চেয়ে নিরাপদ লোকটির ভালোবাসাই উন্নত স্তরের। সেখানে সংকীর্ণ স্বার্থের গন্ধ কম। প্রকৃতপক্ষে ভালোবাসায় দুটি দিকই জড়িয়ে থাকে এবং দুটির মধ্যে কোন্‌টা প্রাধান্য লাভ করে সেটাই প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। সহজ জীবনপ্রীতির দিকটি বড় হয়ে উঠলেই ভালো। কেননা, তাতেই অন্তর প্রসারিত হয়, প্রতিভা খোলে, জীবনবীণা সুরে বেজে ওঠে। অপরটি দিয়ে তা হয় না। কিন্তু তাই বলে যে তার কোন প্রয়োজন নেই তা নয়। একবার তা পেলে নিশ্চিন্ত মনে জগতকে ভালোবাসা যায়। আপনি যদি সব সময়ই বিপদের ভয়ে সংকুচিত থাকেন তো আপনি আর ক্রিয়েটিভ হতে পারেন না—আপনার সমস্ত শক্তি আত্মরক্ষার কাজেই নিযুক্ত হয়, আত্মপ্রকাশের কাজে আর লাগে না। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে, ভীতিমুক্তি আনন্দের একটা শর্ত মাত্র, সেটা নিজেই আনন্দ নয়। যে-ভালোবাসার উদ্দেশ্য কেবল পুরানো দুঃখ দূর করা, নতুন সুখ সৃষ্টি করা নয়, তার মূল্য কম। তা কৃপণের ধন, ঐশ্বর্যবানের বিভূতি নয়।

প্রাণপ্রদায়ী ভালোবাসার মূল্যই অধিক। আনন্দে যা গ্রহণ করা হয়, আর সহজে বিনা উদ্দেশ্যে যা দেওয়া হয়, তা-ই সমৃদ্ধিকর। এই ধরনের ভালোবাসার ফলেই জগৎ ও জীবন মধুময় হয়ে ওঠে। আরেক রকমের ভালোবাসা আছে, যা কেবলই গ্রহণ করে, দিতে জানে না। রক্তশোষক এই ভালোবাসা একের পর অপরের রক্ত শোষণ করে চলে, প্রেমের পাত্র বা পাত্রীটির কোন ক্ষতি হল

কিনা সে দিকে তাকায় না। তার মূল্য কী? সে তো উদ্দেশ্য-সাধনের একটা উপায় মাত্র। একটা উদ্দীপনার আশায়ই সে তাকে কামনা করে, উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হয়ে গেলেই তাকে ভুলে যায়। প্রাণ পাওয়ার জন্যই তো তোমাকে চেয়েছিলাম, এখন প্রাণ যখন পেয়ে গেছি, তখন তোমাকে দিয়ে আমার কী লাভ, এমন একটা ভাব তার অচেতনে থাকে। তাই যাদের জীবন থেকে রস টেনে নিয়ে সে শক্তিশালী হয়, তাদের প্রতি উদাসীন থাকতে তার বাধে না। নিত্য-নতুন প্রেরণা পেয়ে বলশালী হলেও সার্থক সুখের স্বাদ তার ভাগ্যে জোটে না। 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী তার ভগবান কাঁদে—ভগবান প্রেমের কাঙাল' উচ্চকাঙ্ক্ষীদের জীবনেই এরূপটি ঘটে থাকে। অতিরিক্ত শক্তিকামনার দরুন জীবনছন্দ হারিয়ে বসে বলে উচ্চকাঙক্ষীরা জীবনের স্বাদ-গন্ধ কিছুই পায় না। সুকুমারবৃত্তির শত্রু যদি কেউ থেকে থাকে তো তা এই উচ্চকাঙক্ষা। উচ্চ-কাঙক্ষীরা অপরের প্রতি নিষ্ঠুর হতে দ্বিধা করে না, আর নিষ্ঠুরতা ধীরে ধীরে সুখের অনুভূতিটি নষ্ট করে দেয়। তরুণ-বয়সে দুর্ভাগ্যের দরুন যে মানববিদ্বেষের সূচনা হয়, তারি ফলে উচ্চকাঙক্ষার জন্ম। একটা 'দেখিয়ে দেব' ভাব এই ধরনের লোকদের পেয়ে বসে। আচ্ছা, আচ্ছা তোমরা আমাকে দুঃখ দিয়েছ, যদি বড় হয়ে তার প্রতিশোধ না নেই তো আমি বাপের বেটা নই—এমনি একটা সংকল্প তাদের জীবনের নিয়ামক হয়ে ওঠে বলে তারা আর সহজ আনন্দ পায় না। ঈর্ষার আধিপত্য মেনে নেওয়ার দরুন তাদের জীবনে বিকৃতি দেখা দেয়। তখন তাদের উক্তি হয়ে দাঁড়ায়ঃ

ক্ষুদ্র নহে, ঈর্ষা সুমহতী
ঈর্ষা বৃহতের ধর্ম। দুই বনস্পতি
মধ্যে রাখে ব্যবধান, লক্ষ-লক্ষ তৃণ
একত্রে মিলিয়া থাকে বক্ষে বক্ষে লীন।

*　　*　　*

প্রীতিদান স্বেচ্ছার অধীন,
প্রীতিভিক্ষা দিয়ে থাকে দীনতম দীন,
সে প্রীতি বিলাক তারা পালিত মার্জারে,
দ্বারের কুকুরে আর পাণ্ডব ভ্রাতারে,
তাহে মোর নাহি কাজ। আমি চাহি ভয়,
সেই মোর রাজ্যপ্রাপ্য, আমি চাহি জয়
দর্পিতের দর্প নাশি।

এই যে উক্তি, এ কেবল দুর্যোধনের একার নয়, ঈর্ষাপ্রেরিত সমস্ত উচ্চকাঙ্ক্ষী মানবগোষ্ঠীর। ছেলেবয়সের অনাদর ও অবহেলার ফলে যে আক্রোশ জন্মে তা-ই এর গোড়ায়। দুর্যোধন সমস্ত লাঞ্ছিতম্মন্য শক্তিকামী মানুষের প্রতিনিধি। উচ্চকাঙক্ষী মানুষেরা আসলে বিকৃত মানুষ। ভারসাম্যবর্জিত বলে তাদের দ্বারা জগতের কোন কল্যাণ হয় না। সহজ সুন্দর জীবনের মূল্য তারা দিতে নারাজ। সুতরাং জগতের আদর্শ হিসাবে গণ্য হওয়ার অধিকার তাদের নেই। বরং যাদের বর্জন করে চলা উচিত তারা তাদেরই দলে। জগতের উপর কর্তৃত্ব করতে সক্ষম হলেও, সহজ সুখ এ-ধরনের লোকদের ভাগ্যে জোটে না। অথবা আরো সত্য করে বলতে গেলে সহজ সুখ তাদের ভাগ্যে জোটে না বলেই তারা জগতের উপর কর্তৃত্ব করতে চায়। নইলে শক্তিময় জীবনের চাইতে প্রীতিময় জীবনই এদের কাম্য হত। প্রীতিই অহং-এর কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়, শক্তি নয়। শুধু ভালোবাসা পেলেই চলে না, দিতেও হবে। অপরকে ভালোবাসতে দেখলেই মনে করবো আপনি অহং-এর কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন। ভালোবাসার ব্যাপারে অপরকে বড় করে না দেখে নিজেকে বড় করে দেখলে আপনি ঠক্‌বেন—জীবনের একটা বড় রকমের স্বাদ থেকে বঞ্চিত

থাকবেন। তাই প্রাপ্ত ভালোবাসা যাতে দেওয়ার ক্ষমতাটিকে মুক্তি দেয় সে-দিকে নজর রাখা দরকার। [দেওয়ার জন্য যখন মানুষ আকুতি অনুভব করে তখনি সে পূর্ণ। দানের ক্ষুধা পূর্ণতা-বোধেরই অভিব্যক্তি। যে অপূর্ণ সে দিতে জানে না, নিতে জানে, সে বলে: আমি তো যথেষ্ট দিয়েছি, এর চেয়ে বেশী আর দেওয়া যায় কী করে? আমার মতো কেউ ভালোবাসতে জানে না। —কিন্তু পূর্ণ-অন্তর মানুষটি কেবল দীনতাই বোধ করে। সে বলে: হায়, হায়, যেমনভাবে ভালোবাসা উচিত ছিল তেমনভাবে আর ভালোবাসতে পারলাম কৈ? প্রচুর ভালোবাসা আমার ভেতরে নেই। আমি হতভাগ্য।—

কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না শুকনো ধুলো যত,
কে জানিত আসবে তুমি গো অনাহূতের মতো।
তুমি পার হয়ে এসেছ মরু নাই যে সেথায় ছায়াতরু
পথের দুঃখ দিলেম তোমায় এমন ভাগ্যহত।]

প্রেমের বিকাশে সামাজিক আর মনস্তাত্ত্বিক বাধা চিরকালই অকল্যাণকর। ভালোবাসার পাত্র বা পাত্রটি পাছে বিশ্বাসঘাতকতা করে অথবা দোষদর্শী সমাজ নিন্দা রটায়, এই ভয়ে অনেকেই ভালোবাসা-প্রকাশে সংকোচ বোধ করে। ফলে ভীরুতা আর বিদ্বেষ উভয়ের পীড়নে জীবন হয়ে পড়ে অতিষ্ঠ। জগতের প্রতি তখন আর লোকটা সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকাতে পারে না, কেমন একটা আক্রোশের দৃষ্টিতে তাকায়। অবদমন আর শাসন জীবনে বিকৃতি এনে দেয় এবং বাইরের দিকে অপাপবিদ্ধ থেকে গেলেও, ভেতরের দিকে লোকটির কলুষের অন্ত থাকে না। তাই বলে যে দুর্নীতিপরায়ণ লোকেরা এদিক দিয়ে সৌভাগ্যবান তাও বলা চলে না। তাদের জীবনও ব্যর্থ। আত্মসমর্পণের অভাবহেতু উভয়ের ব্যক্তিত্ব তথা একাকিত্ব রক্ষা করে চলার দরুন মিলনের চূড়ান্ত

আনন্দ এরা পায় না। এ-ধরনের লোকদের সম্বন্ধে মূল্যবান কিছুই নেই। আমি এই বলতে চাই যে, নরনারীর সম্বন্ধটি সেখানেই সার্থক, যেখানে কেবল তুষ্ণীভাব থাকে না, আত্মদানের প্রবল আগ্রহ থাকে। পরস্পরের ব্যক্তিত্ব গলে গিয়ে একটা নতুন ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত প্রেম সার্থক হয় না। প্রেমের ব্যাপারে সাবধানতার মতো সুখের শত্রু আর কিছুই নেই। [ভালোবাসার ব্যাপারে পাটোয়ারি বুদ্ধি ভালো নয়। যাকে দেবেন, সম্পূর্ণভাবেই দেবেন, একেবারে 'বাকি আমি রাখবো না কিছুই' প্রতিজ্ঞা করে দেবেন। তা না হলে জীবনে বিকৃতি দেখা দেবে। যতো দেবেন ততোই পাবেন। কার কাছ থেকে? নিজের কাছ থেকেই। যতই ভালোবাসবেন ততোই জীবনের স্বাদ পাবেন, স্বাদ পাওয়াটাই বড় কথা। ভাবনাটা দেওয়ার আগে চলতে পারে, দেওয়ার সময় বা পরে নয়। দেওয়ার পরে যদি কোন কারণে ভাবনা দেখা দেয়, আর তাতে সত্যি সত্যি মন দ্বিধান্বিত হয়ে যায়, তো সম্বন্ধটি ছিঁড়ে ফেলাই ভালো, নিজেকে কি পরকে কাউকেই ঝুলিয়ে রাখা ঠিক নয়। প্রেম কারাগার রচনার জন্য নয়, মুক্তির জন্য। আগুন নিয়ে খেলা না করাই ভালো।]*

* কোন ইংরেজ লেখকের অনুসরণে। তৃতীয় বন্ধনীর উক্তি আমার নিজের। মূলে সেগুলো নেই।—মো·হো·চৌ।

পরিবার ও সুখ

অতীত থেকে আজ পর্যন্ত যে-সব প্রতিষ্ঠান চলে এসেছে তাদের মধ্যে পরিবারই সবচেয়ে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। পূর্বে পরিবার থেকে যে-সুখ পাওয়া যেত আজকাল আর তা পাওয়া যায় না। মাতাপিতা আর সন্তানের সম্বন্ধের মধ্যে এমন একটা বিকৃতি দেখা দিয়েছে যার ফলে পরিবারের ভিত্তিটি নড়বড়ে হতে চলেছে। এই বিকৃতি দুর করতে হলে পরিবারের প্রয়োজনীয়তা ও তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করে দেখা দরকার। কিন্তু পরিবারের নানাদিক এবং সকল দিকের আলোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তাই একটি দিকেই আমাদের দৃষ্টি আবদ্ধ রাখব এবং সে দিকটি হচ্ছে ব্যক্তি সুখের দিক। সমাজের আমূল পরিবর্তন না করে, অনেকটা বর্তমান অবস্থাতেই নরনারী পরিবার থেকে কতটুকু সুখ আদায় করে নিতে পারে, তা-ই হবে আমাদের দেখবার বিষয়।

অবস্থাপন্ন লোকদের পানে তাকালে দেখতে পাওয়া যায়, তারা পারিবারিক জীবনকে বোঝার মতো ভয় করে। মেয়েদের স্বাধীন জীবিকা অর্জনের সুবিধা আর পারিবারিক পরিচর্যার অবসান, এ দু'কারণে পারিবারিক জীবনের ইমারতটি ধ্বসে পড়ছে। প্রাচীন-কালে মেয়েরা বিয়ে করতে বাধ্য হতো কুমারী জীবনের অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকায় সেকালে কুমারীদের প্রথমে পিতৃনির্ভর পরে ভ্রাতৃনির্ভর হয়ে জীবন-যাপন করতে হত। পরিবারের চার দেয়ালের বাইরে গিয়ে জীবন-উপভোগের স্বাধীনতা তাদের ছিল না। চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা

করে চলা ছিল তাদের জীবনের মূল লক্ষ্য। চারিদিকে পতনের ভয় দেখতে পেত বলে তারা অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে থাকত, আর সংকোচন এনে দিত তিক্ততা আর বিরক্তি। সাবধানতা সত্ত্বেও যাদের পতন ঘটত তাদের শোচনীয়তার অন্ত থাকত না। বেদরদী নিষ্ঠুর সমাজের অত্যাচারে তারা নাজেহাল হত। এই অসহ্য দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় ছিল মৃত্যুবরণ। আধুনিক মেয়েরা কিন্তু অনুরূপ অবস্থায় নিজেদের এতটা অসহায় মনে করে না। শিক্ষা থাকার দরুন তারা সহজেই জীবিকা-অর্জনের উপায় করে নিতে পারে, আর পিতৃনির্ভর কি ভ্রাতৃনির্ভর হয়ে চলতে হয় না বলে নিজেদের রুচি-অনুযায়ী চলা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয় না। নিজের মেরুদণ্ডের উপর শক্ত হয়ে দাঁড়াতে তারা ভরসা পায়। মা-বাবারাও তাদের রুচির উপর কর্তৃত্ব খাটাতে সাহস পায় না, খাটাতে গেলে মর্যাদা অক্ষুন্ন না থাকার ভয় থাকে বলে। ফল দাঁড়িয়েছে এই, নিজের রুচিসম্মত জীবন-যাপনের সুবিধা থাকায় অবস্থাপন্ন পরিবারের অনূঢ়া মেয়েরা আর বিয়ের বাঁধনে ধরা দিতে চায় না। মুক্ত পাখীর জীবনই তাদের প্রিয়। সন্তানকামনার তাগিদে যারা বিবাহিত জীবনের অধীনতা মেনে নেয় তাদের অনেক দুঃখ পোয়াতে হয়। বিয়ের ফলে নিজের কাজটি চলে যাওয়ার দরুন স্বামীর পরিমিত আয়ের উপর নির্ভর করেই তাদের চলতে হয়। পূর্বে যে আয়ে একজন চলত এখন সে আয়ে দু'জনকে চলতে হচ্ছে বলে তাদের টানাটানি সংসার। তাই তাদের কষ্টের অন্ত থাকে না। পরিবারের যে-সব কাজে তাদের বন্দী হয়ে থাকতে হয় তা এতো নিম্নস্তরের যে তাতে তাদের ক্ষমতা ও শিক্ষা কোনটাই কাজে লাগে না। যদি পরিচারিকার দ্বারা কাজগুলি গুছিয়ে নেওয়া হয়, তো তাতেও মেজাজ খারাপ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কাজে গাফিলতির জন্য পরিচারিকাদের তম্বি করে করে তারা হয়রাণ হয়ে পড়ে।

এভাবে নিম্নস্তরের কাজের বোঝা বইতে বইতে তারা বুদ্ধি ও মাধুর্য উভয়ই হারিয়ে বসে। তখন কী স্বামী কি সন্তান কেউই আর তাদের সঙ্গে থেকে আনন্দ পায় না। স্বামী অফিস থেকে ফেরার পরে যে-পত্নীটি সমস্ত দিনের দুঃখ-বেদনার কাহিনী শোনায় সে বিরক্তির উদ্রেক করে, আর যে শোনায় না সে উদাসীনতার পরিচয় দেয়। বিরক্তি ও উদাসীনতা উভয়ই মন্দ, কেননা উভয়ই জীবন-বিকাশের পরিপন্থী। সারাদিন সংসারের খুঁটিনাটি কাজে রত থাকায় মেয়েদের মন সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। ফলে বাঁচার আনন্দ তারা পায় না, জীবন তাদের কাছে বোঝার মতো মনে হয়। নিজে খুশী হলেই অপরকে খুশী করা যায়। অত্যধিক কাজের চাপে খুশী হওয়ার ক্ষমতাটি হারিয়ে বসে বলে মেয়েরা আর অপরকে আনন্দ দিতে পারে না। দুঃখ এই যে, যে পরিবারের জন্য হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে তারা জীবনের মাধুর্য হারিয়ে বসে, সেই পরিবারের লোকেরাই তাদের দুঃখ বুঝতে পারে না—খামাখা তাদের প্রতি অপ্রসন্ন হয়।

উপরে যে-সব কথা বলা হল সে-সবই অর্থনৈতিক সমস্যার অন্তর্গত। অর্থনৈতিক সমস্যার পরেই আসে বাসস্থানের সমস্যা। মধ্যযুগের নগরগুলি গ্রামের মতো ঝোপঝাড় বিশিষ্ট ছিল। সে-সব ঝোপঝাড়ে ছেলেমেয়েরা ফলফুল কুড়িয়ে বেড়াবার সুবিধা পেত। ছড়াতে তার খবর পাওয়া যায়ঃ—

> পলবাবাজির চূড়ার উপর একটি আপেল গাছ—
> দিন রজনী চল্‌চে সেথায় লক্ষ ফলের নাচ।
> কঞ্চি হাতে সেথায় কচি ছেলেরা যায় ছুটি,
> সন্ধ্যা বেলা বাড়ী ফেরে আপেল নিয়ে লুটি'।
> ঝোপের পরে ঝোপ পেরিয়ে ফুর্তিসে কী-যে,
> খেলতে খেলতে পৌঁছে তারা লণ্ডন ব্রীজে॥

পল-চার্চের চূড়াটি এখন আর নেই। সেন্টপল আর লণ্ডন ব্রিজের মধ্যবর্তী ঝোপঝাড়গুলি কখন অদৃশ্য হয়ে গেছে কেউ তা বলতে পারে না। এই ছড়াটির মধ্যে যে মধুর জীবনের পরিচয় পাওয়া যায় তা গত হয়েছে আজ বহুদিন। তখন এবং তারও বহু পরে—এমনকি এই সেদিনও—গাঁয়েই বেশী সংখ্যক লোকের বাস ছিল। শহরগুলি খুব বড় ছিল না বলে শহর থেকে বেরিয়ে গাঁয়ে যাওয়া অত্যন্ত সহজ ছিল। শহরের প্রায় বাড়ীর সামনেই একটি বাগান থাকত এবং ঝোপঝাড়েরও কমতি ছিল না। মোট কথা সর্বত্রই একটা গ্রাম-গ্রাম ভাব ছিল। এখন আর তা নেই। অধুনা ইংলণ্ডে গ্রামের উপর শহরের প্রভাব সুস্পষ্ট, শহরের উপর গ্রামের প্রভাব নেই বললেই চলে। শহরগুলিতে আর গ্রাম-গ্রাম ভাব নেই, বরং উল্টে গ্রামগুলিতে শহর-শহর ভাব দেখা দিয়েছে। লণ্ডন নিউইয়র্ক শহর এত বিস্তীর্ণ যে, তাদের থেকে বেরিয়ে গাঁয়ে আসতে হলে অনেক সময়ের দরকার। অতএব ফাঁকা যায়গা উপভোগ করার সুযোগ আর সহজে পাওয়া যায় না। ছোট্ট একটি ফ্ল্যাট নিয়ে নগরবাসীদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তার সঙ্গে মাটির কোন সম্বন্ধ না থাকার দরুন ছেলে-মেয়েরা খেলবার কোন সুযোগ পায় না এবং মা-বাবাদেরও ছেলেমেয়েদের গোলমালের মধ্যে বাস করতে হয়। তাই ব্যবসায়ী লোকেরা শহরের উপকণ্ঠে বাস করতে চায়। তাতে ছেলেমেয়েদের সুবিধা হলেও পরিবারের কর্তাটির অসুবিধা হয় বিস্তর। অধিকাংশ সময় গৃহের সম্পর্কবর্জিত হয়ে কাটাবার দরুন সে অত্যধিক অবসন্ন ও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে। (শহরে বাস করলে সে মাঝে-মাঝে পুত্রকলত্রের প্রীতিস্পর্শ পেত, এখন আর সে সম্ভাবনা থাকে না। তাই বাঁচার আনন্দ সে আর পায় না।) অন্যদিক দিয়েও তা ক্ষতিকর। শহরে বাস করতে হয় বলে শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত ঘরের উপর তার কোন কর্তৃত্ব থাকে না। ঘরে যেন সে অতিথি।

সন্ধ্যা বেলা আসে আবার ভোর বেলা চলে যায়। নিদ্রার সঙ্গীরা আর জাগরণের সঙ্গী হতে পারে না।

কিন্তু বাসস্থানের সমস্যাও আসলে অর্থনৈতিক সমস্যার অন্তর্গত, আর আমূল পরিবর্তনের দিকে আমরা যাচ্ছি না বলে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান আমাদের আলোচনার বাইরে। বর্তমানকালে সন্তান-সন্ততি আর জনক-জননীর মধ্যে যে মনস্তাত্ত্বিক ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করতে পারলেই সুখের পথটি সুগম হওয়ার সম্ভাবনা। বলা দরকার, গণতান্ত্রিক প্রভাবের দরুনই এসব সমস্যার আবির্ভাব হয়েছে। আজকাল প্রভু-ভৃত্যের মধ্যে যে একটা রেষা-রেষির ভাব দেখতে পাওয়া যায় পূর্বে তা ছিল না। ভৃত্যরা প্রভুর সুখের দিকে তাকিয়ে কাজ করত, প্রভুরাও ভৃত্যদের খুশী করার চেষ্টা করত। ভৃত্যরা যে প্রভুদের মনে মনে ঘৃণা করত না, তা নয়। কিন্তু সে ঘৃণা খুব প্রবল ছিল বলে মনে হয় না; অন্ততঃ গণতন্ত্র যতটা প্রবল মনে করে ততটা যে নয় তা এক রকম জোর দিয়েই বলা যায়। লোকের মনে গোপনে লুকিয়ে থাকার দরুন প্রভুরা সে-ঘৃণা টের পেত না। তাই তাদের সুখ এক রকম অবিকৃতই থাকত। গণতন্ত্রের নীতি গৃহীত হইবার পর থেকেই এই অবস্থার পরিবর্তন দেখা দেয়। এখন ভৃত্যরা আর প্রভুর কথায় সায় দিতে চায় না, প্রভুরাও ভৃত্যের উপরে হুকুম চালাতে ভয় পায়। দ্বন্দ্বের আবির্ভাবের দরুন উভয়েরই সুখের ঘরে আগুন লেগেছে। কখন যে তা থামে বলা কঠিন।

একথা বলার দরুন অনেকে আমাকে গণতন্ত্রবিরোধী মনে করবেন। কিন্তু তা সত্য নয়। যুগসন্ধির কালে এমনটি ঘটবেই কিন্তু তাই বলে তাকে চক্ষু বুজে অস্বীকার করা ঠিক হবে না। একটা অবস্থা মেনে নিলেই তাকে দূর করা সম্ভব হয়। নইলে তা প্রশ্রয়ই পায়, থামে না। আগুনকে স্বীকার করলেই আগুন নেবানো যায়, নইলে তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে প্রলয়কাণ্ড ঘটায়।

গণতন্ত্রের মধ্যে যে বিদ্বেষের বিষ রয়েছে, সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা চাই; নইলে তা অনিষ্টই ঘটাবে, কল্যাণ নয়। বিদ্বেষ দিয়ে বড় কিছু সৃষ্টি করা যায় না, একথা সকলের বিশেষ করে মহিলা ও রাজনীতিজ্ঞদের মনে রাখা দরকার। কেননা, বিদ্বেষ নিয়েই তাদের কারবার!

সন্তান আর মাতাপিতার সম্বন্ধে যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে তার মূলেও গণতন্ত্র। মা-বাবারা আর পূর্বের মতো ছেলেমেয়ে-দের উপর অধিকার খাটাতে পারে না। বশ্যতার দিন গত হয়েছে। এখন ছেলেমেয়েরা নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে চলতে চায়—নির্বিচারে বাপ-মার কথা মানতে চায় না। স্বাধীন বুদ্ধির স্বাদ পেতে চায় বলে পিতামাতার সুপরামর্শেও তারা সায় দিতে নারাজ। শুধু গণতন্ত্র নয়, জ্ঞানবিজ্ঞানও এই বিরোধে যোগান দিচ্ছে। মনঃ-সমীক্ষা মা-বাবার মনে নানা ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে। শিশুদের চুমু খেলে ইডিপাস কমপ্লেক্স, আর না খেলে বিদ্বেষ জন্মাবার সম্ভাবনা; 'এটা করো', 'ওটা কোরো না', বললে পাপবোধ জন্মাতে পারে, আর না বললে শিশুর বিপথে যাওয়ার ভয়। এই উভয় সংকটের দরুন, পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব থেকে পূর্বে যে একটা কর্তৃত্বের সুখ পাওয়া যেত, তা আর এখন পাওয়া যায় না। এদিকে অনূঢ়া নারীর সুখের সম্ভাবনা বেড়েছে অনেক। তাই আধুনিক মায়েদের ত্যাগ স্বীকার করতে হয় অনেক বেশী। অনূঢ়া-জীবনের মুক্তির স্বাদ, আর সন্তান-সন্ততির উপর কর্তৃত্বের আনন্দ, কোনটাই পায় না বলে তাদের দুঃখের অন্ত থাকে না। অবিবেকী সংকীর্ণ মায়েরা এই জন্য সন্তানের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ চেয়ে বসে, কিন্তু বিবেকসম্পন্না মায়েরা তা করে না। সন্তানের কাছে কিছু কামনা করতে তারা লজ্জাবোধ করে। তাদের যা কর্তব্য ছিল, তাই তো তারা পালন করেছে, সেজন্য কোন ক্ষতিপূরণ দাবী করা, সে তো অন্যায়, এই তাদের মনোভাব হয়ে দাঁড়ায়। সন্তানের

উপর এই দু'মনোভাবের প্রভাব হয় দু'রকমের। একদিকে (বিবেক-সম্পন্না মায়েদের বেলা) সন্তানের স্নেহের ক্ষুধা থাকে ঘুমিয়ে, আরেক দিকে (অবিবেকী মায়েদের বেলা) তাকে উত্তেজিত করা হয় অনেক বেশী। উভয়ই মন্দ। কেননা উভয়ই বিকৃত। যে সহজ সুখের তাগিদে পরিবারের সৃষ্টি, এ-দুয়ের কোনটাই তা পরিবেশন করে না। এসব দেখে-শুনে বিয়ের প্রতি যে অনেকেই বিতৃষ্ণ হয়ে পড়বে তাতে আর আশ্চর্য কি?

বিয়ে-থা করে পরিবার প্রতিষ্ঠা করতে লোকেরা ভয় পায় বলে জন্মের হার দিন দিন কমে যাচ্ছে। শুধু পাশ্চাত্য দেশসমূহে নয়, পাশ্চাত্য সভ্যতার অধীন দেশসমূহেও এই লক্ষণটি সুপরিস্ফুট। সন্তানসম্ভাবনায় এখন আর বুদ্ধিমান লোকেরা খুশী হয় না। ওরে বাবা, সন্তান? সে তো অধীনতা আর অর্থকৃচ্ছ্রতার পয়গাম; তাকে সেলাম—এমনি একটা ভাব সভ্য মানুষদের পেয়ে বসেছে। কিন্তু এ-মনোভাব জীবনধর্মী নয়, মৃত্যুধর্মী। এর প্রভাবে সভ্যতা ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা। তাই পারিবারিক জীবনের পক্ষে কী করে মানুষের মন ফিরিয়ে আনা যায়, সেটা ভেবে দেখা দরকার।

নীতিজ্ঞরা এই মনোভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করে উপদেশ দিয়ে, আর ভাবপ্রবণতাকে উস্‌কে দিয়ে। তারা বলে: আল্লার বান্দা আল্লা রক্ষা করবেন, সে সম্বন্ধে মানুষের ভাবা ভুল। মাতৃত্বের প্রশংসায় তারা পঞ্চমুখ। রোগশোক-দুঃখবেদনা সত্ত্বেও যে বৃহৎ পরিবার সুখময়, একথা তারা তারস্বরে ঘোষণা করে। নীতি-বিদদের সাথে কণ্ঠ মেলায় রাষ্ট্রের কর্তারা। বেশী মানুষের জন্ম না হলে বারুদের ক্ষুধা মেটাবে কে? কথাটা অবশ্যি তারা বলে না, বলে দেশের স্বার্থের কথা। দেশের স্বার্থের নামে বিদেশ-বিদ্বেষ জাগিয়ে দিয়েই তারা উদ্দেশ্য হাসিল করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে বিশেষ লাভ হয় না। সন্তানের ধ্বংস দেখতে চায় না বলে কেউই রাজপুরুষদের কথায় কান দেয় না। বুদ্ধির স্বাদ

পাওয়ার দরুন সকলেই তাদের কথার উদ্দেশ্য বুঝতে পারে। তাই রাষ্ট্রনায়করা লোকদের একদম বোকা বানিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু তাদের সে উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হয়। প্রাচ্যে এই ফন্দিবাজী চললেও, প্রতীচ্যে তা অচল। এখন আর মানুষ রাজপুরুষের কথা মত উঠতে বসতে চায় না।

লোকেরা সন্তান লাভ করে দু'টি কারণে: সন্তানকে সুখের হেতু মনে করার দরুন, নয় জন্মনিরোধের কায়দাটি জানা থাকে না বলে। স্বদেশ-প্রেমের তাগিদে কেউ সন্তান কামনা করে না। দ্বিতীয় কারণটি এখনো কার্যকর হলেও দিন দিন তার প্রভাব কমছে এবং এমন দিন হয়তো অচিরেই দেখা দেবে যখন জন্ম-নিয়ন্ত্রণের কায়দাটা সকলের জানা হয়ে যাবে। তাই সভ্য মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে ভিন্ন পথ অনুসরণ করা দরকার; রাষ্ট্র ও ধর্মের দোহাই দিয়ে লাভ নেই। সুখ সকলেই চায়। মাতৃত্ব ও পিতৃত্বকে সুখময় করতে পারলেই দুনিয়া ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে। তা কী করে করা যায় সেটাই ভেবে দেখতে হবে।

বর্তমান পরিস্থিতির কথা বাদ দিয়ে দেখতে গেলে সন্তান-সন্ততি থেকে এমন একটা সুখ পাওয়া যায় যার তুলনা পাওয়া ভার। পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের বেলা কথাটা অধিকতর সত্য। স্নেহের প্রসাদে মেয়েরা যে আনন্দ পেয়ে থাকে তা সত্যই অতুলনীয়। পুত্রকন্যার মুখ দেখলে জননীরা খাওয়া-দাওয়া ভুলে যায়।

> ধনকে নিয়ে বনকে যাব, সেখানে খাব কি?
> নিরলে বসিয়া চাঁদের মুখ নিরখি।

ছড়ার এই উক্তির মধ্যে যথেষ্ট সত্য রয়েছে। পুরুষরা মেয়েদের চেয়ে কম আনন্দ পেলেও, আজকালকার লোকেরা যতটা কম ভাবে ততটা নয়। প্রাচীন সাহিত্যে এই স্নেহের দৃষ্টান্ত ভূরি

ভূরি। হেকুবা তার প্রেমিক প্রিয়মের কথা যতটা ভাবে, তার চেয়ে অনেক বেশী ভাবে তার সন্তানদের কথা। ম্যাকডাফের বেলায়ও সেই এক কথা। পত্নীর সম্বন্ধে সে যতটা চিন্তা করে তার চেয়ে অনেক বেশী করে তার পুত্রদের সম্বন্ধে। ওলড্ টেস্টামেন্টের নর-নারী সকলেই বংশধারাকে অক্ষুন্ন রাখতে উৎসুক। এশিয়ার দেশসমূহে আজো এই মনোভাবই বলবৎ। বাংলা-সাহিত্যের পানে তাকালে দেখতে পাওয়া যায়, সেখানে বাৎসল্যরস নামে একটা রসই দাঁড়িয়ে গেছে। শিশুতো শিশু নয়, অনন্তের দূত। তাই সে এতো সুন্দর, এতো মধুর, এতো বিচিত্র। বালকের মধ্যে বালগোপালকে অনুভব করা বৈষ্ণবদের স্বভাব। যিশুর সাথে শিশুর মিল বাংলা-সাহিত্যে হয়তো ধ্বনিগত, কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্যে ভাবগত। ব্যক্তিগতভাবে আমার এই অভিজ্ঞতা যে, সন্তানসন্ততি থেকে আমি যে আনন্দ পেয়েছি, অন্য কোন আনন্দ তার সমকক্ষ নয়। আমার মনে হয়, অবস্থা বৈগুণ্যে যে-সব নর-নারী সন্তানের স্বাদ থেকে বঞ্চিত, তাদের ভেতরে একটা বড় রকমের অভাব থেকে যায়। ফলে তাদের জীবনে একটা বিকৃতি দেখা দেয়—বিরক্তি আর উদাসীনতার ছাপ তাদের চেহারায় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যৌবনে হয়তো নিজের জীবন নিয়েই এক রকম তৃপ্ত থাকা সম্ভব, কিন্তু যৌবন গত হওয়ার পর নিজকে একটা নিরবচ্ছিন্ন জীবনধারার অংশ ভাবতে না পারা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। সন্তানসন্ততি মানে নিজেরই ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব। তাই সন্তানবিহীন হওয়া আর ভবিষ্যৎবিহীন হওয়া এক কথা। সন্তানবিহীন লোকেরা যে ভবিষ্যতের ব্যাপারে কোন প্রকার অনুরাগ প্রদর্শন করে না, তার হেতুও এখানে। তত্ত্ব হিসাবে এটি অতি সভ্য মস্তিষ্কবান দৃষ্টিভঙ্গি হলেও, অচেতন আবেগ হিসাবে আদিম ও সহজ মনোবৃত্তি। [অর্থাৎ মানুষের ভেতরে যা নির্জ্ঞান আবেগ হিসাবে রয়েছে, সচেতন বুদ্ধির সমর্থন পেয়ে তাই আধুনিক বৈজ্ঞানিক মত হতে

চলেছে। খাঁটি বিজ্ঞান নতুন কিছু নির্মাণ করে না, যা বরাবর ছিল তাকেই আবিষ্কার করে। এখানেও তাই হয়েছে।]

কোন-কোন লোক হয়তো তাদের সৃষ্টির মারফতে ভবিষ্যতে বেঁচে থাকার ভরসা পায়। কিন্তু তাদের সংখ্যা নগণ্য। কালজয়ী সাহিত্য বা শিল্প সৃষ্টি করতে পারে আর ক'টি লোক। বেশীর ভাগ লোকই তো বেঁচে থাকতে চায় সন্তানের মারফতে। সন্তানের ক্ষুধা শুকিয়ে-যাওয়া মানুষ ভবিষ্যৎ চিন্তার প্রেরণা পায় না। তার জীবন যেন নদীর সঙ্গে সম্পর্কবিহীন একটা নালা। নিজে নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অনন্ত জীবনধারার সঙ্গে সম্বন্ধবিহীন বলে সে কৃপণের মতো প্রাণদৈন্যে ভোগে। সন্তানবান কি সন্তানবতীরা কিন্তু নিজেদের এমন বিচ্ছিন্ন মনে করে না—স্নেহের সুতায় তারা ভবিষ্যতের হাতে রাখী পরায়। চিন্তার তাগিদে অথবা নীতির প্রেরণায় নয়; অত্যন্ত সহজ প্রেরণার দরুনই এমনি ঘটে। ইব্রাহী-মের মতো তারাও ভাবে তাদের সন্তানসন্ততি একদিন-না-একদিন তাদের আকাঙ্খিত জগতে গিয়ে পৌঁছবেই। এই সজীব ও প্রাণ-প্রদায়ী অনুভূতির ফলেই তারা আবেগের সরসতা বজায় রাখে এবং নিস্ফলতা-বোধের মারাত্মক প্রভাব থেকে মুক্তি পায়।

অপরের ছেলেমেয়েদের প্রতিও মানুষ একটা স্নেহ অনুভব করে; কিন্তু সন্তানবৎসলতার মতো তা ততটা তীব্র নয়। নিজের সন্তানের স্নেহের স্বাদ সম্পূর্ণ আলাদা। কান্নাহাসির মিশ্রণে তা অনির্বচনীয় হয়ে ওঠে। কৃষ্ণের গোষ্ঠ গমনকালে জননী যশোদা যে উপদেশটুকু দিয়েছিলেন, তাতেই স্নেহভয়াকুল জননী-হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। স্নেহের এমন চমৎকার অভিব্যক্তি আর কোথাও নেই। মাতৃহৃদয়টুকু যেন এখানে খুলে ধরা হয়েছে:

আমার শপতি লাগে, না ধাইহ ধেনুর আগে,
পরাণের পরাণ নীলমণি।

নিকটে রাখিহ ধেনু,　　　পূরিহ কোহন বেণু
ঘরে বসি' আমি যেন শুনি ॥
বলাই ধাইবে আগে,　　　আর শিশু বাম ভাগে,
শ্রীদাম সুদাম সব-পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইয়,　　　সঙ্গ ছাড়া না হইয়,
মাঠে বড় রিপু ভয় আছে ॥
ক্ষুধা হইলে লইয়া খাইয় ;　　　পথ পানে চাহি যাইয়,—
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারু বোলে বড় ধেনু　　　ফিরাইতে না যাইয় কানু,
হাত তুলি দেহ মোর মাথে ॥
থাকিবে তরুর ছায়,　　　মিনতি করিছে মায়,
রবি যেন না লাগায়ে গায়।
যাদবেন্দ্র সঙ্গে লইয়　　　বাধা পানই (১) হাতে থুইয়,
বুঝিয়া যোগাবে রাঙ্গা পায় ॥

এমন মা-বাবাও হয়তো আছে যারা নিজেদের সন্তানকে তেমন ভালোবাসে না এবং এমন মেয়েমানুষও চোখে পড়ে যে পরের ছেলেকে নিজের ছেলের মতই ভালোবাসে। কিন্তু সেটা আইন নয়, আইনের ব্যতিক্রম। সাধারণ আইন হচ্ছে: নরনারী নিজেদের সন্তানের প্রতি এমন একটা অনির্বচনীয় আকর্ষণ অনুভব করে যা অন্যত্র অনুভূত হয় না। তাই শিশুটির মুখ চেয়ে জনক-জননী সব ভুলে যায় এবং তার সুখের জন্য সব রকম ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকে। এ মনোভাবটি মানুষ পেয়েছে তার প্রাণীপূর্বপুরুষ থেকে। এক্ষেত্রে ফ্রয়েড যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন তা খুব বিজ্ঞানসম্মত বলে মনে হয় না। কেননা সকলেই লক্ষ্য করে

(১) পানই—পায়ের খড়ম ও উপানৎ অর্থাৎ জুতা।

থাকবেন, পশু-জননীটির আকর্ষণ তার শাবকের প্রতি যতটা সঙ্গীটির প্রতি ততটা নয়। যৌবনসম্বন্ধের চেয়ে স্নেহের সম্বন্ধ তার কাছে বড়। মানুষের মধ্যেও সেই একই প্রবৃত্তি আরো সুন্দরভাবে, সার্থকভাবে প্রকট। সন্তানবাৎসল্য উড়িয়ে দিলে পরিবারের পক্ষে বলার আর কিছুই থাকে না। পরিবার তখন একটা অপ্রয়োজনীয় অর্থহীন প্রতিষ্ঠান হয়ে পড়ে। কিন্তু সন্তানবাৎসল্য উড়িয়ে দেওযার মতো চিজ নয়। এ এমন একটা অনুভূতি যা না হলে জনকজননী ও সন্তান উভয় পক্ষেরই বিস্তর ক্ষতি। সন্তানবাৎসল্যের মতো এমন নিঃস্বার্থ সম্বন্ধ আর নেই। বন্ধু বন্ধুকে আদর করে তার গুণের জন্য, প্রেমিক প্রেমিকাকে ভালবাসে তার মাধুর্যের খাতিরে। গুণ অথবা মাধুর্যের অভাব ঘটলে বন্ধু অথবা প্রেমিকের সরে পড়া অসম্ভব নয়।

জনকজননীর বেলায় কিন্তু এমন কথা বলা যায় না বরং সন্তানের দুর্ভাগ্যের দিনেই তারা অধিক স্নেহের পরিচয় দেয়। স্নেহের তাগিদে নিরয়গামী হতেও তারা দ্বিধা করে না:

পাপী পুত্র ত্যজ্য বিধাতার,
তাই তারে ত্যজিতে না পারি, আমি তার
একমাত্র। উন্মত্ত তরঙ্গ মাঝখানে
যে-পুত্র সঁপেছে অঙ্গ, তারে কোন্ প্রাণে
ছাড়ি' যাব? উদ্ধারের আশা ত্যাগ করি
তবু তারে প্রাণপণে বক্ষে চাপি ধরি—
তারি সাথে এক পাপে ঝাঁপ দিয়া পড়ি,
এক বিনাশের তলে তলাইয়া মরি
অকাতরে, অংশ লই তার দুর্গতির,
অর্ধ ফল ভোগ করি তার দুর্মতির—
সেই তো সান্ত্বনা মোর।

এ কেবল ধৃতরাষ্ট্রের উক্তি নয়, সন্তানবৎসল সমগ্র পিতৃসম্প্রদায়ের। মাতাপিতা সন্তান বলেই আমাদের ভালোবাসে, অন্য কারণে নয়।

প্রশংসার লোভ বা অন্য কোন প্রকারের স্বার্থ তাদের থাকে না। তাই মাতাপিতার অধীনে আমরা যেরূপ নিরাপদ বোধ করি, এমন আর কোথাও নয়। জয়ের কালে আমরা তাদের গ্রাহ্য না করতে পারি, কিন্তু ক্ষয়ের কালে তারাই আমাদের একমাত্র আশ্রয় ও সান্ত্বনা।

কোন-কোন মানব সম্বন্ধে সুখ একতরফা। দারোগা সাহেব কয়েদীদের আটকে রেখে, কারখানার মালিক কর্মচারী ও শ্রমিকদের ধমকে দিয়ে, আর শাসক সম্প্রদায় শাসিতদের দমিয়ে রেখে এক প্রকার সুখ পেয়ে থাকে। কিন্তু সে সুখ একতরফা সুখ, আর এক তরফের ভাগ্যে জোটে কেবল দুঃখ। এই একতরফা সুখ যে মন্দ, তা আজকাল স্বীকৃত হয়েছে। পরপীড়ন তাই এত নিন্দনীর হতে চলেছে। যে-সম্বন্ধে দু'পক্ষের সুখ নেই, তা আর আমাদের কাছে আদর্শ সম্বন্ধ নয়। [তাই 'বাঁচো ও বাঁচতে দাও' এই নীতি আজ বড় হয়ে উঠেছে। আমাদের সুখ যে অপরের ঠোঁটে হাসি হয়ে ঝরছে, তা আমরা টের পেয়েছি। মানুষের মলিন ঠোঁটে হাসি ফোটাবার ভার নিয়েছি আমরা নিজের গরজেই। অধিকার-বৃত্তি এই হাসি ফোটানোর বিরুদ্ধে, তাই আমরা তাকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করছি।]

কিন্তু জনকজননী আর সন্তানসন্ততির সম্বন্ধে এই নীতিটি তেমন মানা হচ্ছে বলে মনে হয় না। এখানে এখনো অধিকারবৃত্তির জয়-জয়কার। ছেলেমেয়েদের উপর অধিকার খাটানো যেন মা-বাবার 'ডিভাইন রাইট', তাই তা থেকে বঞ্চিত হলে তাদের দুঃখের অন্ত থাকে না। পরিবারের দিকে তাকালেই টের পাওয়া যায়, মাতাপিতার কর্তৃত্ব কমে যাওয়ায় একদিকে ছেলেমেয়েদের সুখ বাড়ছে, আরেক দিকে মা-বাবার সুখ কমছে। কিন্তু এমনটি হওয়া ঠিক নয়। কর্তৃত্বের সুখের চেয়ে সৃষ্টির সুখ বড়, এটা উপলব্ধি করতে পারলেই মা-বাবারা এই দুঃখ থেকে মুক্তি পেত। এখানে

একটি কথা মনে রাখা দরকার: কড়াশাসন কি অধিকার বৃত্তি নয়, কোমলতা, মধুরতা আর অপরের প্রতি শ্রদ্ধাই মানুষকে সত্যিকার অর্থে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। যে যত বেশী কোমল, মধুর ও শ্রদ্ধাবান সে তত বেশী জীবন্ত। প্রয়োজনের তাগিদে মাঝে মাঝে আমাদের কঠিন হতে হয় বটে, কিন্তু তা যত কম হওয়া যায় ততই ভালো। 'অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে।' এই উক্তিটি যাদের ঠোঁটের বুলি হয়ে গেছে, বুঝতে হবে, তারা কেবলই মানুষকে শাস্তি দেওয়ার সুযোগটি খুঁজে বেড়াচ্ছে। তারা সহজ মানুষ নয়, বিকৃত মানুষ। তাই তাদের সম্বন্ধে সাবধান হওয়া ভালো। নীতির কথা বলে তারা হৈচৈ করে বটে, কিন্তু তা আসলে নীতি নয়, নীতির ছদ্মবেশীধারী নিষ্ঠুরতা—Cruelty masquerading morality.

সন্তানকে ভালোবাসা হয় দুটি কারণে। প্রথমতঃ সন্তানের মারফতেই মানুষ ভবিষ্যতে বেঁচে থাকার সুযোগ পায়—তার মারফতেই তার অপূর্ণ সাধ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়তঃ সন্তানের দরুনই মানুষ নিজের ভেতরের কোমলতা আর শক্তির স্বাদ পেয়ে থাকে। অসহায় সন্তানটিকে ভালোবাসতে হলে কোমলতার, আর রক্ষা করতে হলে শক্তির প্রয়োজন। নিঃসন্তান লোকেরা সাধারণত কঠিন ও নিষ্প্রাণ হয়ে থাকে। শক্তিপ্রাচুর্যও তারা উপলব্ধি করে কম। [পৃথিবীর বিচিত্র সৌন্দর্য—সকাল-সন্ধ্যায় রঙের খেলা—তাদের অন্তরে কোন আনন্দ সৃষ্টি করতে পারে না। তারা একা, বড় একা। জগতের আনন্দযজ্ঞে তাদের নিমন্ত্রণ নেই। হাইফেনের মতো শিশু তাদের জগতের সঙ্গে যুক্ত করেনি বলেই তাদের এ দুরবস্থা। বাৎসল্যের হাতে যে যাদুদণ্ড রয়েছে, তারি স্পর্শে মাধুর্যলোকের দ্বারটি খুলে যায়:

রঙিন খেলনা দিলে ও রাঙা হাতে
তখন বুঝিরে বাছা, কেমন যে প্রাতে

এত রঙ খেলে মেঘে জলে রঙ উঠে জেগে,

কেন এত রঙ লেগে ফুলের পাতে--

রাঙা খেলা দেখি যবে ও রাঙা হাতে॥]

কিন্তু অনেক সময়ে সন্তানের শৈশবেই মাতাপিতার জীবনে শক্তি ও ভালোবাসার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ভালোবাসা সন্তানটিকে অধিকারবৃত্তির আওতা থেকে মুক্তি দিতে চায়, শক্তি চায় তাকে নিজের দাবে রেখে দিতে। যে মা-বাবারা এই দ্বন্দ্ব অনুভব করে না তারা এক রকম শান্তিতেই থাকে—নিশ্চিন্তে সন্তানের উপর কঠোর শাসন চালিয়ে যায়। কিন্তু যারা অনুভব করে তাদের জীবনে একটা অশান্তির কালো হাওয়া নেমে আসে। সন্তান তাদের কাছে আর সুখের হেতু বলে মনে হয় না। আহা ছেলেটিকে এতো করে মানুষ করলুম, তবু সে আমাদের কথা মতো চলতে চায় না; কী বেইমান! আশা করেছিলাম সে একটা জাঁদরেল সৈনিক হবে, এখন দেখতে পাচ্ছি বেটা হতে চলেছে একটা শান্তিকামী ইডিয়ট; কী লাভ হল তাকে মানুষ করে? —এমনি একটা ভাবনা তাদের পেয়ে বসে বলে তারা সুখ পায় না।

শুধু যে বয়স্ক সন্তানের উপরই শক্তি খাটাবার চেষ্টা হয় তা নয়, স্নেহের নামে ছোটদের উপরও এই অত্যাচার চলে। যে ছেলেটি খেতে শিখেছে, তাকেও যখন আপনি খাইয়ে দেন, তখন বুঝতে হবে ছেলেটিকে নাবালক করে রাখাই আপনার উদ্দেশ্য। স্নেহের আবরণে আপনি সে উদ্দেশ্যটুকু ঢেকে রাখছেন মাত্র। বিপদ সম্বন্ধে ছেলেটিকে অত্যন্ত সাবধান করে দেওয়ার মধ্যেও প্রভুত্বের আকাঙ্খা, সৃষ্টিধর্মী স্নেহের নয়।

কোথায় যে স্নেহের শেষ, আর অধিকারের শুরু তা বলা কঠিন। তাই আধুনিক জ্ঞানসম্পন্ন মা-বাবারা সন্তানপালনের ব্যাপারে বেশ বিব্রত বোধ করে। পাছে সন্তানের ক্ষতি হয় এই ভয়ে তারা সবসময় সংকুচিত। কিন্তু তাতে সন্তানের ক্ষতি ছাড়া লাভ হয় না।

ব্যবহারের স্বতঃস্ফূর্ততা না থাকলে সন্তানরা ভরসা ও আনন্দ পায় না। এ ক্ষেত্রে যে জিনিসটা প্রয়োজনীয় তা হচ্ছে হৃদয়ের পবিত্রতা, সতর্কতা নয়। হৃদয়ে পবিত্র হয়ে তারা যদি ভুলও করে তো তাতে কিছু আসে যায় না। যে-লোক কর্তৃত্বের চেয়ে সন্তানের শুভকেই বড় করে দেখে তাকে সব সময় মনঃসমীক্ষার বই পড়ে সন্তানের প্রতি কর্তব্য নির্ণয় করতে হয় না, হৃদয়ের টানই তাকে অনেকটা ঠিক পথে চালনা করে। তখন অন্তরে একটা মাধুর্যের ধারা বয়ে চলে—জনকজননী বা সন্তান কারো ব্যবহারেই আর তিক্ততার ভাবটি ফুটে ওঠে না। সেজন্য প্রথম থেকেই দরকার সন্তানের প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব রাখা। কিন্তু এই শ্রদ্ধার ভাবটুকু সচেতন বুদ্ধির ব্যাপার না হয়ে গভীর মরমী ব্যাপার হওয়া চাই। নইলে তা অন্তরের সামগ্রী হতে পারে না। বুদ্ধিলব্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মানুস সহজেই যেতে পারে, কিন্তু গভীর আন্তরিক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যাওয়া সম্ভব নয়। শুধু স্নেহ মমতার ক্ষেত্রে নয়, বন্ধুতা ও প্রেমের ক্ষেত্রেও কথাটি মনে রাখবার মতো। ['যারে বলি ভালোবাসা তারে বলি পূজা' আন্তরিক শ্রদ্ধা তথা পূজার ভাব না থাকলে বন্ধুতা ও প্রেম কোনটাই টেকসই হয় না।

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম,
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা প্রেম তার নাম।

স্নেহের ব্যাপারে, প্রেমের ব্যাপারে ও বন্ধুতার ব্যাপারে নিজেকে বড় করে না দেখে অপরকে বড় করে দেখার চেষ্টা করবেন। নইলে তা থেকে যে একটা উঁচু স্তরের আনন্দ পাওয়া যায়, তা আপনার ভাগ্যে জুটবে না] পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের সুখ তারাই সবচেয়ে বেশী পায়, যারা সন্তানের প্রতি শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তাকায়। শ্রদ্ধা যেখানে কর্তৃত্ব সেখানে মাথা তুলতে পারে না। হামেশাই তো দেখতে পাওয়া যায়, আমরা যাকে শ্রদ্ধা করি তার উপর কর্তৃত্ব করিনে, আর যার উপর কর্তৃত্ব করি তাকে শ্রদ্ধা করিনে।'

তাই ছেলেরা স্বাধীনতার পরিচয় দিলে শ্রদ্ধাবিহীন কর্তৃত্বপ্রিয় জনকজননীর যেখানে দুঃখের অন্ত থাকে না, সেখানে শ্রদ্ধাবান কর্তৃত্ববিমুখ মা বাবারা অপূর্ব সুখ পেয়ে থাকে। এই সুখ মরমী সুখ। এর স্পর্শে আত্মার লোহা সোনায় পরিণত হয়—দৈনন্দিন সাধারণ ব্যাপারও দিব্যশ্রী লাভ করে।

মাতৃত্ব শিশুর জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় হলেও, মাকেই যে শিশুর সমস্ত কাজ করতে হবে, এমন কোন কথা নেই। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার পূর্ব পর্যন্ত হয়তো এই নীতি তেমন নিন্দনীয় ছিল না, কিন্তু বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার পর থেকে তা একরকম অচল হয়ে পড়ছে। শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ আর বিকাশের জন্য যে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন মা তা না জানতেও পারে। তাই শিশুর সব কাজে মার হাত দেওয়া ঠিক নয়। অন্যান্য ব্যাপারে না হলেও, শিক্ষার ব্যাপারে কথাটা সহজেই মানা হয়। ভালোবাসে বলেই যে মা শিশুকে জ্ঞান দিতে পারবে, একথা কেউ স্বীকার করবে না। জ্ঞান জ্ঞান-বানের কাছ থেকেই নিতে হয়, মার কাছ থেকে নয়। শৈশবে মার দ্বারা শিশুর সমস্ত কাজ চললেও বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যের সহায়তার দরকার হয়ে পড়ে। তখন মার উচিত সন্তানকে অপরের হাতে তুলে দেওয়া। নইলে সন্তানের প্রতি অকর্তব্য করা হবে।

কোন জননী যদি বিশেষ বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে থাকে, তো তাকে সে বিদ্যা প্রয়োগের সুযোগ দেওয়া দরকার। ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের তরফ থেকে তা প্রয়োজনীয়। মাতৃত্ব যেন সে-পথের অন্তরায় না হয়। মাতৃত্ব জীবনের অংশ মাত্র, সবটা নয়, একথা মনে রাখা দরকার। তাই মাকে অন্যান্য ব্যাপারে স্বাদ গ্রহণের সুযোগও দিতে হবে। শিশুপালনে পারদর্শী মা'টি যদি নিজের ছেলেটিকেই পালন করে তো তার বিদ্যার সার্থক প্রয়োগ হয় না। অপরের ছেলের ভারও তাকে নিতে হবে। বুদ্ধির যত

নৈর্ব্যক্তিক প্রয়োগ হয় ততই তার উন্নতির সম্ভাবনা। যেখানে এ দ্বারটি খোলা নেই, সেখানে জননী স্নেহের কারাগারে বন্দী হয়ে অন্ধ ও সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। মামুলি নীতি তাকে বাহবা দেয়, অপূর্ব স্নেহময়ী' বলে, কিন্তু আসলে সে স্নেহ স্নেহ নয়, মোহ। তা সন্তানকে মুক্তি দেয় না, পাকে জড়িয়ে রাখে। শিশু পালনে অভিজ্ঞ মায়েরা যেমন অপরের ছেলের দায়িত্ব নেবে, তেমনি নিজের সন্তানকেও অপর অভিজ্ঞ ব্যক্তির হাতে তুলে দেবে। এমনি করে চললেই নিজের স্নেহের ক্ষুধা আর সন্তানের সত্যকার কল্যাণকামনার মধ্যে যে সূক্ষ্ম ব্যবধান রয়েছে, তা দূর হবে এবং জননী তার স্নেহের গ্রাসে সন্তানটির সর্বনাশ করতে চাইবে না। নইলে স্নেহের আতিশয্যে সন্তানটি আদরের দুলালই হয়ে থাকবে, মানুষ আর হতে পারবে না। তাই অত্যুগ্র স্নেহকে বাহবা না দিয়ে দুয়ো দেওয়াই ঠিক। অনভিজ্ঞ মায়েরা যেন সন্তানকে শিক্ষিতা ধাত্রীর হাতে তুলে দিতে দ্বিধা না করে। মা হলেই সন্তান-পালনে পটু হবে এমন কোন কথা নেই। মাতৃত্বের যে অংশটুকু স্নেহ তা স্বর্গ থেকে আসতে পারে, কিন্তু যে অংশ-টুকু জ্ঞান তা স্বর্গ থেকে আসে না, শিখে নিতে হয়। বাস্তব-বোধহীন ভাবপ্রবণ মায়েদের হাতে যে কত ছেলেমেয়ের সর্বনাশ হয়েছে, তার লেখাজোকা নেই।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠবে: মা যদি সন্তানের যত্ন না নেয়, তো সন্তান মাকে ভালোবাসবে কেন?—এ প্রশ্নের উত্তর সোজা। আমরা দেখতে পাই, পিতা সন্তানের যত্ন নেয় না, অথচ সন্তান পিতাকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। মাকেও সন্তান ভালোবাসবে তার স্নেহের জন্য, তার যত্নের জন্য নয়। পিতা ও সন্তানের মধ্যে যে সম্বন্ধ অচিরে জননী আর সন্তানের মধ্যেও সে-সম্বন্ধ স্থাপিত হবে। সন্তান পালনে অপটু মায়েরা সন্তানকে স্নেহ করতে পারবে, যত্ন করতে নয়। যত্নের ভার পড়বে শিক্ষিতা ধাত্রীর উপর।

এ-ভাবে চললে মা ও সন্তান উভয়েরই লাভ। মা মুক্তি পাবে দাসত্বের নিগড় থেকে, সন্তান মুক্তি পাবে অবৈজ্ঞানিক পরিচর্যার হাত থেকে। অধুনা শিশু-মনস্তত্ত্বের যে গবেষণা হয়েছে, শিশুর জীবনবিকাশের জন্য তার প্রয়োগ একান্ত প্রয়োজনীয়। সুবিজ্ঞ ধাত্রীর হাতে পালিত হলেই মনস্তত্ত্বের এই জ্ঞানটুকু শিশুর জীবনে সোনা ফলাতে পারবে, নইলে তা পুস্তকেই থেকে যাবে, জীবনের কাজে আর লাগবে না।

সন্তানপ্রীতি সুখের উৎস একথা ঠিক, কিন্তু অধিকারবৃত্তি সুখের অন্তরায়। শুধু সন্তানের ক্ষেত্রে নয়, সব ক্ষেত্রেই অধিকার-বৃত্তি মন্দ। এ কথাটি যে জেনেছে সুখের হদিসটি তার জানা হয়ে গেছে। তার সম্বন্ধে অমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি।*

* কোন ইংরেজ লেখকের অনুসরণে।—মো. হো. চৌ

কাজ

কাজ সুখের না দুঃখের—এ প্রশ্নের উত্তর চট করে দেওয়া সম্ভব নয়। কোন কোন কাজ সব সময়ই কষ্টকর, কম হোক বেশী হোক তাতে কষ্ট হবেই, আর মাত্রাধিক্য হলে সব কাজই কষ্টকর। আমার মনে হয় মাত্রাধিক্য না হলে সব কাজই আশংকার চেয়ে কম যন্ত্রণাদায়ক। 'কি করি' এই চিন্তার চেয়ে দুঃখকর আর কিছুই নেই। কাজ সেই চিন্তা থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়। যাদের ধরাবাঁধা কাজ নেই, করণীয় ঠিক করে নিতে তাদের অনেক সময় নষ্ট হয় এবং একটা ঠিক করলে আর একটা তাদের মন টানে। 'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই যাহা পাই তাহা চাই না' অবস্থা। অপরকে সার্থকভাবে ভরে তোলা সভ্যতার শেষ কথা, বেশীর ভাগ মানুষই এখনও সভ্যতার সে স্তরে পৌঁছয়নি। তাছাড়া নির্বাচন ব্যাপারটাও কম কষ্টদায়ক নয়। তাই প্রচুর অবসর অনেকের জন্য বর না হয়ে অভিশাপ হয়েই দেখা দেয়। ক্ষমতাহীন সাধারণ মানুষের জন্য ইচ্ছার কাজের চেয়ে হুকুমের কাজই ভাল। নিশ্চিন্তভাবে কাজটি করা যায় বলে তাতে গোলাম-বাদের যন্ত্রণা থাকে না। তবে কাজটি যাতে অপ্রীতিকর না হয় সেদিকে নজর রাখা দরকার। কাজের বোঝা বইতে হয় না বলে ধনীদের অনেককে চিন্তার বোঝা বইতে হয়। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তারা ভাবে কি করা যায়? আর সেটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। বুদ্ধিমান ধনী সন্তানরা তাই গরীবের ছেলেদের মতই নিজেদের কাজে ডুবিয়ে রাখে, আর ধনী কন্যারা আজে-বাজে কাজে রত

থেকে বলে বাবা কি হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, প্রাণটা একেবারে গেল। কাজটা তেমন কঠিন কিছু না হলেও তাদের মনে করে নিতে হয়, একটা ভয়ংকর কিছু বলে। মোট কথা কাজ থেকে পলায়নের যেমন দরকার আছে তেমনি অবসর থেকে পলায়নেরও প্রয়োজন রয়েছে; নইলে জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। দীর্ঘ অবসরের দুর্বিষহ-তার কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন: এক গ্লাস জল পান করা যায়, কিন্তু একটা আস্ত সমুদ্র পান করা যায় না। কাজের ফাঁকে ফাঁকে এলেই অবসর উপাদেয় নইলে তা বিস্বাদ, বিরক্তিকর।

নিরানন্দ কাজে বিরক্তি জন্মে, আলস্যেও তাই। কিন্তু প্রথমোক্ত বিরক্তির চেয়ে দ্বিতীয়োক্ত বিরক্তি বিস্বাদ। কাজে রত থাকলে—সে কাজ নিরানন্দ হলেও সময় কাটে ভাল। আলস্যে সময় কাটতে চায় না, তা যেন বোঝার মত চেপে থাকে। কাজে রত থাকার আর একটি সুখ এই যে, অবসরটি যখন আসে তখন তা পুরাপুরি ভোগ করা যায়। অতিভোগীর কাছে যেমন তার ভোগের দাম নেই, আলস্যভোগীর কাছেও তেমনি তার আলস্য মূল্যহীন। আলস্যের পূর্ণ মর্যাদা দেয় কাজের লোকেরা।

কাজের দ্বিতীয় সুবিধা এই যে, তাতে উচ্চাকাঙ্খা চরিতার্থ করার সুযোগ পাওয়া যায়। অর্থকরী কাজ আর সখের কাজ, সব কাজই কৃতকার্যতার স্বাদ পরিবেশন করে। অনেক ক্ষেত্রে অর্থই কৃতকার্যতার পরিমাপক। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত এটাই স্বাভাবিক। শ্রেষ্ঠ কাজে অবশ্য অর্থপ্রাপ্তিই কৃতকার্যতার নিশানা হয় না, হয় আনন্দবোধ। শ্রেষ্ঠ কাজ প্রেমের কাজ, লাভ-লোকসানের খাতায় তা করা হয় না।

শুধু আরাম-আয়েশে থাকবার জন্য যে মানুষ অর্থ উপার্জন করে তা নয়। কৃতকার্যতার স্বাদের জন্য তা করা হয়। সুখ্যাতি ও অর্থপ্রাপ্তির উৎস বলে লোকেরা নিরানন্দ কাজও স্বচ্ছন্দে করে

যায়। উদ্দেশ্যের ধারাবাহিকতা না থাকলে সুখ পাওয়া যায় না। আর তা রক্ষা করার উপায় কর্ম। কর্মহীন লোকেরা নোঙ্গরহীন নৌকার মত এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করে বলে সুখ পায় না। [কবিরা উদ্দেশ্যবিহীনতার যতই জয় ঘোষণা করুক না কেন, আসলে তা কল্পনাবিলাস, সত্য কিছু নয়। তাই কবিতায় মানালেও বাস্তবে তা মানায় না। কবিতা ত অনেক সময় ইচ্ছা স্ফুরণের একটা উপায় মাত্র। তাই কবিতায় উদ্দেশ্যবিহীনতার কথা শুনলে মন খুশীতে নেচে ওঠে। কিন্তু বাস্তবে উদ্দেশ্যবিহীনতা পীড়ারই কারণ, সুখের নয়।] সুখ্যাতি ও অর্থপ্রাপ্তির উপায় বলে কর্ম সুখেরই হেতু দুঃখের নয়। কিন্তু গৃহকাজে আবদ্ধা মেয়েদের জীবনে ততটা সুখ নেই। অর্থপ্রাপ্তি কি প্রশংসা কোনটাই পাওয়া যায় না বলে করণীয় কাজ থেকে তারা তেমন আনন্দ পায় না। স্বামীরা তাদের প্রশংসা করে অন্য কারণে, গৃহকাজের জন্য নয়। ফলে অর্থপ্রাপ্তি কি প্রশংসা কোনটারই উৎস নয় বলে গৃহকাজে তারা তেমন তৃপ্তি পায় না। তাই মেয়েদের জন্য অর্থকরী কাজের প্রয়োজন। কৃতকার্যতা তথা অর্থ ও প্রশংসার স্বাদ তারা ও ভাবেই পেতে পারে।

সময় কাটাবার, উচ্চাকাঙক্ষা চরিতার্থ করার উপায় হিসাবে কাজের মূল্য অনেক। নিরানন্দ সাধারণ কাজও কর্মহীনতার চেয়ে সুখদায়ী। নিরানন্দ কাজে যে সুখ পাওয়া যায় তা বিরক্তির অভাবজাত সুখ, গভীর কোন হাঁ-মূলক সুখ নয়। তা পাওয়া যায় আনন্দদায়ী কাজে। আপনি ভালবেসে যে-কাজ করেন তাই আপনার গভীর আনন্দের উৎস। তাই আনন্দের মাত্রা অনুযায়ী কাজের শ্রেণী-বিন্যাস করা উচিত; আর এখানে তাই করা হচ্ছে।

নিপুণতা আনন্দের উৎস। একটা কাজ করতে গেলে যে বুদ্ধি প্রযুক্ত হয় তা কেবল কাজটাই সমাধা করে না, আনন্দও নিয়ে আসে। [কিন্তু কাজটা পুরোপুরি রপ্ত হয়ে গেলে তা থেকে

আর তেমন আনন্দ পাওয়া যায় না। তা তখন আটপৌরে বা মামুলি কাজের মত নিরানন্দ হয়ে যায়। যে লোকটা তিনমাইল দৌড় প্রতিযোগিতায় রপ্ত হয়েছে, কিছুদিন পর, প্রতিযোগী না থাকলেও সে নিজের রেকর্ড ভাঙ্গার তাগিদ অনুভব করবে। পূরণ অংক যে বালকের কাছে সুখের ব্যাপার, কিছুদিন পরে পূরণের অংকে সে আর তৃপ্ত থাকবে না, ভাগ অংক না করতে পারলে সে সুখ পাবে না। গরুর-শিশুর মত বুদ্ধির নতুন নতুন খাদ্য দরকার, নইলে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না।] কাজের মত বুদ্ধিপ্রধান খেলা খেলেও সুখ প্যাওয়া যায়। ওকালতির আনন্দ আর ব্রীজ খেলার আনন্দ প্রায় এক জাতের। বুদ্ধি প্রয়োগের হাত ধরে এখানে আসে আর একটি সুখ। তার নাম দেওয়া যায় প্রতিদ্বন্দ্বী পরাজয়ের সুখ। প্রতিযেগিতার প্রবৃত্তি ছাড়াও খেলা সুখকর হতে পারে। এরোপ্লেনে কারদানি দেখাবার আনন্দ এত বেশী যে তা' দেখাতে গিয়ে চালকটি মৃত্যুর কথাও ভুলে যায়। নিপুণতার উৎকর্ষের সম্ভাবনা না থাকলে কাজের আনন্দ ফুরিয়ে যায়। সৌভাগ্যবশতঃ এমন অনেক কাজ আছে নতুন নতুন অবস্থায় যেখানে নতুন নতুন নিপুণতার দরকার হয়। তাই সুখ সেখানে অফুরান, নব নব উন্মেষশালিনীর মুখ দেখা আর সুখের মুখ দেখা এক কথা। মধ্যবয়স পর্যন্ত বুদ্ধিকে অতন্দ্র রাখতে হয় এমন বহু কাজ আছে। তাই বলে মধ্যবয়সের পরেই যে সব কাজ একঘেয়ে হয়ে পড়ে তা নয়। এমন অনেক কাজ আছে মধ্যবয়সের পরেই যাতে দক্ষতা লাভ হয় বেশী। যেমন রাজনীতি। ভুয়োদর্শনের প্রয়োজন হয় বলে রাজনীতিতে পাকা হতে অনেক সময় লাগে। ষাট-সত্তর বৎসরের আগে তাতে পাকা হতে খুব কমই দেখা যায়। তাই অন্যান্যদের দিন যখন ফুরিয়ে আসে রাজনীতিকদের দিন তখন শুরু হয়। ষাট-সত্তর বৎসরের চাকুরিজীবী ত কেবল পরকালের ডাক শোনে, জীবনের আহ্বান শুনতে পায় না বলে বেলা

শেষের পদ্ম ফুলের মত ম্রিয়মান। কিন্তু সত্তর বছরের রাজনীতিকটির ঠোঁটে তাজা হাসিটি লেগে থাকে। আমি এখনও বাঁচার স্বাদ পাচ্ছি, তার হাসিটি যেন এ-কথাই বলে। এদিক দিয়ে তার জুড়ি হচ্ছে কেবল বড় বড় ব্যবসায়ের মালিকরা। তাদেরও লক্ষ্যে পৌঁছতে অনেকদিন লাগে।

কিন্তু নিপুণতার সুখের চেয়ে সৃজনশীলতার আনন্দ আরও গভীর। সব কাজ নয়, কোন কোন কাজ সমাপ্ত হওয়ার পরে এমন একটা শ্রী লাভ করে যে তা চির আনন্দ-নির্ঝর হয়ে যায়। A thing of beauty হয় বলে তা joy for ever-ও হয়। তার মধ্যে এমন একটা সমগ্রতার স্বাদ পাওয়া যায় যা কিছুতেই তাকে ভুলতে দেয় না, মানবসৃষ্টি হলেও তাকে মনে হয় মানবাতীত শক্তির সৃষ্টি। সৃষ্টি মানুষের অপূর্ব আনন্দের নিদর্শন, তাই স্রষ্টারাও তা থেকে অপূর্ব আনন্দ লাভ করে।

এখানে সৃজনশীলতায় সঙ্গে ধ্বংসশীলতার পার্থক্য কোথায় তা জানা দরকার। সৃজনশীলতায় কাজের শুরুতে শক্তির তেমন তোড়-জোড় নেই, কিন্তু কাজের শেষে ফুটে ওঠে এক অনবদ্য শক্তির প্রকাশ। ধ্বংসের ক্ষেত্রে ঠিক তার উল্টোটা দেখতে পাওয়া যায়; শুরুতে সেখানে একটা উদ্দেশ্য অনুভূত হলেও পরিণামে তেমন একটা উদ্দেশ্যগত সুসমাপ্তি দেখতে পাওয়া যায় না। কাজটা মোটের উপর পরিণতি-বিহীন। কোন বড় দিকে তার লক্ষ্য নেই। ইমারতের সৃষ্টি ও ধ্বংসের মধ্যে এই সত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। যেখানে সৃষ্টির বেলা একটা plan-এর দিকে লক্ষ্য রেখে চলতে হয়, কিন্তু ধ্বংসের বেলা এমন কোন উদ্দেশ্যের অনুসরণের দরকার হয় না। তার কোন ক্রমবিকাশ নেই। সৃষ্টির জন্য ধ্বংসের প্রাথমিক প্রয়োজন আছে, কিন্তু সেখানে ধ্বংস একটা সমগ্র ব্যাপারেরই অঙ্গ। সৃষ্টির পথ তৈরী করাই তার উদ্দেশ্য। সুন্দরের রথ সে চালায় না, কিন্তু সুন্দরের পথে যে আবর্জনা

জমে আছে তা' সে পরিষ্কার করে। কিন্তু সৃষ্টি-উদ্দেশ্যহীন ধ্বংসের কাজও পৃথিবীতে কম নয়। এ-ধরনের কাজের কর্তারাও সৃষ্টির জন্য ধ্বংস করছে বলে নিজের মনকে চোখ ঠারে। এ অভিনয় তার বেশী দূর চলে না, অচিরেই তার মুখোস খসে যায়। ধ্বংসের পরে কি করবে এ প্রশ্ন করলেই সে কাত হয়ে পড়ে, হ্যাঁ-না করে সময় কাটায়। অন্ততঃ ধ্বংসের কথা বলার সময় যে স্পষ্টতা ও উৎসাহ সহকারে কথা বলে সৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে সে স্পষ্টতা ও উৎসাহের পরিচয় সে দিতে পারে না। হিংসার পুরোহিত বিপ্লবী ও সমরপ্রিয়দের বেলা এ কথাটা প্রায়ই খাটে। তাদের অজ্ঞাত ঘৃণার তাগিদেই তারা উত্তেজিত হয়। ঘৃণাকে ঢেকে রাখে প্রেমের ছদ্মবেশে। সৃষ্টি করা নয়, ঘৃণার্হ জিনিসকে ধ্বংস করাই তাদের উদ্দেশ্য। ধ্বংসের পরে কি হবে এ তারা বড় বেশী ভেবে দেখে না। সৃষ্টির মত ধ্বংসের ব্যাপারেও যে একটা আনন্দ আছে তা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রবল ও তীব্র হলেও এ সুখের সুগভীর তৃপ্তি নেই। শত্রুকে মারার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার কাজটি ফুরায় এবং কাজের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দটাও। সৃজনধর্মী কাজের আনন্দ কিন্তু এত সহজে ফুরায় না, কাজ শেষ করার পরেও তা থেকে চিন্তার আনন্দ পাওয়া যায় এবং কাজটিকে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে নেওয়াও অসম্ভব নয়। তাই সৃষ্টিধর্মী কাজের আনন্দ ধ্বংসধর্মী কাজের আনন্দের চেয়ে গভীর ও দীর্ঘপ্রসারী। ধ্বংসধর্মী কাজের সুখ বিকৃত সুখ, তাতে তৃপ্তি নেই। তা ক্ষণস্থায়ী দেয়াশলাইর কাঠির মত ফস করে জ্বলে উঠেই নিভে যায়।

বড় সৃজনধর্মী কাজ থেকে একটা গভীর আনন্দ পাওয়া যায়। কাজটি মন্দ প্রমাণিত হলেই তার দুঃখ, নইলে তার সুখের অবধি থাকে না। খাল কেটে যারা মরুভূমিকে গোলাপ বাগানের মত

ফুটিয়ে তোলে তারা একটা স্থায়ী সুখের অধিকারী। সার্থক কবি-শিল্পীদের ভাগ্যেও অনুরূপ আনন্দ জোটে। শেক্‌সপিয়ার তাঁর কবিতা সম্বন্ধে বলেন, 'এক শ' বছর পরে তাঁর কবিতায় যে মেয়েটি আনন্দ পাবে তার কাছে, তিনি তাঁর আনন্দখানি পাঠিয়ে দিয়েছেন।' শেক্‌সপিয়ার তাঁর উক্তি থেকে নিশ্চয়ই যোগ্য সান্ত্বনা পেয়েছিলেন। এই সনেটে তিনি বলেন যে, তাঁর বন্ধুর চিন্তা তাঁকে আবার জীবনের প্রতি সহজ বিশ্বাসে তাকাতে শিখিয়েছিল। দুঃখ বেদনা উত্তীর্ণ হয়ে তিনি যে জীবনকে আবার ভালোবাসতে পারেন তা এই বন্ধুরই জন্য। কিন্তু আমার মনে হয় বন্ধুর চেয়ে অধিক শক্তি ও সাহস তিনি পেয়েছিলেন বন্ধুর কাছে লেখা এই কবিতা থেকে। শ্রেষ্ঠ শিল্পী আর বিজ্ঞানীদের কাছে তাঁদের কাজই একটা গভীর আনন্দের উৎস। তাছাড়া সমঝদার লোকের প্রশংসা যা পাওয়া যায় তাও তাদের আত্মবিশ্বাসের ভিত্তিকে দৃঢ় করে। তাই তারা নিজের সম্বন্ধে ভাল ধারণা পোষণ না করে পারে না।

বাইরে ভেতরে এই সুসমঞ্জসের দরুন তাদের অপূর্ব সুখের অধিকারী হওয়া উচিত, কিন্তু সব সময় তা সম্ভব হয় না। মাইকেল এঞ্জেলও অত্যন্ত বিমর্ষ প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং নিঃস্ব আত্মীয়-স্বজনের ঋণ পরিশোধের প্রয়োজন না থাকলে কোন দিন শিল্প সৃষ্টি করতেন না। মহৎ শিল্প বেদনা প্রসূত, সব সময় না হলেও অনেক সময় এ-কথাটা সত্য। শিল্পীরা যে বেদনা অনুভব করে সৃষ্টির আনন্দ থেকেই তার ক্ষতিপূরণ হয়, নইলে বেদনার তাগিদে তারা আত্মহত্যা করে বসত। মহৎ শিল্প থেকে শিল্পী আনন্দ পায় এ-কথাটা তাই জোর দিয়ে বলা যায় না, বলা যায় মহৎ শিল্প শিল্পীর দুঃখ লাঘব করে। বিজ্ঞানী সম্বন্ধে কিন্তু এ-কথাটা খাটে না। তাঁরা স্বভাবতঃই সুখী, নিজের কাজ থেকেই তাঁরা প্রচুর সুখ পেয়ে থাকেন।

আধুনিক মনোজীবীদের দুঃখ স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে

না পারার দুঃখ। যে ধনকুবেরদের অধীন তারা কাজ করে তাদের রুচির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পারার দুঃখ। তাঁরা সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ। তাঁদের নিয়োগকর্তারা ফিলিষ্টাইন। তাই কাজে তাঁরা সহজতার আনন্দ পান না। ইংলণ্ড ও আমেরিকার যে-কোন সংবাদপত্র-সেবীকে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারবেন, পত্রিকার নীতির সঙ্গে তাদের মিল নেই। শুধু জীবিকার জন্য তারা খাটছে। বুদ্ধির এ বেশ্যাবৃত্তিতে তারা দুঃখ পায়, কিন্তু এ দুঃখ তাদের কপালে লেখা। এই কাজ থেকে তারা আর আনন্দ পায় না, বরং মনের অটুট ভাবটি নষ্ট হয়ে যায় বলে তাদের মনে এক প্রকার নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। না খেয়ে মরার চেয়ে মনের অটুট ভাব হারানো অনেক ভাল। কিন্তু বেশী খেয়ে আত্মসম্মান হারানো আর কম খেয়ে আত্মসম্মান রক্ষা—এ দুটোর মধ্যে যদি নির্বাচন করতে দেওয়া হয় তবে দ্বিতীয়টির দিকেই যেন আমাদের ঝোঁক যায়। তা' হলেই আত্মসম্মান বজায় থাকে নইলে আত্মসম্মান ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। আর তা ভেঙ্গে গেলে সুখও যায় নষ্ট হয়ে। আমি কেবল অর্থের জন্য কাজ করছি শক্তির চরিতার্থতার জন্য নয়, কথাটা ভাবতেও কেমন গা ঘিন ঘিন করে ওঠে। আমি যেন আত্মাহীন একটি শও।

সৃজনের আনন্দ যখন বিশেষ শক্তির ওপর নির্ভরশীল তখন তা সকলের নয়, কতিপয়ের ভাগ্যেই জোটে। কিন্তু সে কতিপয় যে একেবারে নগণ্য হবে তা ঠিক নয়। কাজের পুরোধায় যারা আছে তারা সকলেই এ-আনন্দ পেতে পারে। শুধু অর্থের জন্য রত না হয়ে ভালোবাসার তাগিদে রত হলেই তা পাওয়া যায়। কাজকে ভালোবাসলে কাজ প্রতিদানে আনন্দ নিয়ে আসে। শুধু প্রতিভাবানরাই যে সৃজনের আনন্দ পায়, তা' নয়, সাধারণ লোকও তা পেতে পারে। মা সন্তানকে মানুষ করে যে-আনন্দ পায়

তা-ও সৃজনের আনন্দ। জগতকে একটি সুসন্তান উপহার দিয়ে সে ভাবতে পারে: আমার চেষ্টা না হলে এমনটি হত না, আর এ-ভাবনা সত্যি সত্যি সুখদায়ী। প্রত্যেক সুসম্পাদিত কাজই সুখের উৎস হতে পারে। দরকার কেবল নিজের গরজের দিকে বেশী না তাকিয়ে বিশ্বের গরজের দিকে তাকান। কাজটিকে নিজের তরফ থেকে বিশ্বের জন্য প্রীতি উপহার মনে করলেই চমৎকার সুখে মন ভরে যায়।

নৈর্ব্যক্তিক অনুরাগ

কাজকে সাধারণতঃ দু'ভাগে ভাগ করা যায় ; প্রয়োজনের আর অপ্রয়োজনের কাজ। জীবনের সঙ্গে যা সরাসরি সম্বন্ধযুক্ত, যা করতেই হয়, না করলে চলে না, তা-ই প্রয়োজনের কাজ। আর যা না করলেও চলে তা-ই অপ্রয়োজনের। অপ্রয়োজনের কাজে কর্তব্যের তাগিদ বড় নয়, খেলার তাগিদ বড়। তাতে যে অবসর ভরিয়ে তোলা হয়, তা অধিকন্তু, গুরুগম্ভীর চেহারা নিয়ে যে কাজটি করা হয়, এটি সে কাজ নয়। এ কাজের বেলা ঠোঁটে স্মিত হাসিটি লেগে থাকে। মানুষের জীবনে বড় স্থান দখল করে সাধারণতঃ তার পুত্র কলত্র, তার দৈনন্দিন কর্ম আর উন্নতি আকাঙক্ষা। এ-কাজ জীবন-সংগ্রামের। এ-সব চিন্তার ভারে মানুষ মুষড়ে পড়তে চায়। তাই মাঝে মাঝে এমন কাজে হাত দিতে হয়, যেখানে উদ্‌বর্তনের কথাটা বড় হয়ে ওঠে না। প্রয়োজন-সিদ্ধির তাগিদ থাকে না বলে এ কাজে ব্যক্তিস্বার্থের গন্ধ কম। তাই এ কাজকে নৈর্ব্যক্তিক কাজ আর এ-কাজের প্রতি অনুরাগকে নৈর্ব্যক্তিক অনুরাগ বলা যেতে পারে। লাভ-লোকসান খতিয়ে এ কাজটি করা হয় না, করা হয় আনন্দের তাগিদে। অফিসে আদালতে, হাটে-বাজারে যে কাজটি করা হয়, সেটি তো নয়ই, এমনকি বৈজ্ঞানিক প্রবরের বৈজ্ঞানিক গবেষণাটিও নৈর্ব্যক্তিক কাজের তালিকায় পড়ে না। তার সঙ্গে তার উন্নতি-অবনতির সম্বন্ধ থাকে বলে তা ব্যক্তিক কাজ হয়ে দাঁড়ায়। স্বার্থের কথা ভুলে সে এ-কাজটি করতে পারে না। তাই উঁচু স্তরের কাজ হলেও তা জীবন সংগ্রামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

যা কিছু জীবনের মূল ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় তাতেই ব্যক্তিকতা আর প্রয়োজনের গন্ধ লাগে। একই ব্যাপার আপনার জন্য ব্যক্তিক বা প্রয়োজনের, আমার জন্য নৈর্ব্যক্তিক বা অপ্রয়োজনের হতে পারে। ভাষাতাত্ত্বিকের কাছে ভাষাতত্ত্বের আলোচনাটা প্রয়োজনীয় ব্যাপার। এর উপরই তার প্রতিষ্ঠা নির্ভর করেছে বলে এটা তার জীবন-সংগ্রামের অন্তর্ভুক্ত। আপনি কবি মানুষ, আপনি যে মাঝে মাঝে সেখানে যান সেটা আপনার পক্ষে হাওয়া খাওয়া, কাজ করা নয়। একই পথ একজনের জন্য হাওয়া খাওয়া, অপর জনের পক্ষে কাজের পথ হতে পারে। আসল ব্যাপার হচ্ছে গ্রহণ করার ধরনটি। আমার কাছে যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আপনি যদি তা' হাল্কাভাবে গ্রহণ করেন তো সে কাজটিই আপনার কাছে নৈর্ব্যক্তিক কাজ হয়ে দাঁড়াবে। মনের লীলা বজায় থাকবে বলে তা আপনাকে পীড়া দেবে না আনন্দ দেবে—সমস্ত অন্তরে একটা খুশীর স্বাদ চারিয়ে দেবে।

তাই কর্তব্য থেকে অকর্তব্যে—একটা লীলার জগতে আসার তাগিদ মানুষ অনুভব করে। সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর সন্ধ্যার ভ্রমণ তারই ফল। এটাও কাজ। কিন্তু উদ্দেশ্যবিহীন শখের কাজ। ধরাবাঁধা নিয়মের অধীন হতে হয় না বলে মানুষ এখানে মুক্তির স্বাদ পায়। অবশ্য এমন লোকও আছে যারা সচেতন মন নিয়ে স্বাস্থ্য লাভের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করে। কিন্তু তাদের সংখ্যা আর কত? বেশীর ভাগ লোকই তো ভ্রমণ করে নিজেকে ভুলতে, নিজের মনকে ছাড়া দিতে। শখের কাজ থেকে যে আনন্দ পাওয়া যায়, অবশ্য-কর্তব্য থেকে তা পাওয়া কঠিন। শখের বইখানা যদি অবশ্য-পাঠ্য করে দেওয়া হয় তো তা আর ছুঁতে ইচ্ছে হবে না। কর্তব্যের বিশ্রী হাত বইটির গায়ে এক পোঁচ কালি মাখিয়ে দিয়েছে, এমনি মনে হবে। কোন পুস্তক যদি অপাঠ্য করে তুলতে চান তো তা পাঠ্য করে দিন. আপনার উদ্দেশ্য

সিদ্ধ হবে। লুকিয়ে-পড়া বইটি প্রকাশ্যে পড়তে দিলেই তা তার মাধুর্য হারাবে।

অপাঠ্য সব পাঠ্য কেতাব সামনে আছে খোলা,
কর্তৃজনের ভয়ে কাব্য কুলুঙ্গিতে তোলা।

কিন্তু কুলুঙ্গিতে তোলা যে কাব্যের প্রতি ছাত্রের গোপন টান, যে কাব্য লুকিয়ে লুকিয়ে পড়া হয়, পাঠ্যতালিকাভুক্ত হলে তাও অপাঠ্য মনে হবে। পাঠ্য বলে সামনে খোলা থাকলেও পড়ার আগ্রহ থাকবে না।

সুখহীনতা, অবসাদ ও স্নায়বিক ক্লান্তির একটি কারণ হচ্ছে বাজে কাজে মন না দেওয়া। প্রয়োজনের কাজে একান্তভাবে লেগে থাকার দরুন অন্তরাত্মা দম ফেলবার ফুরসৎ পায় না, দাম ঢাকা পুকুরের মত তা রুদ্ধশ্বাস হয়ে থাকে। বাজে কাজে যে একটা খেলার আনন্দ থাকে এখানে তার অভাব। উদ্‌বেগ আর উৎকণ্ঠা দিয়ে তা ঠাসা। কাজের মানুষটির মনের অবসর নেই। কেবল ঘুমন্ত অবস্থাতেই তার একটুখানি মুক্তি। কিন্তু এই সামান্য বিশ্রামে চলে না, আরো দরকার। অনবরত খেটে চলার দরুন আনন্দবর্জিত হয়ে লোকটি ক্রমশঃ বুদ্ধিহীন হয়ে পড়ে এবং কারণে অকারণে খিটখিটেমির পরিচয় দিতে থাকে। এসব হচ্ছে অবসাদের কারণ ও ফল উভয়ই। পরিশ্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষটির বাইরের অনুরাগ কমতে শুরু করে এবং বাইরের অনুরাগ কমার সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে যে মুক্তির স্বাদ পাওয়া যায় তাও হ্রাস পেতে থাকে। ফল আরো পরিশ্রান্তি, আরো অবসাদ। এভাবে আনন্দ-বিহীনতা থেকে অবসাদ, অবসাদ থেকে আরো আনন্দবিহীনতা আরো আনন্দবিহীনতা থেকে আরো আরো অবসাদ জন্মাতে থাকে। এই পাপচক্রের অন্তিমে বিরাজ করছে স্বাস্থ্যভঙ্গ—স্নায়ু পীড়া। বাইরের অনুরাগে এই আরাম যে, তাতে কাজের দুশ্চিন্তা

নেই, তা সহজ সুন্দর ও লীলাধর্মী। ইচ্ছাশক্তির ওপর জোর দিতে হয় না বলে তা স্নায়ুর পক্ষে অসুখকর নয়, বরং স্নায়ুর স্নিগ্ধী-করণই তার কাজ। বসন্ত বায়ুর মতো তা মানুষকে চাঙ্গা করে তোলে। প্রয়োজনের কাজটি কিন্তু তা নয়। সিদ্ধিলাভের কঠিন প্রয়াস ও ইচ্ছাশক্তির অনমনীয়তা প্রয়োজনের কাজটিকে নীরস ও রুক্ষ করে দেয়। তখন মনের অবস্থা হয়, 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' গোছের। কিন্তু কাজ নাছোড়বান্দা। সে মানুষটিকে জড়িয়ে রাখবেই। কমলিকে ছাড়তে রাজি হলেও কমলি আর ছাড়তে রাজি হয় না, এই তো বিপদ।

কাজ সাঙ্গ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে লোকটি কাজের চিন্তা ছাড়তে পারে না তার মতো হতভাগ্য আর কে? সে যে শুধু তার মনকে ঘোলাটে করে তোলে, তা নয়, কাজটিও পণ্ড করে। জীবনে সুনিদ্রার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। আর তা উপভোগ করে শুধু চিন্তা মুক্তরাই। প্রতি প্রভাত তাদের জন্য নবজীবনের বাণী নিয়ে আসে। চিন্তান্বিত ব্যক্তির কপালে সুনিদ্রার ও সুপ্রভাতের আনন্দ নেই। আর তা নেই বলে দিনের কাজটিও সে সুসম্পন্ন করতে পারে না।

বলতে পারেন: কাজের চিন্তা ভোলার উপদেশটি খুব ভালো আর সকলেই তা দেয়ও, কিন্তু চিন্তা ভোলার কায়দাটি কেউ বাতলায় না; সেটা বাতলাতে পারেন? তার উপায় হচ্ছে অনু-রাগের বৈচিত্র্য। মাত্র একটি ব্যাপারে অনুরক্ত হলে চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া কঠিন। অনেকগুলি ব্যাপারে অনুরক্ত হলেই একটার টানে আর একটা থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া যায়। অবশ্য অনুরাগের বিষয়গুলি বিভিন্ন প্রকৃতির হওয়া চাই, নইলে চলবে না। এক প্রকৃতির হলে এক ধরনের শক্তিরই অনুশীলন হবে, আর শক্তির সীমা আছে। সারাদিন যে শক্তির অনুশীলন হয়েছে, রাতেও যদি সে-শক্তিরই অনুশীলন করতে হয় তো আপনি অসুবিধায় পড়বেন। অনিচ্ছুক অশ্বের মতো শক্তিটি আপনার

হুকুম তামিল করতে আপত্তি জানাবে, আর আপনি তাকে কাবু করতে না পেরে বিরক্তি বোধ করবেন। তাই অনুরাগগুলি ভিন্ন প্রকৃতির হওয়া দরকার। তা' হলেই একটি শক্তির অনুশীলন-কালে অপর শক্তিগুলি বিশ্রাম নেওয়ার মুখোশ পরবে। শক্তি-গুলির নবজন্ম লাভের এই প্রকৃষ্ট উপায়। ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে কোন একটা বিশেষ কাজে লেগে থাকা ভালো নয়, তাতে জীবনের স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়, আর প্রাণ আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে কথাটা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। কেননা, দেখা গেছে, অনেক সময় অর্থের জন্য মানুষ এমন মরিয়া হয়ে কাজে অবতীর্ণ হয় যে পরিণামে উপভোগ ক্ষমতাই সে হারিয়ে বসে।

জীবনে খেলার স্থান আছে—শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ খেলারই। একথা স্বীকার না করে যারা জীবনকে কর্তব্যময় করে তুলতে চায় তারা ধ্বংসের আয়োজন করে। আনন্দবিহীন জীবন যাপন করতে হয় বলে তারা কারো প্রাণেই সাড়া জাগাতে পারে না। অনুভূতির দিক দিয়ে তারা দীন হয়ে পড়ে। ফলে সমগ্র জীবনটাই তাদের কাছে তাৎপর্যহীন মনে হয়। All work and no play will make jack a dull boy উক্তিটা তাই কেবল বালকদের সামনেই নয়, পরিণত বয়স্কদের সামনেও স্থাপনযোগ্য। অতিরিক্ত কাজের নেশায় মেতে যে অনেক সময় জীবন নষ্ট করে দেয়া হয় তা আমরা টের পাইনে। যে সুখের জন্য কাজ সে সুখই যদি নষ্ট হয়ে যায় তো কাজ দিয়ে কী লাভ? তাই কাজের সীমা জানা দরকার। কবি যখন বলেন:

What is life if full of care,
We have no time to stand and stare?

তখন ঠিকই বলেন। Stand ও stare করবার সুযোগ না থাকলে জীবন যান্ত্রিক হয়ে পড়ে; আর যান্ত্রিক জীবনে ছন্দোসুষমার মাধুর্য

পাওয়া যায় না। তাই কেবল কাজ করলে চলবে না, কাজের ফাঁকে ফাঁকে দেখতে, ভাবতে ও অনুভব করতেও হবে। তাই দেখা, ভাবা আর অনুভবেরই অপর নাম মনের খেলা। এই খেলাই মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। যার জীবনে তা নেই, সে মনুষ্যত্বের পূর্ণ স্বাদ পায়নি বলতে হবে। দরকারী কাজে একান্ত-ভাবে লেগে থাকলে এই মনের খেলা সম্ভব হয় না।

এদিক দিয়ে মেয়েদের চেয়ে পুরুষরা অনেক ভাগ্যবান: মেয়েরা সাধারণতঃ প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া অন্য কাজে মন দিতে পারে না। পুরুষরা পারে। নৈর্ব্যক্তিক কাজের ক্ষমতা থেকে মেয়েরা এক রকম বঞ্চিত! কাজ ফুরিয়ে গেলে তারা স্বচ্ছন্দে অন্য চিন্তায় মন দিতে পারে। বলা হবে: গ্রহের আবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হয় বলেই মেয়েরা অন্য চিন্তার সুযোগ পায় না— পারিবারিক চিন্তার নিগড়ই তাদের আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রাখে। কিন্তু তা সত্য নয়। যে সব মেয়েরা বাইরে কাজ করে তাদের বেলায়ও দেখা গেছে অদরকারী কাজে মনোনিবেশ করার ক্ষমতা তাদের কম। ব্যতিক্রম হয়তো আছে, কিন্তু এই-ই সাধারণ নিয়ম। দেখা গেছে মেয়ে কলেজের অধ্যাপিকারা সন্ধ্যাবেলাতেও কলেজের কথাই বলেন, অন্য কথ্য কথা নয়। পুরুষ অধ্যাপকরা কিন্তু এমন এক-ঘেয়েমির পরিচয় দেন না, বিচিত্র কথার চমকে তারা পরিবেশটিকে চঞ্চল করে তোলেন। মেয়েদের গতি সব সময়ই কেন্দ্রের দিকে, কেন্দ্রাতিগ হওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই বলে নির্ধারিত কাজ ব্যতীত অন্য কাজে তারা মন দিতে পারে না। মেয়েরা তাদের এই বৈশিষ্ট্যকে কর্তব্যনিষ্ঠা বলে সম্বর্ধনা জানাতে পারে, কিন্তু আসলে তা সম্বর্ধিত হওয়ার মতো গুণ নয়—ত্রুটি। তাতে কাজের ক্ষমতা বাড়ে না, কমে। কাজটি ভাল করে করতে চাইলে মাঝে মাঝে তার কথা ভুলতে হবে, নইলে অভ্যাসের জীর্ণতামুক্ত হয়ে মন নবীন হয়ে ওঠার সুযোগ পাবে না। আর মন নবীন না হলে

কাজটি শ্রীহীন হয়ে পড়বে। একটা কথা সব সময় মনে রাখলে—সে কথাটা কাজেরই হোক, আর আদর্শেরই হোক- মনে এক প্রকার সংকীর্ণতা জন্মে, আর সংকীর্ণতা কালক্রমে অন্ধতায় পরিণত হয়। তাই মনকে একঘেয়েমির নাগপাশ থেকে মুক্ত রাখা ভালো। নারী-পুরুষ উভয়েই যেন কথাটির প্রতি লক্ষ্য রেখে চলেন।

শিথিলতা সঞ্চারী বলেই যে, নৈর্ব্যক্তিক কাজের মূল্য তা নয়। তার অন্য গুণও আছে। প্রথমেই যে গুণটির কথা মনে পড়ে সেটি হচ্ছে "মাত্রাবোধ। মাত্রাবোধ নির্ভর করে সহজতার ওপর আর সহজ তার গোড়ায় থাকে নৈর্ব্যক্তিক কাজের রস। যে যত বেশী নৈর্ব্যক্তিক কাজে রত সে তত বেশী সহজতার পরিচয় দেয়, এতো একরকম হামেশাই দেখতে পাওয়া যায়। কত খুশী তার মনটি। জীবনছন্দের তালটি ধরতে তার ভুল হয় না। প্রয়োজনের কাজে একান্তভাবে লিপ্ত থাকলে বিশ্বের কথা ভুলে যেতে হয়। নিজের কাজ ও চিন্তা ছাড়া যে, জগতে অন্য ধরনের কাজ ও অন্য চিন্তা আছে তখন সে কথা মনেই থাকে না। একই কাজ ও চিন্তার জালে একান্তভাবে জড়িয়ে পড়ার দরুন একপেশেমির অভিশাপে জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে।

এ দুঃখ থেকে মুক্তি দিতে পারে বিচিত্র কাজের অনুরাগ। জগতে অনেক দেখবার, ভাববার ও বোঝবার আছে এ বোধ না থাকলে জীবন সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, এতো এক রকম জানা কথা। সংস্কৃতির একটি লক্ষ্য অনুভূতি-কল্পনার সরসতাকে জিইয়ে রেখে মানুষকে যান্ত্রিকতা থেকে মুক্ত রাখা। জগতে আমরা এসেছি অল্প দিনের জন্য। এই অল্পদিনের মধ্যে জীবনের পাত্রটি বিচিত্র স্বাদে পূর্ণ করে নিতে হবে। একঘেয়েমির স্থান কোথায়? তাই দুয়েকটি কাজে বিশেষভাবে লাগা সত্ত্বেও যাতে বিচিত্র ব্যাপারে হাত দেওয়া যায় সে বন্দোবস্ত করতে হবে। নইলে জীবনের সব মজা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কবি যখন বলেন;

'সব কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজেই,
'বাধা বাঁধন নেই গো নেই।
দেখি খুঁজি বুঝি,
কেবল ভাঙ্গি গড়ি যুঝি,
মোরা সব দেশেতেই বেড়াই ঘুরে সব সাজেই।
পারি নাই বা পারি
না হয় জিতি কিম্বা হারি
যদি অমনিতে হাল ছাড়ি মরি সেই লাজেই।

তখন এই নৈর্ব্যক্তিক কাজের কথাই বড় হয়ে ওঠে। এ-কাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিচিত্র শক্তির স্বাদ পাওয়া, কৃতকার্যতা লাভ নয়। কৃতকার্যতার চেষ্টা করতে হবে দু'একটি কাজে। বাকিগুলির উদ্দেশ্য হবে নতুন প্রাণের আমদানি। অভ্যাসের বেড়া ভেঙ্গে দিয়ে তারা নিয়ে আসবে নতুন জীবনের স্বাদ।

নিজের জীবন ও নিজের কাজ নিয়ে আমরা এতো বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়ি যে, বৃহৎ দুনিয়ার কথা আমাদের মনেই থাকে না। তাতে শ্রমের ইচ্ছাটা বাড়লেও নিপুণতা নষ্ট হয়ে যায়। ভাল-ভাবে গুছিয়ে-গাছিয়ে কাজ করতে হলে কাজের ফাঁকে ফাঁকে অবসর থাকা দরকার। আর অবসর মানে যে কাজের অভাব নয়, ভিন্ন রকমের কাজ, আশা করি তা আর বলে দিতে হবে না। কর্ম-বাদীরা একথা বুঝতে পারে না বলে লোককে হাড়ভাঙ্গা খাটুনির উপদেশ দেয়। ফলে মানুষের জগতটি হয়ে পড়ে সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ। দুনিয়ায় এসে দুনিয়ার সঙ্গে সার্থক পরিচয় স্থাপন না করার মতো দুঃখ আর কী হতে পারে। কর্মবাদীদের তাড়নায় মানুষকে কিন্তু হামেশাই এ দুঃখ পেতে হচ্ছে। দুয়েকটি কাজে একান্তভাবে আবদ্ধ থাকার দরুন তারা আর বিরাট বিশ্বের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে না। জীবন সম্বন্ধে একটা মুক্ততর ধারণার সৃষ্টি না

হলে এ অন্ধতা থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন। এখানে কেজো লোকদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা মনে রাখা ভালো : "ওরা কর্তব্যকে ভালোবাসে বলে কাজ করে, আমরা প্রাণকে ভালোবাসি বলে কাজ করি—এজন্য ওরা আমাদের গাল দেয়, বলে নিষ্কর্মা ; আমরা ওদের গাল দিই, বলি নির্জীব।" কোনো লোকের নিষ্প্রাণ কাজে জীবন বিষিয়ে ওঠে, তাই দরকার এমন কাজের যা প্রাণসম্পর্কে পূর্ণ। নৈর্ব্যক্তিক কাজের প্রয়োজন এখানেই। নতুন প্রাণের আমদানি করার ভার সে-ই নিতে পারে।

নিজেকে নিজের কাজকে বেশী মনে রাখা খারাপ স্বীকার করি, কিন্তু তাদের ভোলা যায় কী করে ? কী করলে আত্মচিন্তার কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ?—সেজন্য দরকার অনন্তকাল ও বিশ্বের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের কাল ও নিজের পরিবেশের অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি। বৃহৎকে অনুভব করতে পারলেই ক্ষুদ্র তার কাছে আত্ম-উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হবে, নইলে সূচ্যগ্র ভূমি ছাড়তেও রাজি হবে না। নিজেকে বৃহৎ জীবনধারার অংশ রূপে না দেখলে ভেতরের অসারতা উপলব্ধি করা যায় না। কিন্তু যে শিক্ষার ফলে বুদ্ধি ও হৃদয়ের এহেন প্রসার ঘটে, হালে তা দুর্লভ। বর্তমানকালে শিক্ষা বাঁচবার কয়েকটি ফন্দি শেখাচ্ছে মাত্র, তার বেশী কিছু নয়। আত্মউপলব্ধি ও আত্মসৃষ্টি তার নজরে নেই, আছে কেবল টিকে থাকার ভাবনা। ফলে মানুষের ভেতরের জানোয়ারটিই বেঁচে থাকে, উপযুক্ত খোরপোশের অভাবে মানুষটি যায় মরে। যে বিশ্ববোধের পুষ্টিসাধনে মনুষ্যত্বের বিকাশ, শিক্ষা তা পরিবেশন করে না বলে মানুষ সংকীর্ণ ব্যক্তিত্বের আওতায় নিজেকে বন্দী করে রাখছে। উদার আহ্বান তাই ব্যর্থ হচ্ছে। আকাশের পাখী বারবার ডাক দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু খাঁচার পাখী আমরা খাঁচায় এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, সে আহ্বান আমাদের মন স্পর্শ করছে না। কানের ভেতর দিয়ে মরমে পশে তা মন-

প্রাণ আকুল করে তুলছে না। তাতে ক্ষতিটা আমাদেরই। একটা বড় রকমের আনন্দ থেকে আমরা বঞ্চিত থেকে যাই।

বৃহৎ জীবনের স্বাদ পেলে জীবনের ধারাটাই বদলে যাবে। এখন যে-সব ব্যাপারের ওপর জোর দেওয়া হয়, তখন আর সে-সব ব্যাপারের ওপর জোর দেওয়া হবে না। মনে করুন আপনি কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য হয়ে তার জয়ের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। নির্বাচনদ্বন্দ্বে আপনার চিন্তা-কল্পনা ও কর্মশক্তি সেই একই কাজে নিযুক্ত হচ্ছে। কিন্তু আপনার চলার পথে আপনি টের পেলেন যে, ঘৃণা বিদ্বেষ আর হিংসার আশ্রয় ছাড়া আপনার জয়ের সম্ভাবনা কম। তখন আপনার দৃষ্টি যদি সংকীর্ণ বর্তমানেই আবদ্ধ থাকে তো ঘৃণা বিদ্বেষের আশ্রয় গ্রহণ না করে আপনি পারবেন না। বর্তমান স্বার্থটাই যখন সব তখন তা উদ্ধারের জন্য যে-কোন উপায়ই তো গ্রহণযোগ্য। ভালোমন্দের বিচারে কী লাভ? কিন্তু যাদের দৃষ্টি বর্তমানের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়, অতীত ও ভবিষ্যতকে যারা সামনে রেখে চলে তারা এ-রকম সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করে। আপনার অন্তরে যদি অতীত কালের ছবিটি ভালো করে আঁকা থাকে—কী করে মানুষ অসভ্যতার অন্ধকারের ভেতর দিয়ে বহু কষ্টে সভ্যতার আলোকে এসে পৌঁছেছে, কী করে সে বহু বাধা অতিক্রম করে ভবিষ্যতের সুন্দরতর সভ্যতায় গিয়ে পৌঁছবে—তার একটা উপলব্ধি যদি আপনার ভেতরে থাকে তো ব্যক্তিগত বা দলগত লাভের জন্য আপনি কখনো অন্যায় উপায় গ্রহণ করতে পারবেন না। সমস্ত ঐতিহাসিক বোধ, সমস্ত মানবতা চীৎকার করে আপত্তি জানাবে। আর সে আপত্তিতে উদাসীন থাকা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না। একজন জবরদস্ত আদমির আপত্তির চেয়েও সে আপত্তির মূল্য আপনার কাছে বেশী হবে। কেননা, মানুষের ইতিহাস ও মানবতা আপনার প্রিয়, আর প্রিয়ের জন্য কে না ত্যাগ স্বীকার করে?

তাই দরকার বিশ্বের সঙ্গে একটা আত্মিক যোগ। আপনি তখন আর নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করবেন না, যে সকল মহাপ্রাণ মানুষ সত্য ও সৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যাচারের মধ্য দিয়ে গিয়ে আত্মার ঐশ্বর্য প্রকাশ করেছেন, তাদের সঙ্গ উপলব্ধি করবেন। তাঁদের কথা শুনে আপনার দেহমন রোমাঞ্চিত হবে, আর আপনি তাঁদেরই একজন হয়ে যাবেন। সে জন্য দরকার কেবল ইতিহাসকে আপন জানা, ইতিহাসের পেটিকায় মনুষ্যত্বের যে মাণিকটি রয়েছে তাকে ভালোবাসা। তা হলেই আপনার পূর্বগামীদের দৃষ্টান্ত থেকে আপনি বল সঞ্চয় করবেন, আর অন্যায়কে রীতিমতো ঘৃণা করে চলবেন। আপনি তখন নিকটবর্তী ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে দূরবর্তী মানবিক স্বার্থকে বড় করে দেখবেন এবং তার জন্য প্রাণপাত করতেও দ্বিধা করবেন না। আপনার সংস্কৃতি তথা মানবতার সাধনা কবচের মতো আপনাকে রক্ষা করবে। হীনতা ক্ষুদ্র স্বার্থ তখন আপনার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। ফলে অন্তরে এমন একটা গভীর সুখ নেমে আসবে যে আপনি পরাজয়ে অবিচলিত থাকবেন এবং জগন্নাথের আসনে বসেও পুষ্পের হাসি হাসবেন। মানব স্বার্থের উত্তাপে ক্ষুদ্র স্বার্থ উবে যাবে বলে আপনি একটা মুক্তির আনন্দ লাভ করবেন। অথবা আরো সত্য করে বলতে গেলে আপনার স্বার্থভাব যাবে না। মানব স্বার্থই আপনার স্বার্থ হয়ে উঠবে, প্রেয় ছেড়ে দিয়ে আপনি শ্রেয়ে এসে পৌঁছবেন না, বরং শ্রেয়ই আপনার কাছে প্রেয় হয়ে দেখা দেবে। শিব, সুন্দর ও মহত্‌কে আপনি সহজেই ভালোবাসবেন

কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক অনুরাগের রকমারি না হলে তা সম্ভব হয় না। বিশ্বের বিচিত্র ব্যাপারে একটা অহেতুক অনুরাগ অনুভব না করলে এমন মহৎ জীবনের আনন্দিত অধিকারী হওয়া অসম্ভব। এখানে ধর্ম বা দর্শনের ভাষায় যদি ব্যক্তিস্বার্থকে ব্যক্তি আত্মা, আর বিশ্বস্বার্থকে পরমাত্মা বলে ধরে নেওয়া হয় তো খুব অন্যায়

হবে বলে মনে হয় না। আত্মাকে চলতে হয় যেমন পরামাত্মার দিকে লক্ষ্য রেখে, ব্যক্তিস্বার্থকেও চলতে হবে তেমনি বিশ্বস্বার্থের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। নইলে জীবনের সার্থক বিকাশ সম্ভব হবে না। যোগের মতো একটা কিছু এখানেও দরকার। আর এ-ক্ষেত্রে যোগের উপায় হচ্ছে বিচিত্র অনুরাগ। অনুরাগের অসংখ্য সূতায় বিশ্বকে বাঁধতে হবে।

আমি যদি আমার ইচ্ছামতো শিক্ষাকে রূপান্তরিত করতে পারতুম তো পুরানো আদর্শগুলি বাদ দিয়ে নতুন আদর্শের দিকে তাকাতুম। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যাতে জগৎ ও জীবনের দিকে তাকান যায়, এমন একটা আদর্শ গ্রহণ করতুম। প্রকাণ্ড বিশ্বের তুলনায় আমাদের গ্রহটি কত ক্ষুদ্র, এই ক্ষুদ্রগ্রহে জীবের আগমন কত স্বল্পকালের, আর এই স্বল্পকালের প্রাণীবংশে মানুষের জন্ম যে সেদিনের ব্যাপার, এ-কথাটা ছাত্রদের বুঝিয়ে বলতুম। আবার এই নগণ্যতাবোধক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষতিপূরণ হিসেবে আরেকটি দৃষ্টি-ভঙ্গিও তাদের সামনে তুলে ধরতুম। সেটা হচ্ছে অন্ধকার দূরী-করণে ব্যক্তির ভূমিকা। ব্যক্তির ভেতরে যে জ্ঞানের ক্ষুধা প্রেমের ক্ষুধা ও সৌন্দর্যের ক্ষুধা রয়েছে তা জাগিয়ে দিতে পারলেই মানুষ ক্ষুদ্র স্বার্থকে বড় করে না দেখে মহৎ স্বার্থকে বড় করে দেখার ক্ষমতা লাভ করবে। মানুষের ভেতরে যে মহত্ব রয়েছে দুনিয়ায় তার মতো জিনিস আর নেই, একবার যদি মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারে তো তার আর পতনের ভয় থাকে না—সহজেই সে মাধ্যাকর্ষণজয়ী হতে পারে।

ওপরের কথাগুলি হচ্ছে স্পিনোজা-দর্শনের সারসংকলন। বহু-কালপূর্বে স্পিনোজা মানুষের বন্ধন ও মুক্তি সম্বন্ধে যা বলেছিলেন ভাষার জটিলতামুক্ত করে এখানে তাই পরিবেশিত হয়েছে। মানুষের চারদিকে পতনের ফাঁদ পাতা ; কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য প্রভৃতি রিপু সব সময়ই তাকে নদীর দিকে টানছে, একথা

বললে বন্ধনের কথাই বলা হয়, মুক্তির কথা বলা হয় না। আর বন্ধন সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়ে বিশেষ লাভ নেই। তাতে ভয়ই বাড়ে, জয়ের ক্ষমতা বাড়ে না। প্রচলিত নীতির ত্রুটি এই যে, তা মানুষকে বন্ধন সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েই কর্তব্য সমাধান করে। মুক্তির পন্থাটা বাতলায় না। স্পিনোজা-দর্শন এর প্রতিকার করেছে। সেখানে যেমন বন্ধনের কথা আছে, তেমনি রয়েছে মুক্তির কথাও। মানুষের আত্মার যে মহত্ব আছে, মানুষ একবার তার স্বাদ পেলে আর নীচে নামতে চাইবে না, এ বাণী সেখানে ঘোষিত হয়ে গেছে। তাই তা মুক্তিকামী মানুষের কতো প্রিয়।

অতএব, শিক্ষা সংস্কৃতির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আত্মার মহত্বে মানুষকে বিশ্বাসী করে তোলা। যে-শিক্ষা তা করে না সে-শিক্ষা ব্যর্থ—তা দিয়ে আত্মরক্ষার ফন্দিফান্দি শেখান গেলেও আত্ম-বিকাশের প্রয়োজনীয় জীবনতত্ত্ব শেখান যায় না। আধুনিক শিক্ষা সে হিসাবে ব্যর্থ। মানুষের ভেতরের সুকুমার বৃত্তির রক্ষণ ও বর্ধনের দিকে তার নজর নেই। নজর শুধু জীবন সংগ্রামের দিকে। বুদ্ধির নখ ও দাঁত ধারাল করার দিকেই তার ঝোঁক। আত্মার মহত্ব ও মাধুর্য বাড়ানোর দিকে নয়।

[আত্মার স্বাদ যারা পেয়েছে, নীচতা হীনতাকে তারা মনে প্রাণে ঘৃণা করতে শিখেছে। স্বার্থান্বেষী নীচ প্রকৃতির লোক যে-কোন দিন অনাবিল সুখ পেতে পারে না, সে সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ ওয়াকিফ। তাই লোকেরা সাধারণতঃ যে দৃষ্টিভঙ্গির পবিচয় দিয়ে থাকে তারা তার সমর্থক নয়। সাধারণ লোকেরা সমস্ত কাজ করে সংকীর্ণ স্বার্থের দিকে তাকিয়ে, তাদের দৃষ্টি থাকে উদার আত্মার দিকে। আত্মার জন্য যদি বাস্তব জগতে ক্ষতি স্বীকার করতেও হয় তো তাতেও তারা পিছপা নয়। বাস্তব ক্ষতি স্বীকার করেও তারা মনুষ্যত্বের পতাকাটি উড্ডীন রাখতে চায়। তারাই **Salt of the earth**। পৃথিবী তাদেরই জন্য বাসযোগ্য।

অর্থনীতি অনুযায়ী মানুষের যে বিভাগ তা দূর করতে চাইলেও মানুষের নৈতিক বিভাগে তারা বিশ্বাসী। যাদের আছে আর যাদের নেই—এই প্রভেদের চেয়ে ছোটো-বড়োর প্রভেদটিই তাদের কাছে মূল্যবান। কেননা, এখানেই তারা মনুষ্যত্বের প্রেরণা পায়। ত্যাগে, দুঃখ সওয়ার তপস্যায় যারা পৃথিবীর ইতিহাসকে উজ্জ্বল করে রেখেছে তারাই তাদের পূজ্য। তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে পারলেই তারা খুশী। সমাজতন্ত্র যখন তারা সমর্থন করে তখন এদিকে লক্ষ্য রেখেই করে—শুধু জঠরের ক্ষুন্নিবৃত্তির দিকে তাকিয়ে নয়। মানুষের মধ্যে যে বড় মানুষটি রয়েছে তাকে বাইরে আনা চাই—এই তাদের সংকল্প। অর্থনৈতিক সমতা চায় তারা মনুষ্যত্বের তথা আত্মার অসাম্যকে সুস্পষ্ট করে তোলার জন্য। জঠরের সাম্য বলে একটা জিনিস থাকতে পারে; কিন্তু আত্মার সাম্য বলে কোন কিছু আছে কি-না সে সম্বন্ধে তারা সন্দিহান। যদি থাকে তো আত্মা একটা শৃঙ্খলিত ধরা-বাঁধা ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তা সত্য নয়। আত্মার নব নব উন্মেষশালিনী যে শক্তি, তা কখনো stereotyped বা ছাঁচে ঢালা হতে পারে না।]

মহত্বের স্বাদ পাওয়া মানুষটি হৃদয়ের বাতায়ন খুলে দিয়ে বিশ্বের আলো-হাওয়াকে নিমন্ত্রণ জানায়—সেখানে যত মহৎ ভাব সুন্দর চিন্তা আর উজ্জ্বল কল্পনা আছে সকলকেই আপন করার চেষ্টা করে। বিচিত্র তার ক্ষুধা। ছুঁৎমার্গী মনের পরিচয় সে দেয় না। মানুষের ইতিহাস তার নিজের ইতিহাস। দুর্বল জাতি-সমূহের প্রতি তার অপরিসীম অনুকম্পা। তাই তাদের জাগরণে তার আনন্দের অবধি থাকে না, সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে সে বিশ্ববোধের স্বাদ পেতে চায়:

'ইচ্ছা করে মনে মনে
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোক সনে
দেশ-দেশান্তরে; 'উষ্ট্রদুগ্ধ করি পান

মরুতে মানুষ হই আরব সন্তান
দুর্দম স্বাধীন ; তিব্বতের গিরিতটে,
নির্লিপ্ত প্রস্তর পুরী মাঝে, বৌদ্ধ মঠে
করি বিচরণ। দ্রাক্ষাপায়ী পারসিক
গোলাপ কাননবাসী, তাতার নির্ভীক
অশ্বারূঢ়, শিষ্টাচারী সতেজ জাপান,
প্রবীণ প্রাচীন চীন নিশিদিনমান
কর্ম অনুরত—সকলের ঘরে ঘরে
জন্মলাভ করে লই হেন ইচ্ছা করে।

ব্যক্তি জীবনে ক্ষুদ্রতা ও সংক্ষিপ্ততা সম্বন্ধে সচেতন থেকেও সে বুঝতে পারে পৃথিবীতে যত ভালো জিনিস আছে তার একত্র সমাবেশ হয়েছে মানব অন্তরে। তাই তার কাছে মানব অন্তরের চেয়ে মুল্যবান আর কিছুই নেই। যে মানুষটির মনে বিরাট বিশ্ব মুকুরিত সেও যে বিশ্বের মত বিরাট তা সে সহজেই উপলব্ধি করতে পারে। বিশ্বকে আলিঙ্গন করা আর বিশ্বময় হওয়া তার কাছে এক কথা। ভয়ের ভ্রূকুটিতে সে ভীত হয় না বরং নব শক্তির উদ্‌বোধক হিসাবে তাকে সম্বর্ধনাই জানায়। (যদি বলা হয় বিশ্বকে উপলব্ধি করা আর অমরতাকে উপলব্ধি করা এক কথা, তো কথাটা মরমীবাদের মত শোনাবে, কিন্তু তা' হলেও কথাটার পশ্চাতে যথেষ্ট যৌক্তিকতাও রয়েছে। ব্যক্তির মরণ আছে, বিশ্বের মরণ নেই। তাই বিশ্বকে উপলব্ধি করা আর মরণহীনকে উপলব্ধি করা এক কথা।)

ব্যর্থতাকে ভয় করবে না। বাঁশির রন্ধ্র দিয়ে যেমন সুর বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি ব্যর্থতার মারফতে প্রাণ সমাজময় ব্যাপ্ত হয়। ব্যক্তির দিক থেকে যা ব্যর্থতা সমাজের দিক থেকে তাই সার্থকতা। ব্যর্থ লোকেরাই সমাজকে ধনী করে তোলে।

বড় বড় আইডিয়ার কথা বাদ দিয়ে আবার নৈর্ব্যক্তিক অনুরক্তির কাছে ফিরে আসা যাক। এ জিনিসটার প্রয়োজন এতো বেশী যে, এ ছাড়া আমরা চলতেই পারিনে। ভাগ্যবানদের জীবনেও মাঝে মাঝে এমন দুঃসময়ের আবির্ভাব হয়, যখন নৈর্ব্যক্তিক অনুরাগ ব্যতীত রক্ষা পাওয়ার আর কোন উপায় থাকে না। দুঃখের দিনে নৈর্ব্যক্তিক অনুরাগই আপনার প্রকৃতিস্থতা বজায় রাখতে পারে। আর কিছু নয়, আর কেউ না। পত্নীর সঙ্গে আপনার মনোমালিন্য চলছে, পুত্র রোগশয্যায় শায়িত অথবা আপনার ব্যবসায়ে মন্দা যাচ্ছে। তখন মন ভরাবার মত যদি কোন শখের কাজ না থাকে তো কে আপনাকে উদ্বেগের হাত থেকে রক্ষা করবে? অথচ উদ্বেগ থেকে রক্ষা না পেলেও নয়। বুদ্ধির পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হলে নিজেকে উদ্বেগমুক্ত রাখতেই হবে। নৈর্ব্যক্তিক অনুরাগের অভাবে লোকেরা কেবল ভেবে ভেবে সারা হয়, কিছুরই কূল-কিনারা করতে পারে না। অতিরিক্ত ভাবনার দরুন কখনো কখনো বুদ্ধি ও কর্মশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। তাই ভাবনা থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করা ভালো। আর তা সম্ভব হয় চিত্তবিনোদক কোন কাজে রত হতে পারলে।

উদারতা সম্বন্ধে যা বলা হলো শোক সম্বন্ধেও তা প্রযোজ্য। শোকে মুহ্যমান হওয়াও ঠিক নয়। অনেকের ধারণা, শোকে অভিভূত হয়ে বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত না হলে ভালোবাসার পরিচয় দেওয়া হয় না। শোকের পাত্র থেকে তারা বেদনার শেষবিন্দুটুকু শুষে নিতে চায়। কিন্তু তা ভুল। শোকের আধিক্য বুদ্ধিভ্রংশ ঘটাতে পারে, আর বুদ্ধিভ্রংশ জীবনের পক্ষে মারাত্মক। তাই শোকের তীব্রতা কমানোর জন্য যে-কোন উপায়ই গ্রহণযোগ্য। দেখতে হবে কেবল উপায়টি হানিকর কি-না। হানিকর বলতে সেই উপায়ই বুঝায় যা চিন্তাকে ভিন্নপথে চালনা না করে চিন্তার সাময়িক অবলুপ্তি ঘটায়। যেমন সুরা, আফিম, কোকেন জাতীয় মাদকদ্রব্য

সেবন। চিন্তার অবলুপ্তি না ঘটিয়ে মনকে ভিন্নপথে চালনা করতে পারে নৈর্ব্যক্তিক অনুরাগ, তাই তার অতো মূল্য। জীবন যদি কয়েকটি কাজে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে তো তা সম্ভব হয় না। কেননা, এই কয়েকটি ব্যাপারই যদি দুঃখের দ্বারা আক্রান্ত হয় তো আশ্রয় নেবার মতো আর কিছুই থাকে না। তাই বিচিত্র কাজে অনুরাগ থাকা ভালো। সজীবতার লক্ষণ হচ্ছে দুয়েকটি আঘাতে মুষড়ে না পড়ে জীবনের প্রতি নব অনুরাগের পরিচয় দেওয়া। যে তা করতে পারে সেই জীবন-প্রেমিক, অপরে নয়।

হাজার তারা সামনে ডোবে—
আসছে হাজার খোঁজ রাখ কি?
শ্যামলিয়ার প্রেমাঙ্গণে
জিন্দা আঁখি। জিন্দা আঁখি।

বিচিত্র অনুরাগীরা কোনদিন জীবনে বিশ্বাসহারা হয় না, বারবার ব্যর্থ হয়েও তারা জীবনকে ভালোবাসে। মৃত্যু তো সামনে পিছনে লেগেই আছে। আমাদের সমস্ত সুখের আকাঙক্ষা সে ব্যর্থ করে দিতে চায়। মৃত্যুর এ প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দিতে না পারলে মনুষ্যত্বের মর্যাদা থাকে না। তাই প্রিয়জনের শোকে অভিভূত না হয়ে জীবনের অনুরাগ অক্ষুন্ন রাখা দরকার। মৃত্যুকে পরাভূত করে যে জীবন বিশ্বময় ছড়িয়ে রয়েছে তাকে স্পর্শ করতে পারলেই শোক দুর্দমনীয় হয়ে উঠতে পারে না। যে ব্যক্তিটি এই মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণকে স্পর্শ করতে পেরেছে সেই বলতে পারে:

মৃত্যু শোকে স্তব্ধ গৃহদ্বারে
প্রাণ অবিনাশী।

মৃত্যুকে পরাভূত করে যে অবিনাশী প্রাণ জেগে ওঠে তা মনে রাখার উপায় হচ্ছে বিচিত্র নৈর্ব্যক্তিক অনুরাগ। অনুরাগকে কয়েকটি ব্যাপারে বেঁধে রাখতে নেই। তাকে রত থাকতে হবে বিচিত্রার অনুসন্ধানে। তাহলেই জীবন প্রাণময় হয়ে উঠবে।

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে জীবনকে প্রফুল্ল রাখা, আর তার উপায়টি হচ্ছে মনের মতো কাজের সংখ্যা বাড়ানো। শখের কাজে জীবন পরিপূর্ণ করুন, মন প্রফুল্ল থাকবে—অবসাদ মুক্ত হবে--অনন্ত প্রাণের পরশে আপনার জীবনে খুশীর দোলা লাগবে। আপনি কেবল জীবনই দেখবেন, মৃত্যু নয়!

চেষ্টা ও বিরতি

প্রাচীনরা জয়গান করলেও আধুনিকদের কাছে মধ্যপন্থার তেমন কোনো মূল্য নেই। নেচে ওঠবার মতো বাণী এটি নয়। নিতান্ত গদ্য ধাঁচের এই উক্তিকে কেউ ভালোবাসতে চায় না। আমার মনে আছে প্রথম যখন এ বাণীটি আমার সামনে উপস্থাপিত হয়, তখন নাক কুঁচকে অসম্মতি জানিয়ে আমি বলেছিলাম: মধ্যপন্থা? সে তো মৃতের আদর্শ, জীবন্তের নয়; কস্মিনকালেও আমি এ আদর্শ গ্রহণ করতে পারব না।—শেষ পর্যন্ত না গেলে কোনো ব্যাপারেই আরাম নেই, তখন এই ছিল আমার ধারণা। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ধারণার পরিবর্তন হতে থাকে, মন উপলব্ধি করতে শুরু করে, সত্য মাত্রই উপাদেয় হবে এমন কোনো কথা নেই এবং এমন অনেক মিথ্যা সত্য বলে গৃহীত হয়েছে আপাত-মধুর হলেও পরিণাম যায় বিষময়। শুদ্ধ উপাদেয়-তার দিকে তাকিয়ে কোনো কিছুকে সত্য বলে গ্রহণ করলে পরিণামে ঠকতে হয়। তাই আপাত-মধুর মিথ্যাকে বর্জন করে আপাত-অমধুর সত্যকে গ্রহণ করাই ভালো। সত্যের মধ্যে ভাণ নেই, তা নিরাভরণ। রং-চঙে পোশাক পরে তা কারো মন ভোলাতে চায় না।

এমনি একটা আপাত-অমধুর বাণী হচ্ছে মধ্যপন্থা। শুনতে ভালো না লাগলেও কথাটা সত্য। চেষ্টা ও বিরতির মধ্যে ভারসাম্য করতে হলে এই মধ্যপন্থার একান্ত প্রয়োজন। উভয় পক্ষেই গোঁড়া সমর্থক রয়েছে। বৈরাগ্যের পক্ষে কথা বলেছেন সাধুসন্ত আর

মরমী ফকীর-দরবেশরা, আর চেষ্টার পক্ষে কর্মবাদী সম্প্রদায়। প্রত্যেকের উক্তিতেই সত্য রয়েছে, কিন্তু কোনোটাই পূর্ণ সত্য নয়। তাই উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা দরকার। সেটা কী করে করা যায়, তা-ই ভেবে দেখবার বিষয়।

প্রথমে চেষ্টার দিকটাই ধরা যাক। আমরা সকলেই সুখ চাই, আর সুখ জিনিসটা প্রয়াসলভ্য। চাওয়া মাত্র তা বেহেশতী মেওয়ার মতো মুখে এসে ঢোকে না। ইচ্ছাময়তার জগৎ পৃথিবী নয়, স্বর্গ। চেষ্টার দ্বারা জয় করে নিতে না পারলে এখানে কাম্যবস্তু লাভ করা যায় না। রোগ-শোক-দারিদ্র্য ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় জগৎ পূর্ণ। এ-সবের সঙ্গে এঁটে উঠতে চাইলে চেষ্টার দরকার। বীরের মতো এ-সবের সম্মুখীন হতে হবে, পালিয়ে গেলে চলবে না। 'বসুন্ধরা বীরভোগ্যা' কথাটা মিথ্যা নয়। উদ্যোগী পুরুষসিংহ না হলে যে লক্ষ্মী ও সরস্বতী কোনোটাই পাওয়া যায় না, এ একেবারে খাঁটি সত্য।

সরল-প্রকৃতি ধনীর ছেলেটি হয়তো সহজেই সুখ পেতে পারে। কেননা, সুখের প্রধানহেতু ধন আর স্বাস্থ্য উভয়ই তার আয়ত্তে, আর রুচির বালাই নেই বলে মানসদ্বন্দ্ব থেকে সে মুক্ত। এ লোকটি যদি দ্বন্দ্বময় জগতের পানে তাকিয়ে বলে : এতো গোলমাল কেন—তো তাতে অবাক হওয়ার মতো কিছুই থাকে না। দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে যার বাস, দ্বন্দ্ব দেখে তো সে অবাক হবেই। কিন্তু আপনার আমার পক্ষে তা শোভন নয়। রূপার চামচ মুখে নিয়ে জন্মায় আর ক'টি লোক? শতকরা নিরানব্বইটি মানুষকেই তো চেষ্টা করতে হয় জয় করে নিতে হয় তার ভাগ্যকে। বাঁচে সেই, যে লড়াই করে প্রতিকূলতার সঙ্গে। পলাতকের স্থান জগতে নেই। স্বাস্থ্যরক্ষা, উপযুক্ত সঙ্গিনী জোটান এবং জুটলে তার অন্তরের অনুরাগটি অক্ষুন্ন রাখা, সমস্ত কিছুর জন্যই চেষ্টা দরকার। চেষ্টা ছাড়া বাঁচা অসম্ভব। সুখ চেষ্টার ফল, দেবতার দান নয়। তা

জয় করে নিতে হয়, আপনা-আপনি পাওয়া যায় না। সুখের জন্য দু'রকম চেষ্টা দরকার : বাইরের আর ভেতরের। ভেতরের চেষ্টার মধ্যে বৈরাগ্যও একটি। বৈরাগ্যও চেষ্টার ফল ; তা অমনি পাওয়া যায় না। কিন্তু বাইরের চেষ্টার মধ্যে বৈরাগ্যের স্থান নেই।

জীবিকার জন্য নর-নারীকে কী হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হয়, তা আর চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর দরকার করে না, যত্রতত্রই তা দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচ্য ফকিরের কথা অবশ্য আলাদা ; ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দ্বারে ঘুরলেই তার দিনের আহারটি এক রকম হয়ে যায়। কিন্তু পশ্চিমে তা অচল। লোকনিন্দার ভয় তো বটেই, অন্য কারণেও। শীতের দেশে ভিক্ষাবৃত্তি চলতে পারে না। শীতে ঠক্ ঠক্ করে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করার চেয়ে ফ্যাক্টরীর উত্তাপে বসে কাজ করা অনেক আরামের ; তাই ভিক্ষাবৃত্তির আলসেমী পশ্চিমে তেমন প্রীতিকর নয়। পশ্চিম বৈরাগ্যধর্মী না হওয়ার এটিও একটি কারণ। তার অবস্থানই তাকে প্রয়াসের তাগিদ দিচ্ছে।

প্রাচ্যের আধ্যাত্মবাদী লোকদের পক্ষে বাঁচার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু হলেই চলে। কিন্তু পাশ্চাত্যে তা সম্ভব নয়। শুধু বাঁচার নয়, কৃতকার্যতার স্বাদও পেতে চায় বলে প্রতীচ্যের লোকদের জীবনধারণের অতিরিক্ত কিছু না হলে চলে না। অর্থ-শক্তিই সেখানে কৃতকার্যতার মাপকাঠি। 'সাক্‌সেস' মানেই অর্থ-প্রাচুর্যের অধিকারী হওয়া। যা-কিছু কর না কেন, বাবা টাকা উপার্জন করা চাই ; নইলে তোমার মূল্য নেই। অর্থের নেশায় পাশ্চাত্য তাই পাগলপারা। এ নেশা যে কত অযৌক্তিক ও ক্ষতিকর, তা সে বুঝতেই পারে না। যদি বুঝতো, তা হলে তার জীবন এমন শ্রীহীন হয়ে পড়ত না। রবীন্দ্রনাথের ভাষা চুরি করে বলা যায়, পশ্চিমের চেষ্টা যেন অপটু দৈত্যের সাঁতার দেওয়ার মতো, তাতে হাঁসফাঁস আছে, কিন্তু নৈপুণ্য নেই। যতটা

জল উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে ততটা এগিয়ে যাওয়া হচ্ছে না। হাত-পা ছোঁড়াকেই সে মনে করছে এগিয়ে যাওয়া।—এখানেই বিরতির প্রশ্ন এসে পড়ে। সকলে চেষ্টা করলেও কতিপয়ের ভাগ্যেই প্রচুর অর্থ জোটে, বেশীর ভাগ লোককেই কুড়োতে হয় ব্যর্থতার ধুলো। অর্থের উপর জোর দিয়ে যে পাশ্চাত্য ভুল করেছে তার প্রমাণ এখানে।

কিন্তু চেষ্টার দরকার আছে। অন্যান্য ব্যাপারের মতো বিয়ের ব্যাপারেও চেষ্টার প্রয়োজন। কখনো পুরুষের পক্ষে, কখনো নারীর পক্ষে। ইংলণ্ডে পুরুষের আর অষ্ট্রেলিয়ায় নারীর প্রয়াসের দরকার হয় না। কেননা ও দু'টা দেশে যথাক্রমে পুরুষ ও নারীর সংখ্যা কম। এখানেও অর্থশাস্ত্রের সেই চাহিদা ও সরবরাহ নীতি খাটছে। সরবরাহ কম ও চাহিদা বেশী হওয়াতেই ইংলণ্ডে পুরুষের আর অষ্ট্রেলিয়ায় মেয়ের মূল্য বাড়ছে। ইংলণ্ডের মহিলা সম্পাদিত পত্রিকাগুলিতে যে 'বর চাই' বিজ্ঞাপনের সংখ্যা বেশী, তার হেতুই এখানে। ও-বিজ্ঞাপন আসলে নারীর সংখ্যাধিক্যের বিজ্ঞাপন। পুরুষের সংখ্যা বেশী হলে, কিন্তু তারা বিজ্ঞাপনের সহায়তা নেয় না, নেয় রিভলবারের। বেশীর ভাগ মানুষই তো এখনো বর্বরতার সীমারেখার উপর দাঁড়িয়ে তাই প্রয়োজনে আদিম বর্বর প্রকৃতির পরিচয় দিতে দ্বিধা করে না। সভ্যতার পলেসতারাটা সামান্য আঘাতেই ধসে যায়। একটি মহামারীর ফলে যদি ইংলণ্ডে নারীর সংখ্যা হ্রাস পায়, তো সেখানকার পুরুষরা পুনরায় হন্যে হয়ে নারীর জন্য দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হবে। গ্যালেলির যুগ আপনা-আপনি আসেনি, একথা মনে রাখা দরকার।

ছেলেমেয়েদের লালন-পালনের জন্যও চেষ্টার প্রয়োজন। সব দেশের মানুষেরই এক অবস্থা: "কচি-কাঁচাগুলি ডাঁটো করে তুলি বাঁচিবার তরে সমান যুঝি।" চেষ্টা ছাড়া কচি-কাঁচাগুলোকে ডাঁটো করে তোলা যায় না। বৈরাগ্যপ্রধান দেশসমূহেই শিশু

মৃত্যুর হার অধিক। ওষুধপথ্য, খাদ্য ও দ্রব্য সব কিছুর জন্যই চেষ্টার দরকার। বস্তুতান্ত্রিক পরিবেশটি সুব্যবস্থিত না হলে বাঁচায় সুখ নেই, আর সেই পরিবেশটির সুব্যবস্থা নির্ভর করছে চেষ্টার উপর। শিশু-মৃত্যুর সংখ্যাবৃদ্ধির একটি কারণ মায়াবাদী উদাসী মনোভাব। শিশুটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হলে যে যত্নের দরকার মায়াবাদী উদাসীরা তার প্রয়োজন হয়তো বোধ করে না। আল্লাহ্‌র বান্দা আল্লাহ্‌ রক্ষা করবেন, এই মনোভাবের গোড়ায় যে মানসিক শিথিলতা, তা যেন মায়াবাদীর মজ্জাগত। তাই তার জীবনে শিল্পের ছন্দ খুঁজে পাওয়া যায় না, তা খাপছাড়া অর্থবিহীন প্রলাপের মতো অবসাদকর। মায়াবাদী জীবনকে অবজ্ঞা করে বলে জীবনও তাকে অবজ্ঞা করে। জীবনের উদ্দেশ্য প্রবৃত্তিকে বাদ দেওয়া নয়, প্রবৃত্তির প্রভু হওয়া। প্রবৃত্তির প্রভু হতে পারে না বলে মায়াবাদীরা জীবনে ধ্বংসের আয়োজন করে।

শক্তি কামনা জীবনের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা। প্রত্যেক জীবন্ত মানুষই চায় শক্তির স্বাদ পেতে। সকলেই যে একই রকমের শক্তি কামনা করে তা নয়। আবেগের বিভিন্নতা অনুযায়ী শক্তির ধরনও বিভিন্ন হয়ে থাকে। কেউ চায় মানুষের কাজের উপর সর্দারি, কেউ চায় তার চিন্তার উপর কর্তৃত্ব আর কেউবা ভালো-বাসে মানুষের আবেগ নিয়ে খেলা করতে। কারো লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় মানুষের বাস্তব পরিবেশ পরিবর্তন, আর কেউবা চায় তার মনকে বদলাতে। জনহিতকর কাজ যারা করে তারা প্রত্যেকেই চায় একটা না একটা শক্তির স্বাদ পেতে। যারা তা চায় না তাদের সম্বন্ধে সাবধান হওয়া দরকার। কেননা, তারা সমাজ-সেবায় অবতীর্ণ হয়, একটা নীচ দিকে নজর রেখে; সমাজ-সেবার নামে অর্থ-উপার্জনই তাদের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। সেটা মারাত্মক। তার চেয়ে শক্তি-স্পৃহা অনেক ভালো। তাতে আত্মিক তৃপ্তিই বড় হয়ে ওঠে, বাস্তব লাভ নয়।

আপনি যদি মানুষের দুর্ভাগ্য দেখে সত্যি-সত্যি অনুভব করেন তো সে-দুঃখ দূর করার জন্য শক্তিও কামনা করবেন। নইলে আপনার দুঃখবোধের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করতে হবে। শক্তি কামনার প্রতি উদাসীন মানুষকে দিয়ে সুন্দর সমাজ গড়ে তোলা যায় না। কেন সে যাবে সমাজ গড়তে? কী তার লাভ? শক্তির স্বাদই তো একমাত্র প্রাপ্তি, যা সমর্থনযোগ্য। সে কামনাই যখন তার নেই, তখন কেন সে যাবে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে?

যে-সমাজের লোকেরা আকাঙক্ষার স্বাদ পায়নি, সে সমাজ তো মৃত সমাজ। তাদের দিয়ে জগতের কি তাদের নিজের কারোরই কোনো লাভ হয় না। তারা জগতের ভারস্বরূপ। বাঁচার সত্যি-কার স্বাদ থেকে তারা বঞ্চিত। আকাঙক্ষাই জীবন। তারি প্রসাদে মহাকালের তুষার শুভ্রতায় সূর্যের রং লাগে। আর আকাঙক্ষার মতো আকাঙক্ষা হচ্ছে শক্তির আকাঙক্ষা। ধন নয়, মান নয়, শক্তিই মানুষের শ্রেষ্ঠ কাম্য। আত্ম-উপলব্ধির শ্রেষ্ঠ সুখ তাতেই। নীটসে যখন বলেন: "সুখ কি? শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে, বাধা সব ভেঙে ফেলা হচ্ছে—এই বোধ।"* তখন ঠিকই বলেন। কাজের সার্থকতা এই উপলব্ধিতে, বাস্তব প্রাপ্তিটা তো উপরি পাওনা।

কিন্তু আকাঙক্ষা একটা বায়বীয় পদার্থ নয়। প্রত্যেক আকা-ঙক্ষারই একটা-না-একটা কর্মরূপ থাকে। যে-আকাঙক্ষা কর্মের মারফতে আত্ম-প্রকাশ করতে চায় না তা মূল্যহীন। চেষ্টার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রতীচ্যের লোকদের বোঝাতে হয় না, তারা তা সহজেই বোঝে। তথাপি প্রাচ্য প্রজ্ঞার গুণগ্রাহী এমন লোকও দেখতে পাওয়া যায়, যাঁরা বৈরাগ্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আমাদের কথা তাঁদের ভালো লাগবে না জানি। তথাপি সত্য কথা বলতেই

* নীটসের বাণী—নলিনীকান্ত গুপ্ত।

হবে। চেষ্টাহীন জীবন মৃতের জীবন, চেষ্টা ছাড়া সার্থকতার মুখ দেখা যায় না। যে-বৈরাগ্যের কথা তাঁরা বলেন, তাও কি চেষ্টার ফল নয়? অতএব চেষ্টাকে মেনে নিতেই হবে। সাধনা মানেই তো চেষ্টা—আকস্মিক, ছাড়া-ছাড়া নয়, ধারাবাহিক চেষ্টা।

কিন্তু সুখের জন্য কেবল চেষ্টারই প্রয়োজন নয়, বৈরাগ্যেরও প্রয়োজন রয়েছে এবং তা কোনো দিক দিয়ে চেষ্টার চেয়ে ন্যূন নয়। বুদ্ধিমান সে-ই, যে অনিবার্য দুঃখকে মেনে নেয়। প্রতিকার-হীন দুঃখে ছটফট করে লাভ নেই। যেখানে কিছুই করবার নেই, সেখানে ছটফট করা তো পাগলামী। মনোযোগ দিতে হবে কেবল নিবার্য দুঃখের প্রতি। সব নিবার্য দুঃখ আবার সমান মর্যাদা পেতে পারে না! জীবন-শিল্পীরা তাই নিবার্য দুঃখের বেলাও শ্রেণীভেদ করে থাকে। যে-দুঃখ সওয়া যায় তার বিরুদ্ধে তারা লড়াই করে না, যেটা সওয়া যায় না তার বিরুদ্ধে করে। এনার্জির মূল্য দেয় বলে তারা তার বাজে খরচ সইতে পারে না। অনেক দুঃখই নত মস্তকে মেনে নিতে হয়, নইলে সুখ পাওয়া যায় না। সামান্য ক্ষতিতেই যারা মেজাজ খারাপ করে তাদের কপালে আগুন। অনবরত দুঃখ সৃষ্টি করে চলা তাদের স্বভাব। প্রয়োজনীয় কাজেও এমনভাবে লাগতে হবে যাতে কৃতকার্যতার চিন্তাটা বড় হয়ে না ওঠে। কেননা, দেখতে পাওয়া গেছে, কৃতকার্যতার চিন্তাটাই শেষ পর্যন্ত কৃতকার্যতার শত্রু হয়ে দাঁড়ায়! নির্লিপ্তভাবে কাজ না করলে কাজের সার্থকতা পাওয়া যায় না। এখানে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার কাছে মাথা নত করার মতো একটা কিছু মেনে নিতে হয়, নইলে শান্তি পাওয়া যায় না, আর শান্তি না পেলে সৃজনীবুদ্ধির ধ্বংসও অনিবার্য হয়ে উঠে। সৃজনীবুদ্ধি চায় আপনি তাড়াহুড়া না করে ধীরে-সুস্থে কাজটি করে যান। কৃতকার্যতার আকাঙ্ক্ষা সে পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। অতিরিক্ত ফল কামনার দরুন যে আবেগ সৃষ্টি হয়, তাতে বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, আর বুদ্ধির

আচ্ছন্নতা কর্মশক্তি লোপ পাইয়ে দেয়। তাই বলে যে ফল কামনা একেবারে ছেড়ে দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। ইচ্ছার বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাওয়া সেও একটা বিরক্তিকর ব্যাপার। ফল কামনার চাইতে যাতে কাজের আনন্দই বড় হয়ে উঠে, সেদিকেই নজর রাখবেন। নইলে কাজটি সম্পন্ন হলেও শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠবে না। কিসের বিরুদ্ধে যাবেন সেটা ভেবে লাভ নেই কিসের পক্ষে থাকবেন সেটাই ভেবে দেখুন। মনকে বিরক্তি ও জ্বালামুক্ত রাখার এই সার্থক উপায়। দুশমনের দিকে না তাকিয়ে দোস্তের দিকে তাকালেই মন খুশীতে ভরে উঠে। জীবন-শিল্পীরা তাই করে; আপনাকেও তাই করতে হবে।

বৈরাগ্য দুই প্রকারের। একটার উৎস নৈরাশ্য আরেকটার অপরাজেয় আকাঙক্ষা। বার বার বিফলতার দরুন যে-লোকটা এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছে যে কিছুই হবার নয়, তার বৈরাগ্য নৈরাশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাতে বড় কিছু নেই, তা ছদ্মবেশী ব্যর্থতা মাত্র। সে চায় তার পরাজিত মনোভাবকে আধ্যাত্মিকতার আবরণে ঢেকে রাখতে। কিন্তু জীবনে পরাজিত হয়ে যদি আপনি বৈরাগ্যের গুণগান করেন তো তাতে লোকের মনে নেশা ধরবে কেন? অন্তরের শূন্যতা ঢাকতে গিয়ে আপনি তাকে অধিকতর প্রকট করেই তুলবেন। বৈরাগ্যের বাণী প্রচার করেও আপনি শান্তি পাবেন না, তীব্র ব্যর্থতাবোধ আপনার চোখে-মুখে লেখা থাকবে। শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার চেষ্টা না করাই ভালো।

অপরাজেয় আকাঙক্ষা মাত্রই উদার ও নৈর্ব্যক্তিক; ব্যক্তিক ও সংকীর্ণ আকাঙক্ষা কোনো দিন অপরাজেয় হতে পারে না। ব্যক্তির জীবনে যা সীমাবদ্ধ, ব্যক্তির জীবনেই তার লয়, অপরের জীবনে তা সার্থক হবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু জাতিগত আকাঙক্ষা, বিশ্বগত আকাঙক্ষা মৃত্যুহীন। তাদের সঙ্গে বুক মিলিয়ে অমরতার স্বাদ পাওয়া যায়। স একটা আত্মিক উপলব্ধির ব্যাপার,

বুদ্ধি দিয়ে তা ভালো করে বোঝা যায় না। বর্তমান ব্যক্তিক স্বার্থকেই যারা একান্ত বলে জানে, তাদের পক্ষে সে স্বাদ পাওয়া কঠিন। মণ্ডূক কূপের ধারণাই করতে পারে, সমুদ্রের নয়। ব্যক্তিগত আকাঙক্ষার শত্রু কত। রোগ-শোক-দারিদ্র্য সব সময়েই হাঁ করে আছে মানুষের আকাঙক্ষাকে গ্রাস করবার জন্যে। তাদের এড়িয়ে চলা দায়। তাই বলে যে জাতীয় বা বিশ্বগত আকাঙক্ষার শত্রু নেই, তা নয়। যথেষ্টই আছে। তবে নৈরাশ্য সেখানে তার সর্বগ্রাসী মুখ ব্যাদন করতে পারে না। হবে, হবে, আমার জীবনে না হলেও অপরের জীবনে তা সার্থক হবেই এমনি একটা স্নিগ্ধ আশ্বাসে আপনি খুশী হয়ে উঠতে পারেন। জাতিগত ও বিশ্বগত স্বার্থকে আত্মীয় করে তোলার এই লাভ। নৈর্ব্যক্তিক কামনার মূল্য এই যে, এর ব্যর্থতায় মানুষের মন মুষড়ে পড়ে না। ব্যর্থতা সত্ত্বেও ভবিষ্যতের পানে তাকিয়ে একটা তৃপ্তি পাওয়া যায়। ঘাবড়াবার কী আছে? আমি তো আর আমার জয় কামনা করিনে, জাতি ও মানুষের জয় কামনা করি; আজকে না-হয় তা না হল, একদিন-না-একদিন হবেই—এমনি বিশ্বাসের বলেই মানুষ নৈরাশ্য-বিজয়ী হতে পারে। এই আশাবাদীদের জীবনে তাড়াহুড়া নেই তারা অপেক্ষা করতে জানে। ধীরে-সুস্থে কাজ করে যাওয়া তাদের স্বভাব। অসহিষ্ণু ব্যস্তবাগীশদের তারা সইতে পারে না। তাদের তারা বলেঃ

নিঠুর গরজী, তুই মানসমুকুল ভাজবি আগুনে?
তুই ফুল ফুটাবি বাস ছুটাবি সবুর বিহনে?
দ্যাখ না আমার পরম গুরু সাঁই
সে যুগযুগান্ত ফুটায় মুকুল তাড়াহুড়া নাই।

বিরতি সাধনা এই সহিষ্ণুতার সাধনা, আত্মকর্তৃত্বের সাধনা। প্রবৃত্তিকে মেরে ফেলা নয়, স্ববশে রাখাই তার উদ্দেশ্য।

ব্যক্তিগত আকাঙক্ষা কাজের মধ্যে একটা ব্যস্ততা এনে দিয়ে সমস্ত প্রয়োজনকে ভণ্ডুল করে দেয়। তাই কাজের সঙ্গে ব্যক্তিগত আকাঙক্ষার যোগ যত কম থাকে, ততই ভালো। যে-লোকটি বিজ্ঞানে উন্নতির দিকে তাকিয়ে বিজ্ঞান-অনুশীলন করে, ব্যর্থতা তাকে মুষড়ে ফেলতে পারে না। ভবিষ্যতের পানে তাকিয়ে সে খুশী থাকতে পারে। কিন্তু যে-লোকটির বিজ্ঞান-চর্চার উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত উন্নতি বা গৌরব লাভ, সে কখনো এমন প্রসন্নতার পরিচয় দিতে পারে না। ব্যর্থতায় সে ভেঙ্গে পড়ে। বিজ্ঞান-অনুশীলন সম্বন্ধে যা বলা হল, সংস্কার-সাধনা সম্বন্ধে তা সত্য। আমার গৌরবের জন্য নয়, সমাজের উন্নতির জন্যই আমি কাজ করে যাচ্ছি, একথা ভাবতে না পারলে নৈরাশ্যের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন। নৈরাশ্যের প্রতিষেধক নৈর্ব্যক্তিকতা, এ কথাটা মনে রাখা দরকার।

কতকগুলি ব্যাপার এমন প্রয়োজনীয় যে, সেখানে বিরতি চলতেই পারে না যেমন জীবিকা-অর্জন। জীবিকা-অর্জনের ব্যাপারে বৈরাগ্য অবলম্বন করলে জীবন নিয়ে টানাটানি। কোনো কোনো ব্যাপারে আবার বিরতি সহজেই চলতে পারে। সেখানে বিরত না হওয়া বোকামীর হদ্দ। জীবনের উদ্দেশ্যগুলি দু'ভাগে ভাগ করা যায়ঃ প্রধান আর অ-প্রধান। প্রধানগুলির বেলা বিরতি না চললেও অ-প্রধানগুলির বেলা চলতে পারে। সেখানে সংযমের পরিচয় না দেওয়া অন্যায়। কতগুলি আশা ছাড়তেই হয়, নইলে নৈরাশ্যের দংশন থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। মনে করুন, আপনি একটা বড় কাজে হাত দিয়েছেন। আপনার উচিত তাতে ডুবে থাকা। বড় ব্যাপারে সার্থকতা পেতে হলে ছোট ব্যাপারে ব্যর্থতা সহ্য করতেই হবে, নইলে মূল্যবোধের পরিচয় দেওয়া যাবে না। মুড়োটাও চাইব, লেজাটাও ছাড়বো না, এমন কথা বললে আবদারেরই পরিচয় দেওয়া হয়, বুদ্ধির নয়। জীবনে ছোটখাটো

উপদ্রব থাকবেই। তাদের সম্বন্ধে যত কম ভাবা হয় ততই ভালো। ছোটখাটো বেদনার তীর হজম করতে না পারলে বড় ব্যাপারে সার্থক হতে পারবেন না। সাহিত্যিক সার্থকতা আর আর্থিক উন্নতি, দু'টিকেই এক সঙ্গে কামনা করা ভুল। জীবনে এমন অনেক দুঃখ আছে বাদলা-দিনের অসুবিধার মতো যাদের সহজেই অবজ্ঞা করা যায়। সেখানে মুখ ভারি করা অন্যায়।

ছোটখাটো দুঃখে জীবন পূর্ণ। সেগুলি নিয়ে খিটমিট করলে জীবনের স্বাদই নষ্ট হয়ে যায়। তবু এমন এক জাতের লোক আছে যাদের বরদাস্ত করবার ক্ষমতাটা কম। ছোট-বড় নির্বিশেষ সব রকম দুঃখেই মুষড়ে পড়ে বলে না-খোশ মেজাজের পরিচয় দেওয়া তাদের স্বভাব হয়ে দাঁড়ায়। কি রকম ছিঁচ-কাঁদুনে স্বভাবের হয়ে পড়ে তারা। 'ভালো লাগছে না' এই নোটিশটা হামেশাই তাদের চেহারায় লটকানো থাকে। 'কী হবে ভাই আমার দুঃখের কথা বলে আমার দুঃখের কি আর শেষ আছে?' যতবার দেখা হবে ততবারই তারা এভাবে কথা শুরু করবে। পান থেকে চুন খসলে তারা সইতে পারে না। রান্নাটি ভালো না হলে বাবুর্চি অথবা গিন্নীকে মন্দ বলবে, আর লণ্ড্রিতে যথাসময়ে কাপড়টি না পাওয়া গেলে যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করবে। রাগ, রাগ, রাগ। রাগের আগুনে তারা জ্বলে পুড়ে মরে। রাগ দেখাতে না পারলে পুরুষালিই তাদের বজায় থাকে না। সত্যকার বুদ্ধিমান লোকদের কিন্তু ভিন্ন ধারা। অযথা রাগের সমর্থক তারা নয়। কেননা, তারা জানে তাতে যে শক্তি খরচ হয় ভালো করে কাজে লাগলে তা দিয়ে একটা রাজ্যই জয় করা যায়। এনার্জির মূল্য তারা বোঝে। তাই তার সংরক্ষণের দিকে তাদের কড়া নজর।

কিন্তু সেটাও সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। বিরতির দীক্ষা না নিলে তাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন। জীবন-শিল্পীর কাছে

তাই তার এত মূল্য। জীবনের সব ব্যাপারকে যারা সমমূল্য মনে করে, তারা শিল্পী নয়, সাধারণ ব্যক্তি। তাদের দ্বারা জীবনের উন্নয়ন হয় না, অবনয়ন হয়। মূল্যভেদ তথা মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন বলে কোনো কোনো ব্যাপারে উদাসীন থাকার প্রয়োজনীয়তা তার কাছে অনিবার্য হয়ে ওঠে। বড় ও নৈর্ব্যক্তিক ব্যাপারে অনুরক্ত হলেই ছোট ও ব্যক্তিক ব্যাপারে বিরতির পরিচয় দেওয়া সহজ হয়। প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়, সাধারণ লোকেরা যে-সকল ব্যর্থতায় ছটফট করে সাধকরা তা সহজেই সহ্য করে যায়। তার কারণ কি? সাধকদের চামড়া গণ্ডারের চামড়া অথবা তারা সহিষ্ণুতার প্রতীক বলেই যে তা সম্ভব হচ্ছে তা নয়। তাদের দুঃখবোধ কারো চেয়ে কম নয়, হয়তো অনেকের চেয়েই বেশী। কিন্তু কোনো কোনো ব্যাপারে গভীর নিমগ্নতা থাকার দরুন তারা সব দুঃখে কাতর হয় না, একটা দিকের উপর নজর দেওয়াতে আরেকটা দিক আপনা-আপনি অবশ হয়ে যায়।

উদ্বেগমুক্ত মানুষটি ভুবনব্যাপী যে খুশীর খেলা দেখতে পায় উদ্বেগসম্পন্ন মানুষটির চোখে তা পড়ে না। সে কেবল দুঃখই দেখে, সুখ নয়। সারা পৃথিবী যেন তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, এমনি মনোভাব নিয়ে সে তটস্থ থাকে। একবার উদ্বেগমুক্ত হতে পারলেই তার আকাশে দুঃখের বর্ষা কেটে গিয়ে সুখের শরৎ হেসে উঠবে। তখন যে লোকটির অবস্থিতি পূর্বে তাকে পীড়া দিত সে লোকটিই তার খুশীর খোরাক যোগাবে। মনোভঙ্গীর পরিবর্তনে সমস্ত জগতটাই পরিবর্তিত হয়ে যাবে। পৃথিবীটা আসলে মানুষের মনের প্রতিবিম্ব। মনের প্রতিরূপই বাইরে দেখা যায়।

প্রত্যেক সভ্য মানুষের অন্তরেই নিজের সম্বন্ধে একটা ছবি থাকে। প্রত্যেকেই মনে করে জীবন-নাট্যের একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় সে অবতীর্ণ হতে এসেছে, সে কারো চেয়ে কম নয়! কেউ নিজেকে দেখে রাজার মতো, কেউ বিদ্রোহীর মতো, কেউ বা

জ্ঞানী পণ্ডিতের মতো। এই ছবির একটুখানি ব্যত্যয় ঘটলেই মন হাহাকার করে ওঠে: হায় হায়, আমার সমস্ত চেষ্টা ভণ্ডুল হলো, কী পোড়া কপাল আমার!—এই ব্যর্থতাবোধের প্রতিষেধক হচ্ছে একটার জায়গায় অনেকগুলি ছবি রাখা এবং স্থান-কাল-পাত্র বুঝে ছবি বিশেষের মতো হতে চেষ্টা করা। ছবিটি যদি হাস্যকরও হয় তো তাতে ক্ষতি নেই, বরং তাতেই লাভ। কেননা, মন হাল্‌কা করবার এতো বড় দাওয়াই আর নেই। বৈচিত্রের স্বাদ পাওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে বিচিত্র পথে চলা। নিজেকে সব সময় বিয়োগান্ত নাটকের নায়করূপে দেখা ভুল। তাতে রসিকতাবোধ নষ্ট হয়ে যায়। তার মানে এ নয় যে, সবসময় নিজেকে কমেডির ক্লাউন' রূপে দেখবেন। না, তাও নয়। ভাঁড়ামি ও চরিত্রনিষ্ঠা (ট্র্যাজেডির গোঁড়ায় চরিত্রনিষ্ঠা) উভয়ের স্বাদ না পেলে জীবন বিস্বাদ হয়ে যায়। জীবননাটিকার বিচিত্র ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা এখানেই। জীবন-শিল্পীরা তাই সব কাজেই হাত লাগায়। তাদের মুখ্য কাজ থাকে দু'একটি, গৌণ কাজ থাকে অসংখ্য। এই অসংখ্য গৌণ কাজে হাত দেওয়ার উদ্দেশ্য নবপ্রাণের আমদানী। নবীনতাকে উপলব্ধি করার এই সার্থক উপায়। সকলের মনের মানুষ হতে হলে এক ধরনের মানুষ হলে চলে না, অনেক রকম মানুষ হতে হয়।

কর্মবাদীরা মনে করে যে, একটুখানি বিরতি, সামান্যতম রসিকতা কর্মীর শক্তি ও সংকল্প টলিয়ে দেয়। কিন্তু তা ভুল। তাতে কাজের ক্ষতি না হয়ে বরং লাভই হয়। জগতে বড্ড বেশী কাজ, আর বেশীর ভাগ কাজই অকল্যাণের বাহন। তাই কাজ কমে গেলে জগতের লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। একটুখানি বিরতি, একটু-খানি ভাবনা তথ্যের সমঝদারির জন্য এতো প্রয়োজনীয় যে, তা ছাড়া কোনো কাজই সুনির্বাহিত হতে পারে না। কাজের মাঝে মাঝে অবসর থাকা দরকার। অবসর না দিয়ে ব্যস্ততা

সহকারে কাজ করলে কাজও পণ্ড হয়, মনও বিগড়ে যায়। তীর না থাকলে যেমন স্রোতোধারায় ছন্দ জাগে না, বিরতির বাঁধন না থাকলে কর্মধারাও তেমনি ছন্দোসুষমাহীন হয়ে পড়ে।

আবার বলি: দুঃখের বিষদাঁত ভাঙার উপায় দুঃখকে মেনে নেওয়া। সকল দুঃখের সঙ্গে লড়াই করা ঠিক নয়। কোনো কোনো দুঃখকে মেনে না নিলে সুখ পাওয়া যায় না। কর্মবাদীরা একথা বুঝতে পারে না বলে বিরতির কোনো মূল্য দিতে চায় না। কিন্তু তা ভুল। জীবনে বিরতির স্থানও আছে এবং তা কোনো দিক দিয়ে কাজের চেয়ে ন্যূন নয়। চেষ্টা ও বিরতি এ দু'য়ের মধ্যে কখন কোন্‌টা গ্রহণ করতে হবে, সেটা ভালো করে জানাই জীবন-শিল্পের ভিত্তি।

জীবন-গোলাপে কাঁটা ও পাঁপড়ি উভয় আছে। আপনার দৃষ্টি কোন্ দিকে যাবে সে আপনিই জানেন। সুখ-প্রিয় হলে পাঁপড়ির দিকে তাকাবেন, দুঃখ-প্রিয় হলে কাঁটার দিকে। বেশীর ভাগ লোকই যে কাঁটার দিকে তাকায়, তার কারণ সুখ তারা চায় না, অথবা আরও সত্য করে বলতে গেলে, সুখ কি চিজ তা তারা বুঝতে পারে না। পারলে না-হক ছোটখাটো অসুবিধার জন্য কান্না জুড়ে দিত না।

তাই বলে যে আপনি কাঁদবেন না, তা নয়। নিশ্চয়ই কাঁদবেন, পরের জন্য না কাঁদলে সুখ পাবেন কি করে? পরের জন্য কাঁদলেই তো চিত্ত সজীব হয়। নিজের জন্য কাঁদলে কঠিন হয়ে পড়ে। গল্প-কাহিনী পড়ে যে আমরা পরের জন্য কাঁদি তা তো এই নিজের চিত্তের সজীবতার স্বাদ পাওয়ার জন্যই।

দুঃখ-প্রেমিকরা সাধারণতঃ কাঁটার দিকেই লক্ষ্য রাখে। সুখ-প্রেমিকরা পাঁপড়ির দিকে। 'দুঃখ-প্রেমিক' কথাটা শুনেই হয়তো চমকে উঠে ভাববেন: এ আবার কেমন কথা, মানুষ আবার দুঃখের প্রেমে পড়ে নাকি? পড়ে বই কি? নইলে মানুষ মানুষের

কাছ থেকে বেশী কামনা করত না এবং প্রতিযোগিতার অনুশীলন থেকে বিরত থাকতো। সত্যকার সুখ-প্রেমিকরা কোনো দিন মানুষের কাছ থেকে বেশী কামনা করে না। নিজের সুখের দিকে তাকিয়ে তারা এখানে বিরতির পরিচয় দেয়। বেশী আশা করলে যে বিড়ম্বনার দুঃখ পেতে হয় সে সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ সচেতন।

মানুষের কাছ থেকে বেশী কামনা করা সুখের অন্তরায়, এ-কথাটা মনে রাখলে বিরতি আপনা-আপনিই এসে যায়, চেষ্টা করে আনতে হয় না। সুখকে আমাদের আচরণের নিকষমনি করে তুললে অনেক অন্যায় থেকেই মুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু তা আমরা করিনে, তাই সুখও পাইনে। সুখের জন্য সাধনার দরকার, আর বিরতি সে সাধনার অন্যতম অঙ্গ।*

* ইংরেজির অনুসরণে।

সুখী মানুষ

সুখ অংশত নির্ভর করে বাইরের অবস্থার উপর; আর অংশত ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক গঠনের ওপর। এই প্রবন্ধে যে আমরা ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক গঠনের দিকেই তাকাচ্ছি, অবস্থার দিকে নয়, সে-কথা পূর্বাহ্নেই বলে রাখছি। সুখ সৃষ্টির এই দিকটা, অর্থাৎ ব্যক্তিমনের দিকটা, বস্তুত না হলেও, নীতিগতভাবে খুব সোজা। সুখী সে-ই যে আত্মনিমগ্নতামুক্ত হয়ে বাইরের দিকে তাকাতে পারে। বাইরের আহ্বানে যখন মন সাড়া দেয় তখনই আমরা সুখী। অনেকের মতে একটা বিশ্বাসের অধীন না হলে সুখ পাওয়া যায় না, আবার অনেকের ধারণা দুঃখের গোড়ায় রয়েছে অতিমননশীল-তাজাত মানসিক জটিলতা। কিন্তু এই উভয় মতই অগ্রাহ্য। দুঃখের গোড়ায় অবিশ্বাস নয়. অন্য কিছু; আর মানসিক জটিলতাকে রোগের নিদান মনে না করে, লক্ষণ মনে করাই ভালো।

সুখের জন্য কয়েকটি জিনিসের একান্ত প্রয়োজন আর সে জিনিসগুলি অত্যন্ত সরল। খাদ্য, বাসস্থান, স্বাস্থ্য. ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা, সমশ্রেণীর লোকদের শ্রদ্ধা, এসব সুখের প্রাথমিক প্রয়োজন। কিন্তু এসব হলেই যে লোকটি সুখী হবে তা জোর করে বলা যায় না। এমন অনেক মানুষ রয়েছে এসব থাকা সত্ত্বেও যারা সুখী নয়; আবার এসবের অভাব সত্ত্বেও সুখী—এমন মানুষও দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এরা আমাদের আলোচনার বাইরে, কেননা এরা অসাধারণ মানুষ. আর অসাধারণদের নিয়ে নয়, সাধারণ মানুষ নিয়েই আমাদের আলোচনা।

বাস্তব সুবিধা থাকা সত্ত্বেও যারা দুঃখী তাদের দুঃখের গোড়ায় রয়েছে মানসিক অসামঞ্জস্য. অসামঞ্জস্যের গোড়ায় আত্মকেন্দ্রিকতা। নিজের সম্বন্ধে অধিক ভাবা হয় বলেই মানুষ সহজতার স্বাদ পায় না। ঘেয়ো কুকুরের মতো কেবল নিজের ক্ষত বা দুঃখের দিকে তাকিয়ে থাকলে বিশ্ব চোখের সম্মুখ থেকে সরে যায়। সে-দিন মানুষের দুর্দিন ; সুখের পরিপূর্ণ আয়োজন থাকা সত্ত্বেও সেদিন তার সুখপ্রয়াস ব্যর্থ হয়। মনে হয় সমস্ত ভোগের বস্তুতে কে যেন বিষ মিশিয়ে দিয়েছে। আত্মচিন্তার কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্বের পানে তাকালেই এ-অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, নইলে মুক্তি নেই। এই নিষ্ক্রমণের কালই মানুষের সুদিন। সেদিন আমরা বিশ্বের মুখোমুখী হয়ে বলে উঠি :

"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি যেন করিছে কোলাকুলি।"

হৃদয়ের বাতায়ন খুলে দিয়ে বিশ্বের মুখোমুখী হয়ে বসতে পারার এই যে আনন্দ এর তুলনা নেই।

আত্মচিন্তার কারাগারে বন্দী হলে এই সুখ পাওয়া যায় না, অথচ আমরা সকলেই সেখানে বন্দী হতে ভালোবাসি। কী ভুল! ঘৃণা বিদ্বেষ, পাপচেতনা. আত্মপ্রশংসা, আত্মগ্লানি এসব কারাগার সদৃশ একথা বুঝতে পারে না বলেই মানুষ এদের খপ্পরে পড়ে নিজের সর্বনাশ ঘটায়। এসবের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্রী পাপ হচ্ছে ভয়। পাছে ভেতরের ব্যাপারটা বেরিয়ে পড়ে এই ভয়ে মিথ্যার সুন্দর আবরণে আমরা সত্যকে ঢেকে রাখতে চাই। কিন্তু সে আবরণ এতো সূক্ষ্ম যে সমালোচনার একটু ছোঁয়াতেই তা ছিঁড়ে যায়। তখন আমাদের অসহায়তার আর অন্ত থাকে না, ছিন্নবস্ত্র শীতার্ত মানুষের মত ঠকঠক করে কাঁপতে থাকি। ভয়ের ক্ষতিকে যারা ডরায় না এই অসহায়তাবোধ থেকে তারাই মুক্ত। প্রথম থেকেই কঠিনতার শিক্ষা পেয়েছে বলে তাদের আর মিথ্যার আবরণ

পরে আত্মরক্ষা করতে হয় না, সমালোচনা সহিষ্ণুতা তাদের মজ্জাগত হয়ে যায়। আত্মবিশ্বাসের অভাব থেকেই ভয়ের জন্ম। 'পাছে লোকে কিছু বলে' মনোভাবটা তাদেরই, কাজটার সততা সম্বন্ধে যারা নিঃসন্দেহ হতে পারেনি।

(ধরুন, আপনি কোনো মেয়েকে ভালোবাসেন, কিন্তু ভালোবাসা যে সত্যি-সত্যি ভালো জিনিস সে সম্বন্ধে সন্দেহাতীত হতে পারেননি। তখন লোকের চোখে-মুখে আপনি দেখবেন শুধু আপনার কাজের সমালোচনা, মনে হবে সকলেই আপনার ব্যাপারটা নিয়ে কানাঘুষা করছে। এভাবে বিকৃত চিন্তার অনুশীলনের দরুন আপনি ক্রমশঃ ভেতরমুখো হয়ে পড়বেন এবং পৃথিবীর বৈচিত্র্য আপনাকে আর উজ্জীবিত করতে পারবে না। আপনি অসুখী হয়ে পড়বেন। ভালোবাসার ভালত্ব সম্বন্ধে যারা নিঃসন্দেহ হতে পেরেছে তাদের কিন্তু এমন দুর্ভোগ ভুগতে হয় না, সহজেই তারা বিশ্বের দিকে তাকাতে পারে।)

আত্মকামী আবেগের ত্রুটি এই যে, বৈচিত্র্যহীন বলে তা দিয়ে জীবনের সমৃদ্ধি হয় না। শুধু নিজেকেই যে ভালোবাসে তার ভালোবাসায় কোন দিন ঐশ্বর্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। পাপচেতনাও এক প্রকারের আত্মকাম। শুধু নিজের সম্বন্ধে ভাবা হয় বলে পাপসচেতন ব্যক্তি কোন দিন বহুভঙ্গিম জীবনের স্বাদ পায় না। পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে তার নিষ্পাপ থাকা, তার বাড়া আর কিছুই নেই—একথা ভেবে নিজেকে সংকুচিত করে রাখার দরুন বিশ্বপ্রাণের স্পর্শে তার জীবন ভরাট হয়ে ওঠে না। এই আত্মনিমগ্নতা, এই কর্মবৃত্তি, এই বিশ্ববর্জিত একাকিত্ব, এ যে মুক্তি নয়—বন্ধন, একথা হৃদয়ঙ্গম করতে না পারলে জীবন বরবাদ হয়ে যায়। কবির মুখে তাই শুনতে পাই:

"বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
আমি তবু বসে রব মুক্তি সমাধিতে?"?

(বিশ্ববিমুখ হয়ে শুধু নিজের দিকে তাকালে জীবন অসুন্দর হয়ে পড়ে। শুধু 'আমি' 'আমি' করা আর কারাগার রচনা করা এক কথা। অমোদের জীবন রচনায় প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে। সে অধিকার সকলকে দিতে হবে। আলো-হাওয়া, ফুল-পাখী, তরুলতা, বিচিত্র চরিত্র নরনারী প্রত্যেকের হাতে জীবনের ইমারতটি তৈরী না হলে তা পূর্ণতা পায় না। তাই দ্বার খোলা রাখা দরকার।)

বিশ্বমুখীনতাই সুখ। বিচিত্র অনুরাগ, মুক্ত প্রেম যে প্রবাহ সৃষ্টি করে তাতে স্নাত না হলে সুখ পাওয়া যায় না। ভালোবাসা বিশ্বমুখীন বলেই সুখের উপায়। একজনের অন্তরে একটু ঠাঁই করে নেওয়া, এর চেয়ে বড় সুখ আর কী হতে পারে? কিন্তু সেটাও সহজ ব্যাপার নয়। ঠাঁই পেতে হলে আগে ঠাঁই দিতে হয়। ভালবাসা না দিলে ভালোবাসা পাওয়া যায় না। কিন্তু দিলেই পাওয়া যাবে, এই সচেতন বুদ্ধির তাগিদে যদি ভালো-বাসতে যান তো ভুল করবেন। ব্যাপারটা স্বতঃস্ফূর্ত না হলে আপনি অপর পক্ষের সাড়া পাবেন না। ব্যাংকে টাকা জমানোর মনোবৃত্তি আর ভালোবাসার মনোবৃত্তি কখনো এক নয়। হিসেবী বুদ্ধি নিয়ে ভালোবাসতে গেলে আপনার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। ইংরেজি 'লভ' আর বাংলা 'লাভ কোনদিন এক সঙ্গে যায় না। 'লাভের' খেয়াল থাকলে 'লভ' ব্যর্থ হয়ে যায়, মনে রাখবেন।

তাহলে আত্মচিন্তার কারাগারে অবরুদ্ধ মানুষটি কী করবে? নিজের দুঃখের কারণ অনুসন্ধানে রত থাকলে সে কারাগারই রচনা করবে। নিজের কথা ভেবে-ভেবে সে হয়রাণ হবে, কিন্তু তাতে লাভ হবে না কিছুই। তাহলে কি মুক্তির উপায় নেই? নিশ্চয়ই আছে। তবে তা আয়াসসাধ্য, বিনা চেষ্টায় পাওয়া যায় না। ভেতরমুখো হওয়ার কারণ যদি হয় পাপসচেতনতা তো নিজেকে বোঝান: ও জিনিসটা ভালো নয়, ওতে ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই;

নিরানন্দ নিষ্প্রভ জীবন নিয়ে আত্মিক কি জাগতিক কোনপ্রকার সার্থকতাই পাওয়া যায় না।—বারবার বোঝানোর ফলে আপনার অচেতন মনও সচেতনের কথায় সায় দেবে এবং পরিণামে পাপ-চেতনামুক্ত হয়ে আপনি সহজ হতে পারবেন। তখন বিশ্বব্যাপারে অনুরাগী হওয়া আপনার পক্ষে আর অসম্ভব হবে না, আর বিশ্বানুরাগ আপনার অস্তিত্ব সুখময় করে তুলবে।

আত্মকরুণার কূপ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়ও এ-ই। নিজেকে ভালো করে বোঝান, আপনার অবস্থা সত্যি-সত্যি এতো শোচনীয় নয় যে বসে বসে কাঁদবেন। আপনার মতো, আপনার মতো কেন, আপনার চেয়ে বহুগুণ দুঃখী মানুষও যখন হেসে-খেলে বেড়াচ্ছে, সূর্যের আলো উপভোগ করছে, তখন আপনার আঁধারে মুখ ঢেকে গুম হয়ে থাকার কোন কারণ থাকতে পারে না। না, কাঁদবার কিছুই নেই। এই সূর্যোকরোজ্জ্বল পৃথিবী আপনাকেও অভিনন্দন জানায়, বন্ধুর মতো একথা নিজেকে বোঝান, দেখবেন আপনার নির্জ্ঞান আপনার কথায় সায় দেবে আর সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীও আপনার পানে চেয়ে হেসে উঠবে। সে হাসিই আপনার প্রাণ।

বাইরের দিকে তাকান, সেখানেই সুখ। ভিতরের দিকে শুধু অন্ধকার—ভয়। ভয় দুর করতে পারেন সাহসের অনুশীলন করে। কিন্তু মুশকিল এই যে, সাহসের চর্চাটা এখন সীমাবদ্ধ। শারীরিক সাহসেরই মূল্য দেওয়া হয়; মানসিক কি নৈতিক সাহসের নয়। নিজের সম্বন্ধে সত্য কথাটা যদি বলে ফেলেন তো লোকে আপনার পানে চেয়ে হাসবে—এই ভয়ে আপনি সংকুচিত। কিন্তু তা ঠিক নয়। এই দুর্বলতা থেকে মুক্তি না পেলে আপনাকে সারা জীবন অভিনয় করে যেতে হবে, আর অভিনয় পীড়াদায়ক। শারীরিক সাহসের মতো নৈতিক সাহসেরও চর্চা করতে হয়, আর তার উপায় হচ্ছে প্রত্যহ নিজের সম্বন্ধে অন্ততঃ একটি অপ্রিয়

সত্য সয়ে যাওয়া। তাহলেই নিজেকে সহজে গ্রহণ করতে পারবেন এবং অনর্থক মুখোশ পরার প্রয়োজন বোধ করবেন না। সেটা হবে আপনার জন্য একটা মুক্তি। অভিনয় করার দায় থেকে রেহাই পাবেন বলে আপনি সহজতার স্বাদ লাভ করবেন। পৃথিবী যখন কেবল শ্রেষ্ঠদের জন্যই নয় সাধারণ লোকের জন্যও, তখন আর অভিনয়ের কী প্রয়োজন? সত্যপ্রীতির তাগিদে নিজেকে চালিয়ে নিলে ভয়ের শেকল আপনি খসে পড়বে, আর ভীতি-মুক্তি নিজেই একটা আনন্দের ব্যাপার। সূর্যের আলোর অভিনন্দন বীরদের জন্যই, কাপুরুষদের জন্য নয়।

আত্মকেন্দ্রিকতামুক্ত হওয়ার পর বাইরের কোন ব্যাপারে আপনি রত হবেন তা ভেবে দেখতে হবে না, আপনার প্রকৃতি ও শিক্ষাই তা আপনাকে বাতলে দেবে। 'টিকিট সংগ্রহ করলেই সুখ পাওয়া যাবে, অনেকেই তাতে সুখ পেয়েছে,' এমনটি ভাবলে ভুল করবেন। প্রাণের তাগিদেই চলবেন, মস্তিষ্কের তাগিদে নয়। মস্তিষ্কের তাগিদে চললে প্রাণপুরুষ অতৃপ্ত থেকে যাবে, আর সেটা হবে মারাত্মক। কিসে আপনি সহজে আকৃষ্ট হবেন তা জোর করে বলা যায় না। তবে আত্মকেন্দ্রিকতামুক্ত হলে একটা-না-একটা কাজে আপনি মজা পাবেনই, একথা এক রকম হলফ করেই বলা যায়। আপনার মুক্তি যে কাজে সে-কাজ আপনাকে টেনে নেবেই, ভয় নেই! তবে একটা শর্ত আছে: আপনাকে সত্যি-সত্যি সুখ কামনা করতে হবে, অর্থাৎ অর্থ, প্রশংসা, প্রতিপত্তি ইত্যাদির দিকে না তাকিয়ে সত্যিকার সুখের দিকেই তাকাতে হবে। নকল দেবতাদের নয়, আসল দেবতারই পূজা দেওয়া দরকার।

সৎজীবন আর সুখী জীবন প্রায় এক জিনিস। অসতেরা কোন দিন সুখ পায় না। তাই প্রাচীনপন্থী নীতিবিদরা যখন সৎ জীবনের গুণকীর্তন করেন তখন তাঁদের কাছে মাথা নত করতে হয়। কিন্তু একটা জায়গায় তাঁরা ভুল করেন, আত্মত্যাগের গুণকীর্তন

করেন তাঁরা অত্যন্ত বেশী। আত্মত্যাগ নয়, আত্মসমৃদ্ধিই জীবনের উদ্দেশ্য। আর তা হয় জগতের উপভোগে, জগৎ বর্জনে নয়। আত্মত্যাগবাদী আর জীবন-রস-রসিকের নীতি দৃশ্যতঃ এক হলেও আসলে এক নয়। মানুষের হিতকামনা উভয়েরই উদ্দেশ্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে বিস্তর মনস্তাত্ত্বিক ব্যবধান। আত্মত্যাগ-বাদীর কাজে একটা আত্মনির্যাতনের ভাব থাকে, রসিকের কাজের মতো তা স্বচ্ছন্দ আর সাবলীল নয়। কেননা, দ্বিতীয় দল কাজ করে প্রাণের তাগিদে, আনন্দ পায় বলে, আর প্রথম দলের কাজের পশ্চাতে থাকে নীতির তাগিদ। আনন্দ নয়, প্রাণ নয়, নীতির ইজ্জত রক্ষাই তাদের কাছে বড় হয়ে ওঠে। কাজটা যতই কঠিন হোক না কেন, তা আমাকে করতেই হবে, কেননা, তা নীতি সমর্থন করে, আর আমি নীতিবান—এরূপ ভাবা হলে কাজটি আর প্রীতিপ্রদ হতে পারে না।

কাজের গোড়ায় রসসিঞ্চন করে ভালোবাসা। ভালোবাসাহীন কাজ নীরস ও নিষ্প্রাণ।

কর্তব্যবাদী প্রাচীনপন্থী নীতিবিদদের সঙ্গে সুখবাদী নব-নীতি-বিদদের পার্থক্য এই যে, প্রাচীনপন্থীরা মনের ওপর তেমন জোর দেন না, কাজের ওপর দেন। মন চুলোয় যাক, কাজটা হলেই তো হল, খামখা মন-মন করে কী লাভ—এমনি তাদের মনোভাব হয়ে দাঁড়ায়। মনের অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে কাজের তাৎপর্যও বদলে যায় তা তাঁরা বুঝতে পারেন না। তাই মনের অভাবের দরুন তাদের কাজে লাবণ্য ফোটে না, তা নিতান্ত যান্ত্রিক ও নীরস হয়ে পড়ে। প্রাণের তাগিদে নিমজ্জমান শিশুকে রক্ষা করতে যাওয়া আর নীতির তাগিদে রক্ষা করতে যাওয়া উভয়ের মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক। ছেলেটিকে রক্ষা করতে গিয়ে যদি আপনি ভাবেন: অসহায়কে রক্ষা করা পুণ্যের কাজ, তাতে আল্লাহ্ খুশী হন, কোরান-হাদিসেও তা-ই লেখে—তো

আপনার কাজের তেমন মূল্য থাকবে না, মানুষ হিসেবে আপনি অনেক নীচে নেমে যাবেন। নীতিবাদীর কাছে কাজটাই বড়, প্রাণবাদীর কাছে প্রাণের সাড়া। প্রাণবাদী বলে :

"ঐ যে কান্না ও যে প্রাণের কাছে প্রাণের আহ্বান! কিছু করতে পারব কিনা সে পরের কথা—কিন্তু ডাক শুনে যদি ভেতরে সাড়া না দেয়, প্রাণ যদি দুলে না ওঠে, তবে অকর্তব্য হল বলে ভাবনা নয়, ভাবনা মরেচি বলে।"*

আত্মত্যাগবাদীদের কাজে প্রাণের পরশ পাওয়া যায় না। তা বড় নীরস, বড় রুক্ষ। তাতে প্রাণ ভরে না। লোকেরা আপনার কাছে নিছক কাজ চায় না। কাজের মারফতে আপনার অনুরাগও চায়। ভিখারীরা যখন আপনার দ্বারে এসে ভিক্ষা মাগে, তখন কেবল 'মুষ্টিভিক্ষা' কামনা করে না, 'তুষ্টিভিক্ষাও' চায়। চায় আপনার স্নেহ পেতে, আপনার প্রীতি লাভ করতে। ভিক্ষার সঙ্গে তারা চায় আপনার দৃষ্টির সুধা, নইলে তাদের তৃপ্তি হয় না। আমরাও সব ভিখারী, প্রেমের ভিখারী, স্নেহের ভিখারী। শুধু কাজে আমাদের মন ভরে না। তাই স্নেহের জন্য, প্রেমের জন্য দ্বারে-দ্বারে হাত পাতি :

'দীন আমি দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াই
আনন্দ-কণিকা মাগি'; কোথা নাহি পাই
সে পরম ধনটুকু, তাই নিশিদিন
প্রাণ মোর রহে শুষ্ক মধুছন্দোহীন।
হৃদয় মরুভূ মাঝে ফোটে নাকো ফুল,
হাসে না মধুর হাসি, করে না আকুল
নীরস জীবন মম, রহি ম্রিয়মান,
পরাণে বাজিয়া ওঠে বিষাদের গান।

---

* ফাল্‌গুনী—রবীন্দ্রনাথ।

শিশুরা খেলিছে সুখে, তরুণীর চিতে
প্রণয়-মাধুরী জাগে, বাতাসের গীতে
ঝরিছে পুলকবিন্দু. নিখিল ধরণী
সাজিয়া উঠেছে যেন নবীন বরণী।
কাঙাল পরাণ মোর সকলের কাছে—
প্রাণ দাও, প্রেম দাও, এই ভিক্ষা যাচে॥

মানুষ চায় রস, চায় প্রাণ। তা না পেলেই জীবন বিকৃত হয়ে যায়। আর মুক্তি আসে এই রসের তাগিদেই। এই জন্য শাস্ত্রে আল্লাকে বলা হয়েছে রসস্বরূপ। ভগবান কৃপণ নন। রসিকও কৃপণ হতে পারে না।

প্রাচীনপন্থী নীতিবিদরা যখন বলেন, ভালোবাসা নিঃস্বার্থ হওয়া দরকার তখন ঠিকই বলেন, কিন্তু 'নিঃস্বার্থ' কথাটার অর্থ এখানে স্বার্থহীন হওয়া নয়, স্বার্থসর্বস্ব না হওয়া। অর্থাৎ আপনি যে নিজের দিকে তাকাবেন না এমন নয়, কিন্তু নিজের চেয়ে বেশী তাকাবেন সঙ্গী বা সঙ্গিনীর দিকে। ভালোবাসার ব্যাপারে স্বার্থহীনতাকে বড় করে তুললে আপনি অপরের ভালোবাসা পাবেন না; যাকে ভালোবাসতে চাইবেন সে আপনাকে ভয়ংকর কিছু মনে করবে। কোন মেয়েকে বিয়ে করার আগ্রহ জানিয়ে যদি বলেন: ভদ্রে, আমি আপনাকে ভালোবাসবো, আপনার কাছ থেকে কিছুই কামনা করব না, তো সে আপনার প্রস্তাবে ভয় পাবে। এ কেমন ধারার লোক গা, যে নিতে চায় না, শুধু দিতেই চায়—এমনি ভেবে সে দূরে সরে যাবে। তারও তো দেওয়ার ক্ষুধা আছে, সেটা তৃপ্ত না হলে বাঁচবে কী করে?

"দেবার ব্যথা বাজে আমার বুকের তলে
নেবার মানুষ জানিনে তো কোথায় চলে।"

মানুষ শুধু নিজের সুখটুকু চায় না, অপরকেও খুশী করতে চায়। সঙ্গী বা সঙ্গিনীর ঠোঁটে যে তৃপ্তির হাসিটি ফুটে ওঠে

তাতেই তার সুখ। অপর্ণাকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'একেলা' মানে কি, তখন উত্তরে তিনি বলেছিলেন :

"যবে বসে আছি ভরা প্রাণে
দিতে চাই নিতে কেহ নাই।"

—বিসর্জন, রবীন্দ্রনাথ

এ উত্তরের তাৎপর্য উপলব্ধিযোগ্য। নিতান্ত কবিত্ব বলে তা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। নিতে চাওয়ার লোকটি না থাকলে একাকিত্বের দুঃখ ভোগ করতে হয়।

অবশ্যই অপরের সুখের দিকে তাকাবেন, নইলে সুখ পাওয়া যাবে না। তাহলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সুখহীনতা নয়, সুখই জীবনের লক্ষ্য। সুখ কামনা করলেই আমরা সহজ হতে পারি, আর সহজ হলেই সুখ পাওয়া যায়। সহজ সুখী মানুষটি নিজের ও পরের সকলের সুখের দিকেই তাকায় এবং ভয়, অসূয়া ইত্যাদি ধ্বংসকর আবেগকে পর করে চলে। সুখের পূজা হচ্ছে না বলেই দুনিয়া দিনদিন ছারখারে যাচ্ছে, নইলে তার অবস্থা এতো শোচনীয় হত না। কেননা, তাহলে মানুষ টের পেত, যা নেই তা নিয়ে আসাতেই সুখ, যা আছে তা ধরে রাখতে বা ছিনিয়ে নেওয়াতে নয়। এটা বুঝতে পারছে না বলেই মানুষ সুখের বিপরীত প্রবৃত্তি-সমূহের পূজো করে চলেছে। অর্থ-সমৃদ্ধি আর সম্মান, প্রতিপত্তির উগ্র আকাঙ্ক্ষা যে জীবনে দুঃখের আয়োজন করে এতো সহজেই টের পাওয়া যায়। অথচ আমরা বোকার মতো তারি হাতে আত্মসমর্পণ করে ভাবি, বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছি। সুখকে কাজের নিকষমণি করে তুললে এ দুর্ভোগ ভুগতে হত না। মাত্রা পেরিয়ে গেলেই তা বলে দিত : ব্যস, আর না, আর এক পা এগুলেই তুমি তোমার সুখ হারাবে। এভাবে অর্থপ্রতিপত্তির উদগ্র কামনা থেকে মুক্ত হয়ে আমরা পরিশ্রুত মানব হতে পারতুম, কিন্তু লোভ-লালসার উদগ্রতাই তা হতে দিচ্ছে না ; শত্রুর মতো আমাদের বেঁধে রাখছে।

নিজের ও পরের স্বার্থের মধ্যে শত্রুতার সম্বন্ধ কল্পনা করা হয়েছে বলেই আত্মত্যাগের আদর্শ বড় হয়ে উঠেছে, বন্ধুতার সম্পর্ক কল্পনা করা হলে তা কখনো হত না। আমরা প্রত্যেকে জীবন-সমুদ্রের এক একটি তরঙ্গ, তাই একে অপরকে বাদ দিয়ে চললে জীবন সার্থক হতে পারে না—এ বোধের সঙ্গে সঙ্গে যে ভালো-বাসার জন্ম হয় আত্মত্যাগের আদর্শ তার কাছে নিষ্প্রভ। অনুরাগের ভাব জীবনকে শিলাখণ্ডের মতো কঠিন ও স্থানু না করে জলের মতো তরল ও সাবলীল করে দেয়। তখন পরস্পর ঠোকাঠুকি নয়, অবলীলাক্রমে বয়ে চলা হয় জীবনের ধর্ম। নীতির তাগিদে নয়, সহজ প্রাণের তাগিদেই তখন মানুষ অপরের সুখের দিকে তাকায়। অপরের সুখ কামনা তখন আত্মপীড়নের উপায় না হয়ে হয় সুখ লাভেরই উপায়। নিজের মধ্যে সকলের প্রাণকে উপলব্ধি করে বলে তখন মানুষটি সকলের ব্যথায় ব্যথী ও সুখে সুখী হতে পারে। 'কালচার্ড' হওয়ার মানেই তাই। নিজের মধ্যে সকলকে আর সকলের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করতে না পারলে কালচার্ড হওয়া যায় না।

নিজের অন্তরের ঐক্যকে আর সমাজ ও নিজের ভেতরের সামঞ্জস্যকে যে উপলব্ধি করতে পেরেছে, সেই তো সুখী। 'বিশ্ব জুড়ে উদার সুরে যে আনন্দ গান বাজে'—সে গান তো সে-ই শুনতে পায়, অপরের কানে তা পশে না। যে লোকটি নিজের মধ্যে বিভক্ত—চেতন আর অচেতনে যার দ্বন্দ্ব, আর সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধটি শত্রুতার—সে হতভাগ্যটি কোন দিন সুখের স্বাদ পায় না। প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও সে অসুখী। দুঃখের অপর একটি কারণ, ভবিষ্যতের জীবনধারা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে করা। যে তা করে সেই মৃত্যু ভয়ে ভীত; মহাকাল তাকেই রাহুর মতো গিলে ফেলার ভয় দেখায়। যে লোকটি মনে-মনে অনন্তকালকে ভালোবেসে যায়, মহাকালের ভ্রূকুটি তাকে কাতর

করতে পারে না। সে মৃত্যুভয়হীন। তার ভালোবাসার বস্তুটি অর্থাৎ পৃথিবী দিন দিন উন্নতির পথে চলবে, তার ক্ষয় নেই— এই আশার বারতা তাকে মৃত্যুর কথা ভুলিয়ে দেয়। একটা মরমী সার্থকতাবোধে সে তখন অনন্ত জীবনের স্বাদ পায়। জীবনস্রোতের সঙ্গে ঐক্যানুভূতির দরুন এই যে সুখ এর তুলনা নেই—জড়তা-বিজয়ের নিশান এর হাতে। জীবনস্রোতের এই ঝর্ণাধারায় স্নাত হয়েই মানুষের তনু মন সুন্দর ও নিরাময় হয়ে ওঠে। মানুষের প্রতিনিধি কবির মুখ দিয়ে যখন বেরিয়ে পড়ে:

তোমারি ঝর্ণাতলার নির্জনে
মাটির এই কলসখানি ছাপিয়ে গেল কোন্‌ক্ষণে।
রবি ঐ অস্তে গেল শৈলতলে
বলাকা কোন্ গগনে উড়ে চলে;
আমি এই করুণ ধারার কলকলে,
নীরবে কান পেতে রই আনমনে।
তোমারি ঝর্ণাতলার নির্জনে।।—

তখন তিনি এই চলমান সৃষ্টিধারার কথাই বলেন। এই ঝর্ণা-তলায় স্নাত হওয়ার কায়দাটি যে জানলে না সে তো হতভাগ্য, বেঁচেও সে বাঁচার স্বাদ পেলে না।

(পৃথিবীর দুটি গতি: আহ্নিক গতি আর বার্ষিক গতি। নিজের চারিদিকে ঘূর্ণন আর সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণন। দুটো কাজ এক সঙ্গেই চলে। পৃথিবীর সন্তান মানুষেরও দুটো কাজ, নিজের দিকে চাওয়া আর অপরের দিকে তাকানো। দুটি কাজ এক সঙ্গেই চলা উচিত, নইলে জীবন সার্থক হয় না। 'খুদীর' সাধনা ব্যতীত যেমন 'বেখুদী' তথা সমাজের কল্যাণ সাধনা ব্যর্থ, তেমনি বেখুদীর সাধনা ব্যতীত খুদীর সাধনাও অপূর্ণ। 'সাগর' যদি না পায় নদী জল কেন তার কূলে কূলে?' সাগরে মিশতে না পারলে নদীর জলধারা হওয়াটাই ব্যর্থ হয়ে যায়। তাই দুটো

সাধনাকেই মিলিয়ে দেওয়া দরকার—একটাকে আরেকটার সম্পূরক হিসেবে। যারা এই মিলন সাধনায় উত্তীর্ণ হয় তারাই তো মানুষ, জীবনশিল্পীর অভিধা তাদেরই প্রাপ্য। অপরেরা মানুষ নামধারী হলেও, পুরো মানুষ নয়। তারা হয় ব্যক্তিকে নয় সমাজকে বড় করে তোলে সারল্যের তাগিদে, তথা ভারসাম্য রক্ষা করার দায় থেকে মুক্তি পাওয়ার তাগিদে। এ-ধরনের জীবন দীন জীবন, এর স্বাদ অত্যন্ত ফিকা। সত্যকার সভ্যতাকামীরা তা কখনো কামনা করতে পারে না। তারা চায় জটিলতা আর জটিলতার ওপর কর্তৃত্ব। তা-ই জীবন।

আবার বলি: সুখের তাগিদে মানুষ ভালো হয়, আবার ভয়ের তাগিদেও ভালো হওয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয়টা নয়, প্রথমটাই মূল্যবান। দ্বিতীয়টা জীবনকে আড়ষ্ট করে তোলে, প্রথমটা করে সম্প্রসারিত। আর সম্প্রসারণই জীবন, আড়ষ্টতা নয়। আড়ষ্টতা সুখের শত্রু জীবনেরও। যা জীবনদায়ী তাই সুখদায়ী। কালচারের উদ্দেশ্য তাই সুখ-সাধনা। নিজেকে ও অপরকে খুশি করে তোলার কায়দাটি না জানলে কালচার্ড হওয়া যায় না।

সুখের জন্যও কষ্ট দরকার, বিনা কষ্টে সুখ মেলে না। সুখের সাধনা সহজতার সাধনা, কিন্তু সহজ সাধনা নয়। ('অতি কঠিন সাধনা যার অতি সহজ সুর।') তা জয় করে নিতে হয়, অমনি পাওয়া যায় না।

সুখের উপায় আর সুখ এক চিজ নয়, একথা উপলব্ধি করতে পারলে সুখের পথে এক পা এগিয়ে যাওয়া সম্ভব, নইলে উপায় নিয়েই মেতে থাকতে হয়, লক্ষ্যে পৌঁছা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিন্তু আমরা ভুল করি। নকল দেবতাদের পূজা করেই আমরা কাল কাটাই, আসল দেবতাটির খোঁজও নেই নে। তাই তাঁর বর থেকেও বঞ্চিত থেকে যাই।)*

* ইংরেজীর অনুসরণে। বন্ধনীর উক্তিগুলি আমার নিজের।
—মো. হো. চৌ। ২ ১২.৮.৪৪